দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত

কমল চৌধুরী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত

কমল চৌধুরী



মডেল পাবলিশিং হাউস

২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

DHAKSHIN CHABBIS PARAGANAR ITIBRITTA.

A History of South 24-Parganas

by

Kamal Chowdhury

প্রকাশক
জয়দেব ঘোষ
মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
শুভ রথযাত্রা
২৮ জুন ১৯৮৭

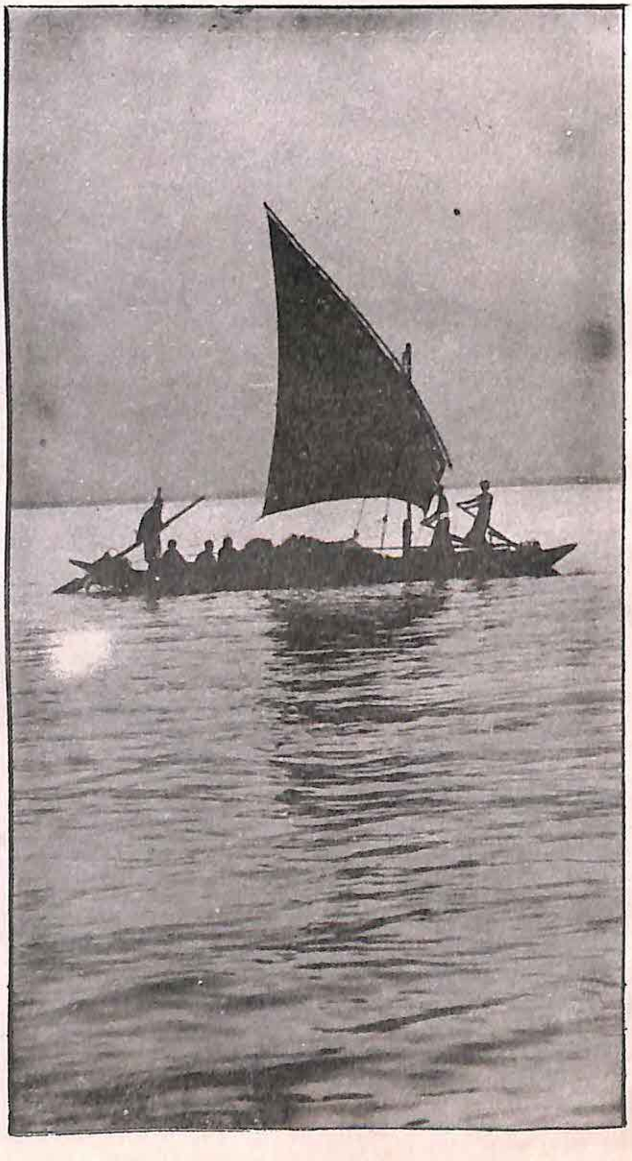
প্রচ্ছদ
বিপুল গুহ

আলোক চিত্র
রবিন দাস

মূল্য তিরিশ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ছবি
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬



কিছু কথা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বয়স মাত্র এক বছর। দীর্ঘকাল অখন্ড চব্বিশ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জেলার মর্যাদা পেয়ে এসেছে। প্রশাসনিক কারণে বারবার জেলাটিকে দুভাগ করার প্রস্তাব উঠেছে। ১৯৮০ সালের ৩০ জুন চব্বিশ পরগণা জেলাকে ভেঙে দু'টুকরো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায়। দুটো জেলা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হলেও তা কার্যকরী হয় ১৯৮৬ সালের ১মার্চ। উত্তর চব্বিশ পরগণার তুলনায় আয়তনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অনেক বড়। চব্বিশ পরগণাকে এক সময় বলা হত ভাটির দেশ। কারণ নদীর ভাটা বয়ে যেত দক্ষিণে। মুসলমান আমলে ছিল সাতগাঁ সরকারের অধীন।

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জেলাটি বৈচিত্র্যময় রূপ নিয়েছে। প্রাচীন যুগে সাগর দ্বীপে ছিল কপিলমুনির আশ্রম, আজও যেখানে প্রতি বছর সমবেত হয় সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহু স্থান ও তীর্থক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে জেলার বিভিন্ন স্থানে। বারভূইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য আকবরের রাজত্বের সময় থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আরম্ভকাল পর্যন্ত দক্ষিণ বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যর পতনের পর দক্ষিণ বাংলা পরিণত হয় 'মগের মুল্লুক' বা 'ফিরিঙ্গির দেশে'। বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলের জনবসতি এই সময়ে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

পলিমাটিতে গড়ে ওঠায় জেলাটি কৃষিসম্পদ সমৃদ্ধ। অসংখ্য নদনদী ছড়িয়ে আছে। উত্তরের ভূ-ভাগ উঁচু হলেও, দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। দক্ষিণের ভূ-ভাগ সুন্দরবনের বেশিরভাগই জলা এলাকা, জঙ্গলময় ও অনাবাদী মাটির ভাঙাগড়া চলছে অবিশ্রাম। জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলী নদী, পূর্বে বাঙলাদেশ, উত্তরে চব্বিশ পরগণা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা বলতে গেলে সামনে ভেসে ওঠে সুন্দরবন,বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং, নামখানা, সাগরদ্বীপ, মাতলা আর বিদ্যা নদীর বুকে লঞ্চে ভেসে চলা। দু'ধারে নাম জানা না-জানা অসংখ্য গাছপালা। নিরন্ধ্র অরণ্যের বুকে বিশ্বের বিস্ময় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সগর্ব চলাচল। অসংখ্য হরিণ, শুয়োর, রঙ-বেরঙের পাখি, মাঝি মৌলে নিয়ে এক স্বতন্ত্র জগৎ। মুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় দৃশ্যের পারস্পরিক উপস্থাপন। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, মগের মুল্লুকে মানুষের পাশাপাশি আরণ্যক জীবন। ভারতের অরণ্য প্রাণী নিয়ে কত গবেষণা, গভীর অনুসন্ধান, অথচ শেষ বিন্দুতে অবস্থিত এই সুপ্রাচীন ভূখন্ডের সামগ্রিক ঐশ্বর্য অসীম অবহেলায় অক্ষয় হয়ে আছে। না আছে সরকারী দৃষ্টি না আছে বেসরকারী উদ্যোগ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও স্বার্থান্বেষী মানুষের নিষ্ঠুর আচরণে সুন্দরবনের আয়তন সংক্ষিপ্ত হয়ে এলেও তার ঐশ্বর্য চিরভাস্বর। বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ-ডায়মন্ডহারবারে ভ্রমণ বিলাসী মানুষের আগমন বাড়ছে। ব্যাঘ্রপ্রকল্প ও কুমির প্রকল্প আজ সুন্দরবনের বড় আকর্ষণ। বড়খাঁ গাজী ও দক্ষিণ রায়ের দেশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে প্রাচীন সভ্যতার বহু প্রত্ননিদর্শন, যা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার কাজ আজও শুরু হল না।

অখন্ড চব্বিশ পরগণা জেলা নিয়ে একখানি বই লেখার বাসনা জাগে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ। লক্ষ্য ছিল একখন্ডে লেখার। কাজও শুরু করি। নানা কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১মার্চ চব্বিশ পরগণা জেলা দুটি ভাগ হয়। থানা ভিত্তিতে দুটি জেলার বিবরণ নতুনভাবে লেখা শুরু করি। এই সময়ে বন্ধুবর ও সহকর্মী সমরেন্দ্র দাস বইটি প্রকাশে উদ্যোগ নেন। মডেল পাবলিশিং হাউসের তরুণ কর্ণধার জয়দেব ঘোষ এ জাতীয় বই প্রকাশে আগ্রহী। তাদের সার্বিক সহযোগিতায় অবশেষে 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত' প্রকাশ সম্ভব হল।

সাধারণভাবে ইতিহাস যে ভাবে লেখা হয়ে থাকে বর্তমান বই সেভাবে লেখা নয়। চব্বিশ পরগণার বিবরণ সাধারণত কোম্পানি আমলের পর থেকেই বেশির ভাগ লেখা হয়েছে। তার আগেকার সুদীর্ঘ ইতিহাস রচিত হয়নি। ইতিহাস চর্চায় উৎসাহ তেমন অতীতে দেখা যায় নি। সমস্ত আঞ্চলিক বিবরণ বিক্ষিপ্ত ও অগ্রথিত। পুরনো সরকারী নথিপত্র উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ তেমন নেই।

স্থানভিত্তিতে বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেভাবেই তা প্রকাশ করা হল। দেশভাগের পর ব্যাপকহারে পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের আগমন ও নতুন জনবসতি গড়ে ওঠায় চব্বিশ পরগণার ইতিহাসে সূচনা হয়েছে নতুন অধ্যায়ের। সনাতন সামাজিক বন্ধন ভেঙে গেছে। নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটেছে। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লাব, ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটের প্রসার হওয়ায় সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পরিবহণে এসেছে যুগান্তর। বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। একফসলী জমির বেশির ভাগই দুই বা তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। যে গ্রামে কোনদিন শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি, সেখানেও দু'চার ঘর শিক্ষিত পরিবার খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বহু বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। আছে বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানি আমলের প্রথম থেকেই শাসকবিরোধী উত্থানে চব্বিশ পরগণার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বর্তমান গ্রন্থে সাংস্কৃতিক জীবন, বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ যুক্ত করা হয়নি। তাহলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেত এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশ সম্ভব হত না। এই বিষয়গুলিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

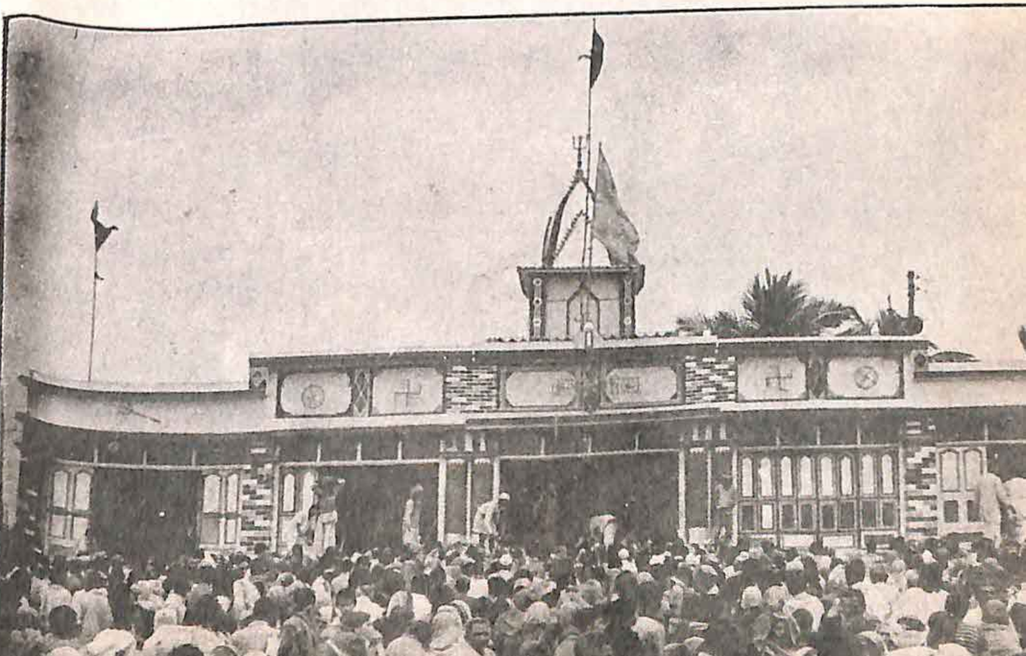
পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকলে আশাকরি পাঠক সে বিষয়ে লেখককে সচেতন করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত ও সংযোজিত হবে।

সাহিত্যিক শ্রীদেবেশ রায় তাঁর সাগরমেলা বিষয়ে একটি দীর্ঘ রচনা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

পান্ডুলিপি তৈরি, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কাজের জন্য দিলীপ কুমার মৈতে, সমরেন্দ্র দাস, মিলন কুমার তরফদার, বিজন সেন, নিতাই চৌধুরীর কাছে আমি ঋণী। মডেল পাবলিশিং হাউসের কর্মীদের সহযোগিতায় আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কমল চৌধুরী

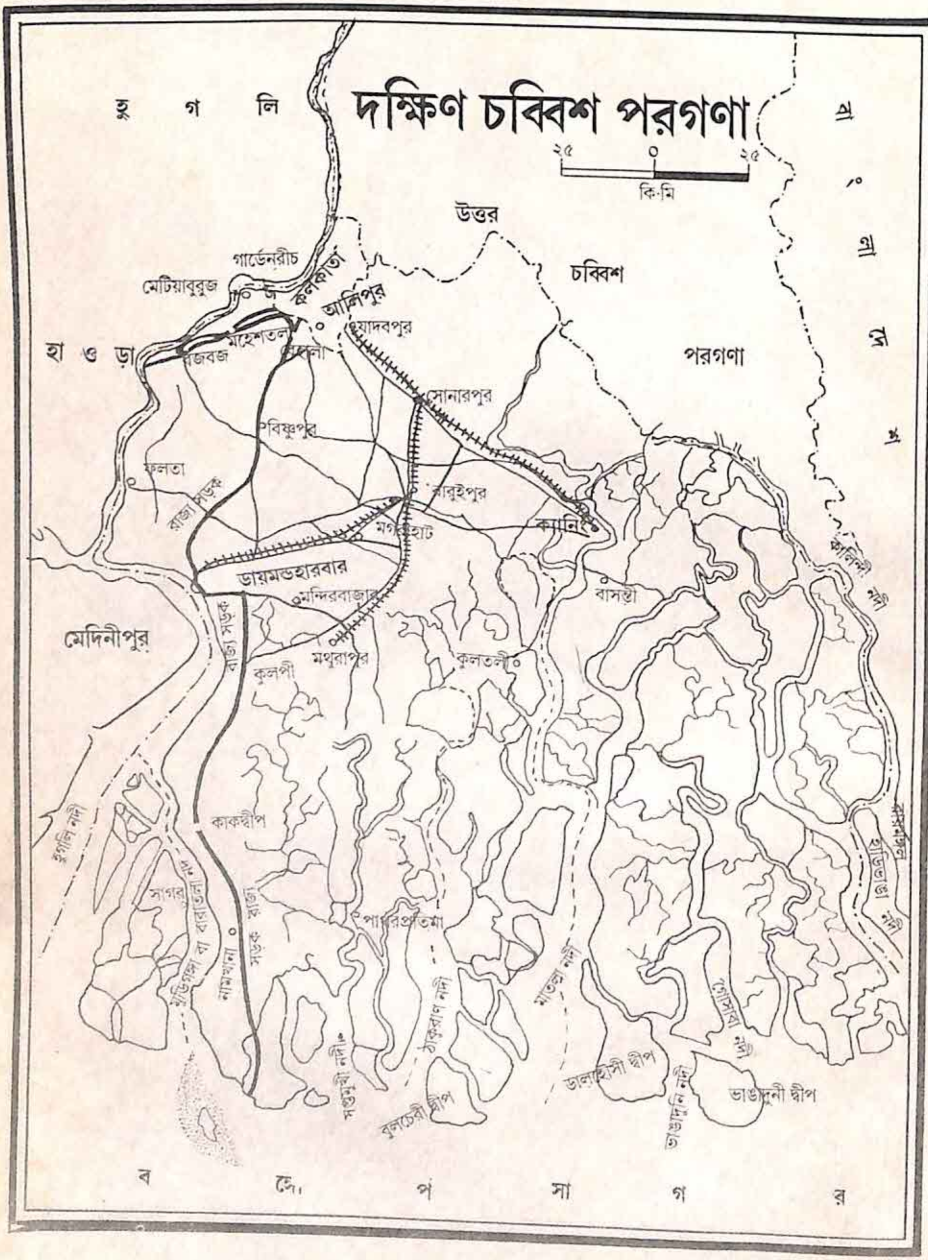
শ্রীমতী সন্ধ্যা চৌধুরীকে



সূচীপত্র







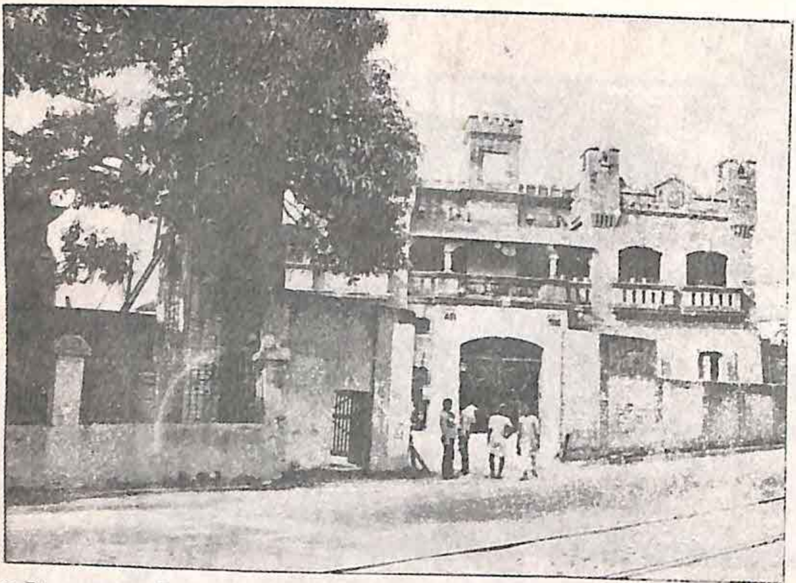
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
২৫
০
২৫
কি·মি
হু
গ
লি
উত্তর
চব্বিশ
পরগণা
গার্ডেনরীচ
মেটিয়াবুরুজ
কলকাতা
আলিপুর
যাদবপুর
মহেশতলা
বজবজ
হা
ও
ড়া
সোনারপুর
বিষ্ণুপুর
ফলতা
রাজ্য সড়ক
বারুইপুর
ক্যানিং
মগরাহাট
ডায়মন্ডহারবার
মন্দিরবাজার
বাসন্তী
মেদিনীপুর
মথুরাপুর
কুলতলী
কুলপী
কাকদ্বীপ
হুগলি নদী
সাগর
পাথরপ্রতিমা
নামখানা
ঠাকুরাণ নদী
মাতলা নদী
ডালহৌসী দ্বীপ
ভাঙাদুনী দ্বীপ
বুলচেরী দ্বীপ
কালিন্দী নদী
হাড়িভাঙা নদী
গোসাবা নদী
ব
ঙ্গো
প
সা
গ
র



ন্যাশনাল লাইব্রেরী ॥ আলিপুর



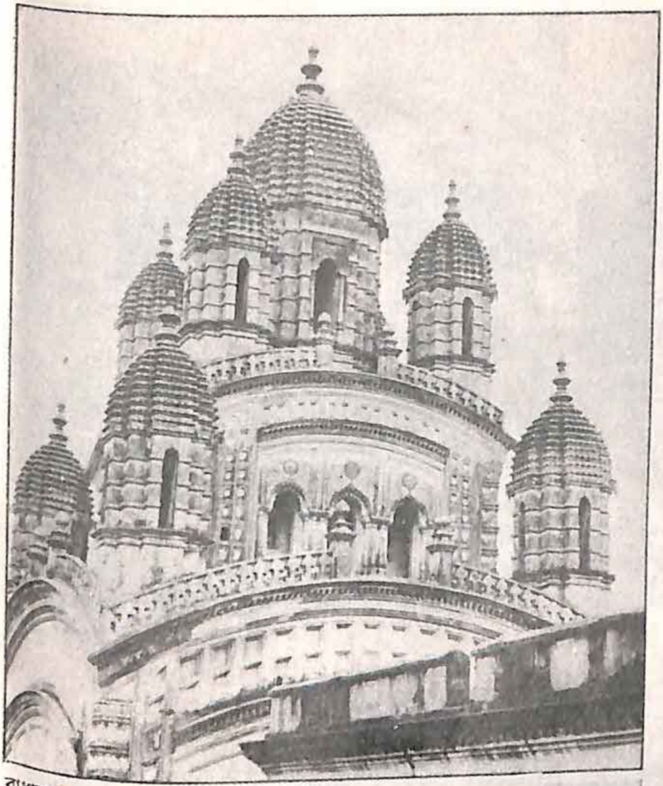
চিড়িয়াখানা ॥ আলিপুর



সেন্ট্রাল জেল ॥ আলিপুর



কবরখানা ॥ মেটিয়াবুরুজ



রাধাকৃষ্ণের নবরত্নের মন্দির ॥ নিউ আলিপুর



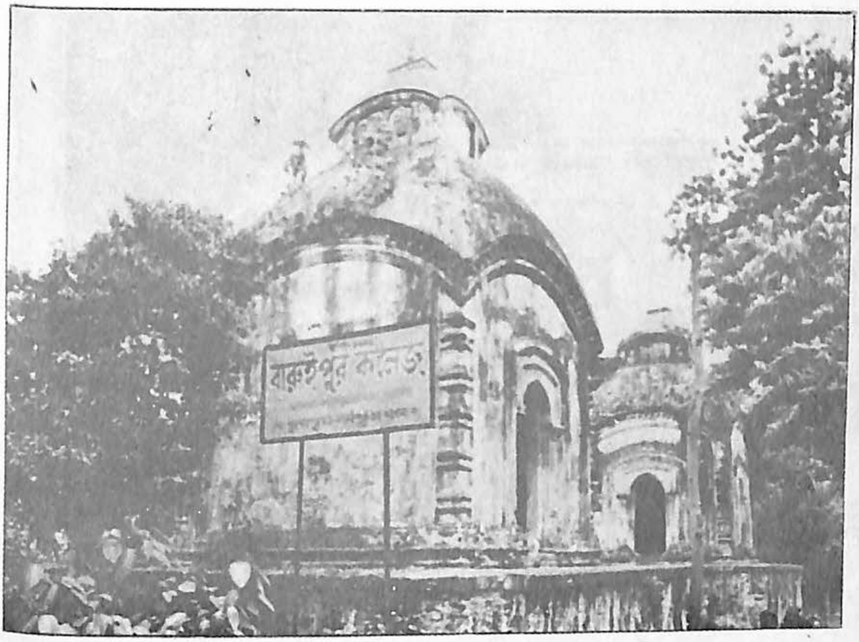
ছোট রাস মন্দির ॥ টালিগঞ্জ



দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাগার ॥ সুভাষগ্রাম



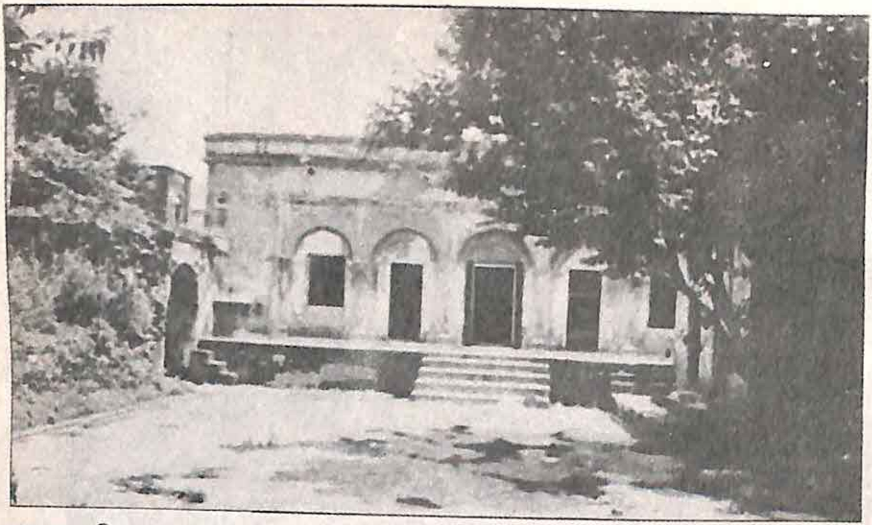
মসজিদ ॥ ঘুটিয়ারি শরীফ



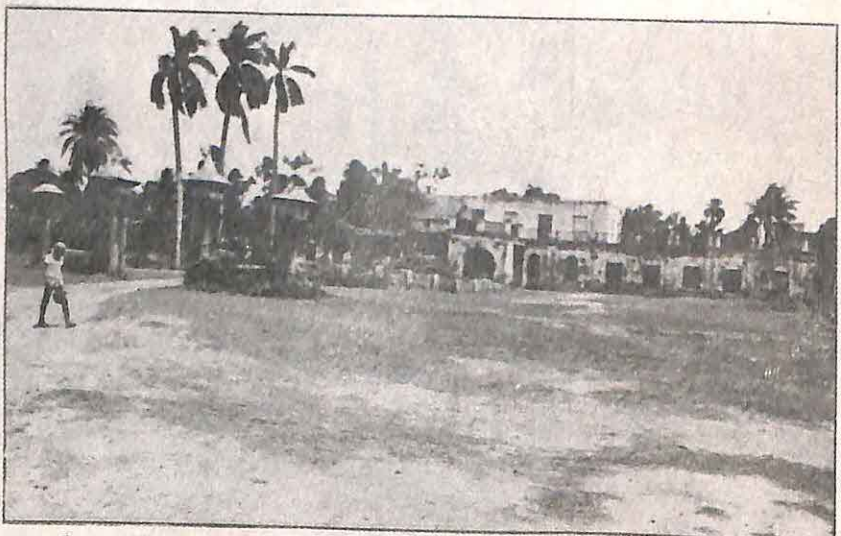
জোড়া শিব মন্দির ॥ বারুইপুর



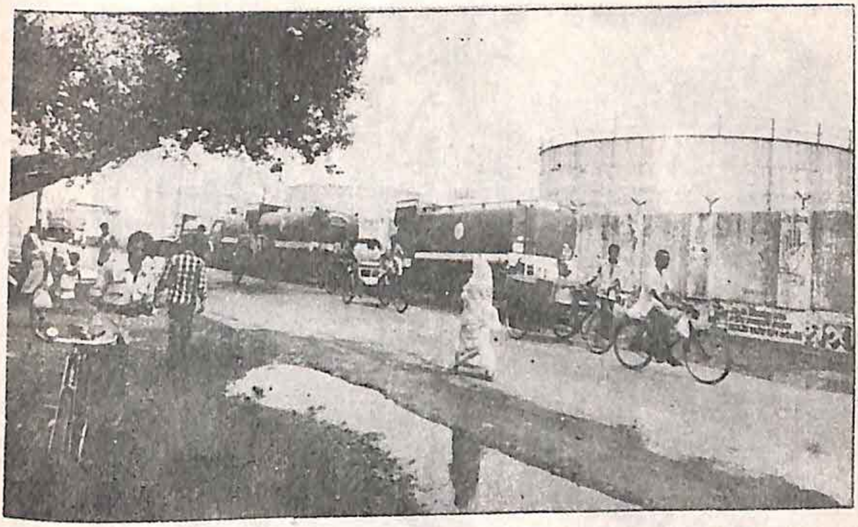
বিশালাক্ষী মন্দির ॥ বারুইপুর



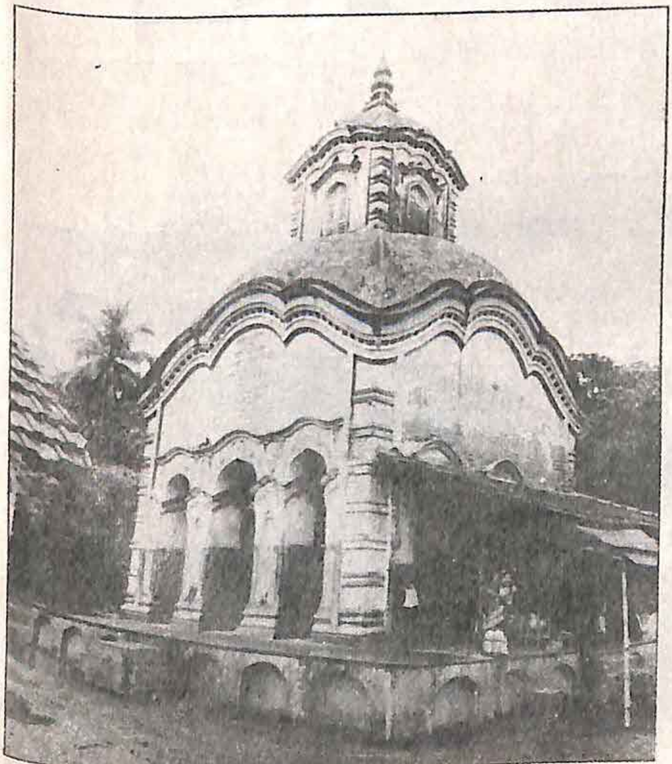
রাধাকৃষ্ণ মন্দির ॥ বারুইপুর



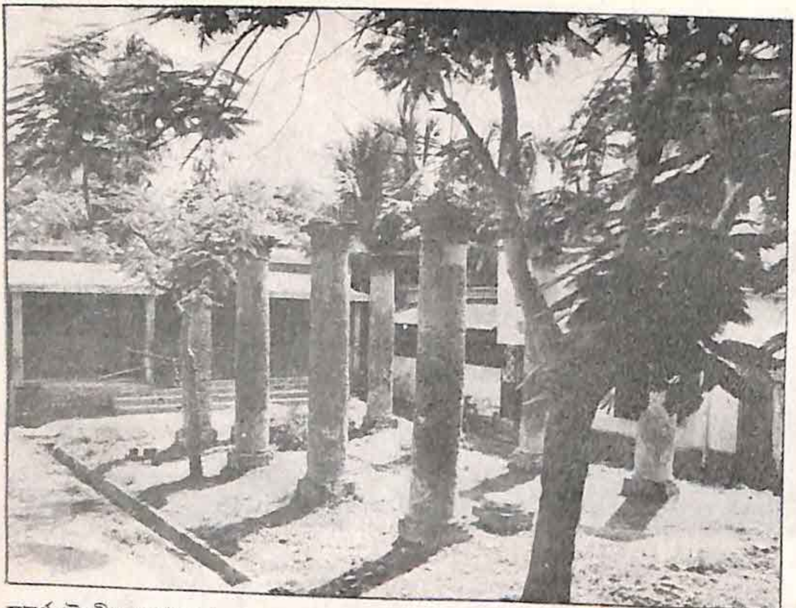
রাজবাড়ি ॥ বারুইপুর



কেরোসিন তেলের ডিপো ॥ বজবজ



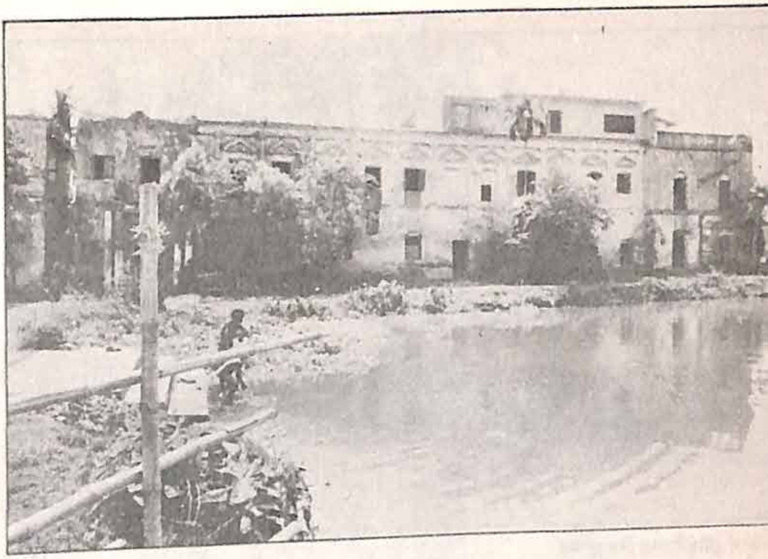
শিবমন্দির ॥ জয়রামপুর



সাবর্ণ চৌধুরীদের আটচালা



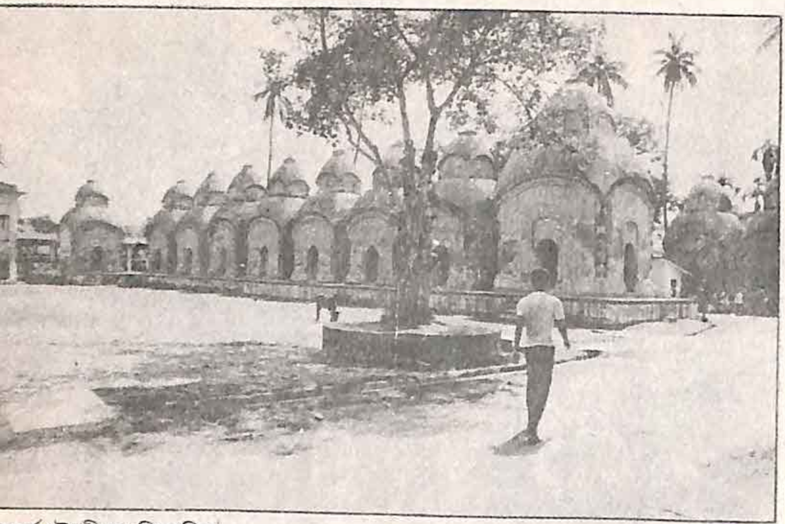
সাবর্ণ চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপ



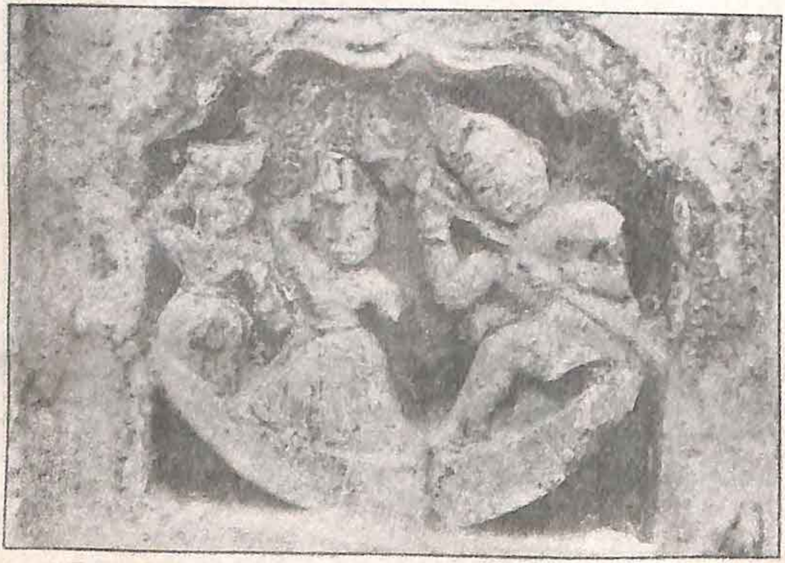
সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রাচীন বসতবাড়ি



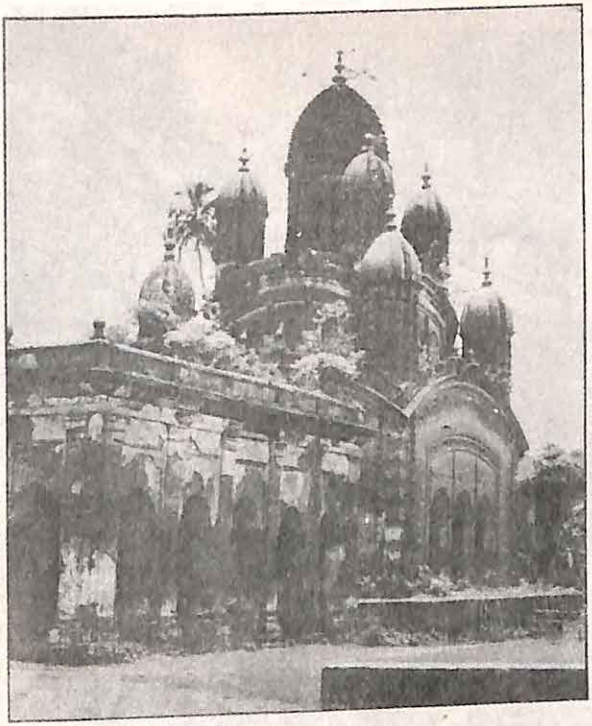
সাবর্ণ চৌধুরীদের রাধাকৃষ্ণ মন্দির



সাবর্ণ চৌধুরীদের শিবমন্দির



সাবর্ণ চৌধুরীদের মন্দিরে কারুকার্য



গোপীনাথ মন্দির ॥ বাওয়ালি



জমিদারবাড়ি ॥ বাওয়ালি



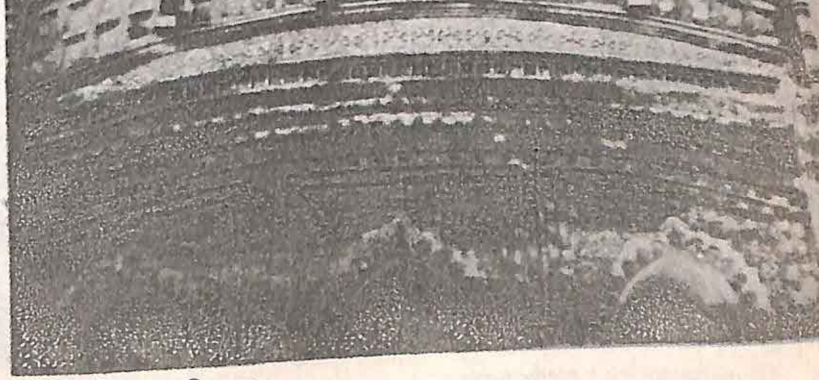
ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ॥ বোড়াল :



ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ॥ বোড়াল



ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে অনন্তশয্যায় নারায়ণ



কেশবেশ্বর মন্দির ॥ মন্দিরবাজার



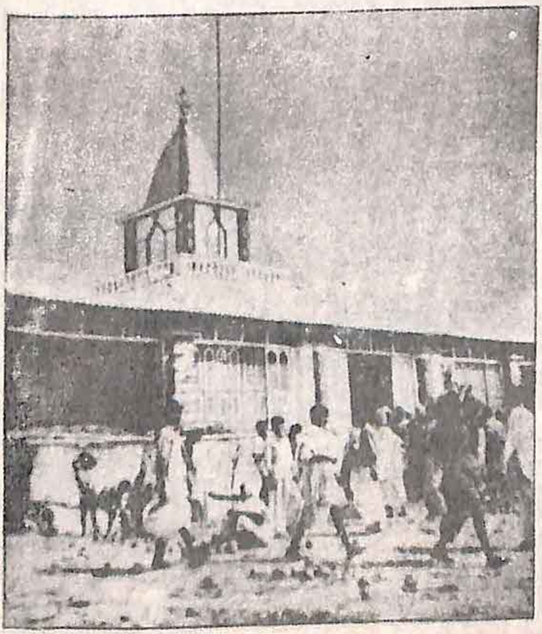
চীনামন্দির ॥ আছিপুর



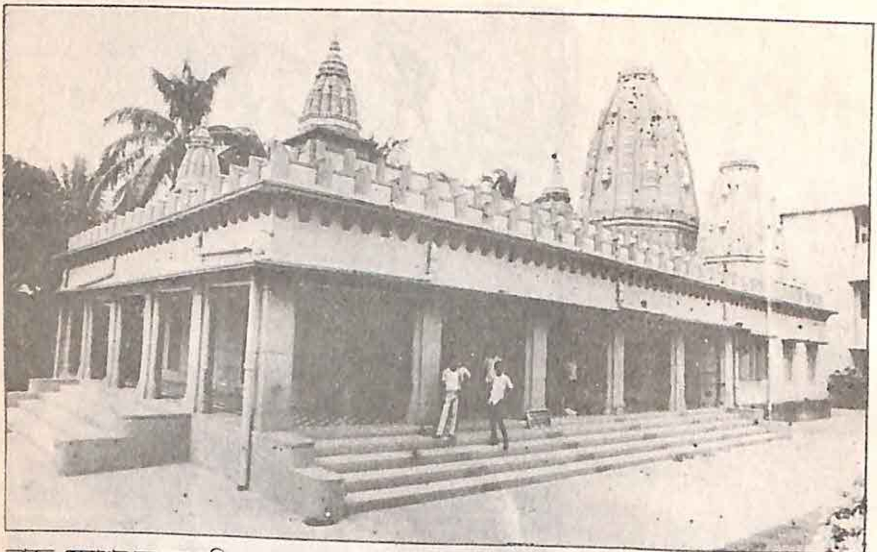
বদরিকানাথ শিব ॥ বড়াশী মাধবপুর



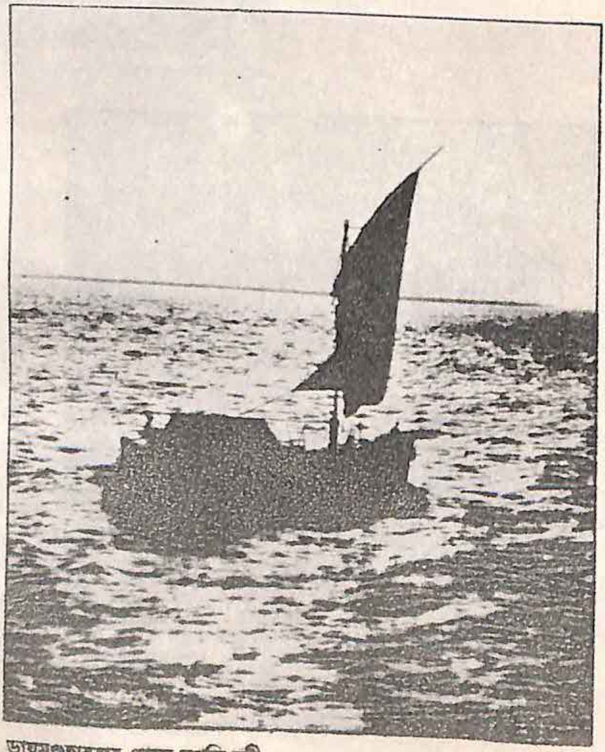
দক্ষিণ রায় ॥ ধপধপি



কপিলমুনি মন্দির ॥ সাগরদ্বীপ



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির ॥ ডায়মণ্ড হারবার



ডায়মণ্ডহারবার থেকে হুগলি নদী

চব্বিশ পরগণা পরিচিতি

চব্বিশ পরগণা নামক জেলাটির ইতিহাস শুরু কোম্পানি আমল থেকে। অবশ্য অঞ্চলগুলি অন্য নামে পরিচিত ছিল তার আগে। সম্রাট আকবরের সময় (১৫৮২) চব্বিশ পরগণার অঞ্চলগুলি ছিল সরকার সাতগাঁও অধীন। আর মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ছিল চাকলা হুগলীর অন্তর্গত। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাব মীরজাফরের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয় ১৭৫৭ সালের ১৫ জুলাই। এই সন্ধিপত্রের ৯ নম্বর ধারায় ছিল ঃ "All the land lying to the South of Calcutta, as far as Kulpi shall be under the Zemindary of the English Company, and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by them (the company) in the same manner with other Zeminders." সন্ধিপত্রের অনুকূলে নবাবের পরোয়ানা প্রচার হয় ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর। পরোয়ানায় ২৪টি পরগণার উল্লেখ ছিল। অবশ্য এগুলি সবই পূর্ণ পরগণা অর্থাৎ দেরুবস্ত ছিল না। কিছু ছিল আংশিক অর্থাৎ কিসমত। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

দেরুবস্ত পরগণা	কিসমৎ পরগণা
১। মাগুরা	১। গড়
২। খাসপুর	২। কলকাতা
৩। মেদিনীমল্ল	৩। পাইকান / পৈথান
৪। ইখতিয়ারপুর	৪। মানপুর
৫। বারিদহাটি	৫। আমিরাবাদ
৬। খাড়িজুড়ি	৬। আজিমাবাদ
৭। দক্ষিণসাগর	৭। শাহপুর
৮। মুড়াগাছা / মুনরাগাছা	৮। শাহনগর
৯। পাঁচকুলি	৯। আমিরপুর
১০। মেলাংমহল	১০। আকবরপুর
১১। হাতিয়াগড়	১১। বালিয়া
১২। ময়দা	১২। বাসুন্দি

মেলাং মহল অর্থাৎ নুনমহল। নবাবের পরোয়ানা সমর্থনে প্রকাশিত ফার্দ সাওয়ালে পরগণা ২৪টির জায়গায় ২৭টি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ৩টি হল হাবেলি

শহর বা হালিশহর ও বালিয়াজুড়ি এবং দুটি আবওয়াব ফৌজদারী মহল। এখানে বালিয়া ও বাসুন্দিকে একটি পরগণা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ এই জেলার জন্য নবাবকে খাজনা দিত ২,২২৯,৫৪॥৵১ পাই। আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল।

লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় ১৭৯৩ সালে। এই সময়ে সুন্দরবন যুক্ত ছিল চব্বিশ পরগণার সঙ্গে। তার আগে ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত। হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পরগণাগুলিকে চব্বিশ পরগণা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৮০২ সালে। লর্ড ময়রা গভর্নর জেনারেল (১৮১৩) হয়ে আসার পর ১৮১৪ সালে চব্বিশ পরগণার জন্য গঠিত হয় স্বতন্ত্র কালেকটরেট। কলকাতায় থাকল জেলা সদর। তার আগে কলকাতা কালেক্টরেটের ওপর ছিল চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার শাসনভার। চব্বিশ পরগণা থেকে সুন্দরবনকে স্বতন্ত্র করে একজন কমিশনারের ওপর শাসনভার দেওয়া হয়। প্রথম কমিশনার ছিলেন মিঃ স্কট। ১৮১৭ সালে ডাচদের সঙ্গে একটি মীমাংসায় পৌঁছাবার পর ফলতা ও বরানগর যুক্ত হয় চব্বিশ পরগণায়। ১৮২০ সালে যুক্ত হয় নদীয়া জেলা থেকে কেটে নেওয়া আনোয়ারপুর (অংশ) এবং বালান্দা।

বারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে ১৮২৪ সালে। তখন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮)। তাঁর নির্দেশে জেলা সদর কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বারুইপুরে। এ পর্যন্ত বারাসাত, বসিরহাট কিন্তু চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছিল না। একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বসিরহাটের বাসুন্দি গ্রামে। বসিরহাট ও সাতক্ষীরার শাসনকাজ চালাতেন তিনি। ১৮২৪ সালে বারাসাত, বসিরহাট, সাতক্ষীরা মহকুমার অংশ বিশেষ চলে এল চব্বিশ পরগণায়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময় (১৮২৮-৩৫) ১৮২৮ সালে জেলা সদর বারুইপুর থেকে সরিয়ে আনা হয় আলিপুরে। আলিপুরের সেই মর্যাদা এখনও বর্তমান।

বর্তমানে বাঙলাদেশ ভুক্ত সাতক্ষীরা মহকুমা ও খুলনা জেলার সৃষ্টি হয় যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৮২ সালে। প্রথমে সাতক্ষীরা মহকুমাকে যুক্ত করা হয় নদীয়া জেলায় সঙ্গে, ১৮৬১ সালে আবার আনা হয় চব্বিশ পরগণা জেলায়। লর্ড রিপনের (১৮৮০-৮৪) সময় ১৮৮২ সালে সাতক্ষীরাকে একটি মহকুমা করে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চব্বিশ পরগণার সীমানা দীর্ঘদিন একই অবস্থায় থেকে যায়। সামান্য একটু পরিবর্তন হয় ১৯২০ সালে। নদীয়া জেলার দুটি গ্রামকে চব্বিশ পরগণার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

বারাকপুর মহকুমার জন্ম ১৮৬৪ সালে হলেও, ১৮৯৩ সালে তার মহকুমা মর্যাদা রদ হয়ে যায়। ১৯০৪ সালে আবার বারাকপুর মহকুমা স্বীকৃতি পায়।

বারাসাত ছিল স্বতন্ত্র জেলার মতন। জেলার সদর দপ্তর ১৮২৩ সালে নিয়ে আসা হয় বারাসাতে। ১৮৬১ সালে বারাসাত জেলার স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকল না। একটি মহকুমায় পরিণত হল।

১৮৪৬-৫২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলা জরিপ করেন ক্যাপ্টেন আর স্মিথ। স্মিথের মানচিত্রে উল্লিখিত পরগণাগুলি হল ঃ

আগরপাড়া	দক্ষিণসাগর	নারায়ণঘর	বাজিতপুর
আগরপাড়া-বালিয়া	সাহানগর	ধরসা	মুরাগড়
বালিয়া-মাইহাটি	বালিয়া-কাটুলিয়া	খুসদা	পাইঘাটি
মুড়াগাছা	সাহপুর	মুলবর	মাগুরা
আনোয়ারপুর	পারসুলিয়া	হিলকি	নুরনগর
উখড়া হাবেলিশহর	ধুলিয়াগড়	কালারোওয়া	বুরন
স্বস্তয়নগর বা শায়েস্তানগর	হোগলাবাদ	চৌরাশী	আমিরাবাদ
স্বস্তয়নগর আমিরপুর	সুন্দরবন	বালিয়া	কাটুলিয়া
সরফরাজপুর-আমিরপুর	মাইহাটি	আজিমাবাদ	ধুলিয়াপুর
কালারোওয়া-হোসেনপুর	বালান্দা	কলিকাতা	পরধুলিয়াপুর
উখড়া-খুসদা	কাটশালি	পঞ্চান্নগ্রাম	বারিদহাটি
উখড়া-চৌরাশী	আমিরাবাদ	মেরণমল্ল	হাভেলিশহর
বালিয়া-আমিরপুর	মাগুরা	খাড়ি	ঘুর
খাসপুর	সরফরাজপুর	উখড়া	পেঁচাকুলি
হাতিয়াগড়	আরসা	রাজপুর	আমিরপুর

মোট ৬২টি। পুরনো জরিপে যেসব নাম ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন পরগণা। অনেক পরগণা ভাগ হয়ে গেছে। কিছু পরগণা অন্য কোন পরগণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নাম নিয়েছে। যেমন, বালিয়া-আমিরপুর, বালিয়া-কাটুলিয়া, সরফরাজপুর আমিরপুর, ইত্যাদি। কতকগুলি পরগণা হারিয়ে গেছে। যেমন পাইকান, বাসুন্দি, এক্তিয়ারপুর, মানপুর, আকবরপুর। পরগণাগুলি ভাগ হওয়ার কারণ ছিল। অন্যতম কারণ হল, ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে অনেক জমিদার খাজনা দিতে

পারত না। পরগণার অংশবিশেষ বিক্রি করে খাজনার টাকা পরিশোধ করা হত। এইভাবে পরগণাগুলি ভাগ হয়ে যেতে থাকে।

অনেকপরে ১৯২৪-৩৩ সালে আবার জরিপ শুরু হয়। শুরু করেন খুলনার সেটলমেণ্ট অফিসার এল আর ফকাস, শেষ করেন মিঃ বার্জ। ৫টি মহকুমা নিয়ে জেলার আয়তন ছিল ৪৮৫৬ বর্গমাইল। সুন্দরবন জরিপ সুরু হয় দেশভাগের আগে। কিন্তু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৫৩ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জরিপ হয়।

স্মিথ ৬৩টি পরগণার উল্লেখ করেছেন। আর হাণ্টার স্মিথের রিপোর্ট এবং বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর হিসাব দেখে ৬৫টি পরগণার উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে আছে গুনতালকাঠি, সৈয়দপুর, সেলিমাবাদ এবং রামচন্দ্রপুর। ১৯২৪-৩৩ সালের জরিপে উল্লিখিত ৫৬টি পরগণার মধ্যে আছে ঃ

আনোয়ারপুর	মুরাগাছা	মুরাগড়	কালারোওয়া-হোসেনপুর
আগরপাড়া	সৈদপুর	নুরনগর	ময়দা
আমিরাবাদ	মহম্মদ	পরধুলিয়াপুর	পাইঘাট
আমিরপুর	কলিকাতা	খাসপুর	পেঁচাকুলি
আরসা	চৌরাশি	বালান্দা	কাটুলিয়া
আজিমাবাদ	দক্ষিণসাগর	বালিয়া	পাঁজনুর
ঘুর	দাতিয়া	বারিদহাট	পঞ্চান্নগ্রাম
হালিশহর	ধরসা	বুরান	রাজপুর
হাসনাবাদ	ধুলিয়াপুর	বাজিতপুর	শাহনগর
হাতিয়াগড়	ধুলিয়াগড়	বরাহনগর	শায়েস্তানগর
হালদা	হিলিক	বালিয়াজোর	শাহাপুর
মাগুরা	জামিরা	খাসডাহা	সরফরাজপুর
মাইহাটি	কাটশালি	খাড়ি	সুন্দরবন
মুলঘর	মেদনমল্ল	খোসলপুর	উখরা

চব্বিশ পরগণা লাভ করার পর থেকে ১৬ মাস কোম্পানির কর্মচারীরা সরাসরি রাজস্ব আদায় করে। এই নিয়ে পুরনো জমিদারদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। ১৭৫৯ সালে রাজস্ব সংগ্রহ ইজারা ব্যবস্থা চালু হয়। পুরোন জমিদারদের হাত থেকে জমি গেল ইজারাদারদের হাতে। জমির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা প্রজাদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে রাজস্ব আদায় করত। রাজস্বের হার ছিল বেশি। গোটা চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে ১৭৫৯ সালে রাজস্ব আদায় হত ১১ লক্ষ

টাকা। এই টাকা সংগ্রহে বহু জমিদার ব্যর্থ হয়। ১৭৮৯-৯০ সালের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারার জন্য জেলার ৩০ জন জমিদার বা নায়েব কারারুদ্ধ হয়। এদের মধ্যে অনেককেই কারাভোগ করতে হয়েছিল। কারণ ঐ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় সম্ভব ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় ১৭৯৩। জেলার নতুন রাজস্ব পরিমাণ হল ৮,৬৫,০৯০ টাকা। যদিও আগের তুলনায় কম, তাহলেও বেশি। এতদিনে কৃষক পরিণত হল জমিদারের সম্পত্তিতে। তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে রাজস্ব আদায় হত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা কেমন ছিল সে সম্পর্কে জাস্টিস জর্জ ক্যাম্বেলের মন্তব্য (১ জুন ১৮৬৪): "বড় বড় জমিদাররা, কদাচিৎ দুই একজন ছাড়া নিজেদের জমিদারীর উন্নতির জন্য একটি কপর্দকও খরচ করেন না। তিনি নিজে চাষতো করেনইনা, চাষের উন্নতির জন্য কোন নতুন উন্নত কলাকৌশলও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন না। ইংরেজ জমিদারদের মতো 'ফাম' বা 'ফার্ম-হাউস' কিছুই তৈরি করে না। চাষের জমি ঘিরে দেওয়া, গাছ-গাছড়া ও বীজের ব্যবস্থা করা, নালা-নর্দমা বা সেচের ব্যবস্থা করা এসব কিছুই তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন না। তিনি শুধু চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য যা কিছু তাঁর নিজের পাওনা তা কড়ায়-গন্ডায় আদায় করেন, যতটা পারেন বেশি করে আদায় করার চেষ্টা করেন।" জাস্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মন্তব্য (১৯ জুন ১৮৬৫): "বাংলাদেশের জমিদাররা মূলধন নিয়োগ করে তাঁদের জমিদারীর উন্নতি করেছেন, এরকম বড় একটা দেখা যায় না। জমিদাররা একাজ করবেন, একথা আইনে লেখা আছে বটে, কিন্তু জমিদাররা তা কাজে বিশেষ পরিণত করেন নি।" একই তারিখে জাস্টিস সিলিকারের মন্তব্য: "কৃষি কাজের উন্নতির জন্য জমিদাররা কোন রকম দায়িত্ব পালন করেন নি। চাষীদের মূলধন বা বীজ দিয়ে সাহায্য করা, সেচের ব্যবস্থা করা, পথঘাটের উন্নতি করা, এসব কর্তব্য তাঁরা পালন করেন নি। কিছু পুকুর, এখানে ওখানে কিছু পথঘাট, হাট ও গঞ্জ তাঁরা করেছেন বটে, কিন্তু যা করা উচিত ছিল তার তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। বরং অধিকাংশ জায়গায় বনজঙ্গল হাসিল করে চাষীরা নিজেরাই আবাদের জমি বৃদ্ধি করেছে এবং জোতদার ও অবস্থাপন্ন চাষীদের জন্যই খেজুর আখ তামাক প্রভৃতির চাষ উন্নত হয়েছে। জমিদারদের জন্য এ সব উন্নতি কিছু হয়নি, তাঁরা শুধু উন্নতির ফলটুকু ভোগ করেছেন।" রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অন্য ২০ জন মিশনারীর বক্তব্য (এপ্রিল ১৮৭৫): "জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের

মত। তাঁরা নিজেদের রাজামহারাজাদের মত মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানা রকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।" (বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ। পৃঃ ২০-২১)।

নতুন ভূমিব্যবস্থা সনাতন গ্রাম্য সমাজ জীবনকে যে কীভাবে বিধ্বস্ত করেছিল উদ্ধৃতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। নতুন এক অভিজাত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল যাদের ক্ষমতার একমাত্র উৎস জমি। চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত সুফলা জমির ওপর জমিদারি সত্ত্ব কায়েম হওয়ার পর অঞ্চলটির দুর্গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল অসীম। এইসঙ্গে আর এক শ্রেণীর মানুষের হাতে বিস্তর বিত্ত সঞ্চিত হয়। যারা ছিল কোম্পানির সঙ্গে কোন ভাবে ব্যবসায়িক সূত্রে জড়িত। নিমক মহলের বেনিয়ান, কোম্পানির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেওয়ান ও মুৎসুদ্দি—এরাই দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের হাত প্রসারিত করে। বিস্তর জমিদারি তারা কিনে ফেলে। বিত্তের ভিত্তিতে গড়ে উঠল নতুন সমাজ। সেখানে মানবিকতার চিহ্নমাত্র ছিল না। কর আদায়ের নির্ধারিত কোন নিয়ম কানুন ছিল না। এমন কি গরুর ওপরও কর বসত। গাছ-পালাও বাদ যেত না করের আওতা থেকে। এছাড়াও আর এক শ্রেণী ছিল। জমিদার ও কুঠিয়ালদের আমলাগিরি করে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল গ্রাম্য জীবনে। এরাও গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচারের বলগা ছুটিয়েছিল। সরকারী নথিপত্র এবং বিভিন্ন কাহিনীতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

কোম্পানি আমলে চব্বিশ পরগণায় তিনটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। ১৭৭২ সালে বারাকপুরে, ১৭৮৩ সালে দমদমে এবং একটি বারাসাতে। ১৮১১ সালে বারাসাতের সামরিক শিক্ষার স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। বারাকপুরের সেনানিবাসে ১৮২৪ সালে 47th Bengal Infantryতে বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহীদের ওপর কামান দেগে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। বহু বন্দী সৈনিককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

তিতুমীরের কৃষকবিদ্রোহের সূত্রপাত ১৮৩১ সালে। ওয়াহাবী বিদ্রোহরূপে চিহ্নিত হলেও, জাতিধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তিতুমীরের নেতৃত্বে। চব্বিশ পরগণার এই সুসংগঠিত কৃষকবিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। যে কাজে অন্যতম সহযোগী ছিল দেশীয় জমিদার শ্রেণী।

কোম্পানি আমলে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা চব্বিশ পরগণার ইতিহাসে

উল্লেখযোগ্য। একটি নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ। অবশেষে ব্যাপক সংগ্রামের রূপ নিলেও, নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাকে দমন করা হয়। বারাকপুরের বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে।

চব্বিশ পরগণার সুজলা সুফলা ভূখণ্ড ধান, পাট রবিশস্য সমৃদ্ধ। কোম্পানি আমলে নীলচাষকে কেন্দ্র করে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সৃষ্টি হয়। বারাসাত মহকুমা ও তার উত্তরাংশে আঠার শতকের শেষে নীল চাষের প্রসার ঘটে। বারুইপুর অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি নীলকুঠি ছিল। দাদনি প্রথা এবং বলপ্রয়োগে নীলচাষ করা নিয়ে কৃষকমহলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সব থেকে সেরা জমিতে কৃষককে বাধ্য করা হত নীল চাষে। নীলকর সাহেব, আমলা ও গোমস্তাদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা ছিল নীলকরদের অকৃত্রিম সুহৃদ। বাঙলার প্রতিটি জেলায় তারা সমানভাবে নিষ্পেষণ চালিয়েছিল। তার ফলে ১৮৬০ সালে ঘটে নীল বিদ্রোহ। চব্বিশ পরগণার অত্যাচারিত কৃষকরা দলবদ্ধভাবে লাঙল কাঁধে গভর্নমেণ্ট হাউস ও দেওয়ানী আদালতের সামনে বিক্ষোভ জানিয়েছিল।

চব্বিশ পরগণার বরাহনগরে কোম্পানির বস্ত্রবয়নের কারখানা সেকালে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ কম ছিল না। ১৭৯৩ সালে বরাহনগরে ৭১,৭০০ খণ্ড বস্ত্র তৈরি হয়। যার দাম ছিল ৫, ২৯, ৬০১ টাকা।

জেলার আর একটি সম্পদ ছিল লবণ। বেশির ভাগ লবণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ছিল দক্ষিণের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বা নদী মোহনায়। কোম্পানি একচেটিয়া লবণ ব্যবসা চালায় ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত। তারপর কোম্পানি কর্মচারীদের লবণ ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৭২ সালে হেস্টিংসের আদেশে এই ব্যবসা আবার কোম্পানির অধিকারে আসে। লবণকেন্দ্রগুলি ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে বিশেষ সুবিধা হল না। ১৭৮০ সালে চালু হল এজেন্সি ব্যবস্থা। এগুলি ছিল য়ুরোপীয়দের কর্তৃত্বাধীন। একটি বড় আকারের লবণ তৈরির কারখানা ছিল চব্বিশ পরগণার রায়মঙ্গলে। বহু জমিদারের লবণ তৈরির কারখানা ছিল। এই আদেশের পর সেগুলি কোম্পানির অধিকারে আসে। কোম্পানির অনুমতি ছাড়া লবণ তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। গোপনে লবণ তৈরির অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হল। ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হত গোপনে লবণ তৈরি করত যারা। দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন ধারায় এই কানুন কঠোর আঘাত হানল।

কলকাতা সংলগ্ন চব্বিশ পরগণার অঞ্চলগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলগুলির। কলকাতা থেকে স্থলপথে এসব এলাকায় চলাচলের জন্য বেশকিছু বড় রাস্তাও তৈরি হয় ইংরেজের স্বার্থে। ১৮০৫ সালের ২৬ জুলাই কলকাতা থেকে বারাকপুর, ১৮২১ সালে বারাসাত বারাকপুরের মধ্যে বারাকপুর রোড, ১৮৪০ সালে টাকী রোড তৈরি হয়।

ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে কোম্পানি আমলের প্রথমে। রাণার ও ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা হয়। চিঠিপত্র রেজিস্ট্রেশনের প্রথা চালু হয় ১৭৯৫ সালে। ঘোড়ার ডাকে যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। কলকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সাংকেতিক বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা হয় ১৮৩১ সালের ২১ জুন। এই পথে ১৮৪৯ সালের ৫ নভেম্বর থেকে বৈদ্যুতিক তারবার্তা পাঠান হতে থাকে।

কোম্পানি এদেশে এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে। প্রথমেই তার অনুকূল ব্যবস্থা সৃষ্টিতে তারা ছিল তৎপর। অন্যান্য বিদেশী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সংঘাত চলছিল। এদেশেই বাণিজ্যতরী ও যুদ্ধ জাহাজ তৈরির গুরুত্ব উপলব্ধি করে টিটাগড় ও খিদিরপুরে দুটি ডক তারা নির্মাণ করে। ইংল্যাণ্ড থেকেই আসে কারিগর ও যন্ত্রপাতি। যেসব জাহাজ এখানে তৈরি হয়েছে, তার সবই ছিল বিদেশী জাহাজগুলির মতই সমান গুণমানের। ৩৬টি কামান সজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ 'ননসুস' তৈরি হয় ১৭৮১ সালে। জাহাজটির ওজন ছিল ৪২৩ টন। ৩২টি কামানযুক্ত আর একটি যুদ্ধ জাহাজ 'সারপ্রাইজ'ও এখানে তৈরি। ১৮২৩ সালের মধ্যে টিটাগড় ও খিদিরপুরে মোট ২২৩টি জাহাজ তৈরি হয়েছিল। টিটাগড়ের ডকটি নির্মাণ করেছিল হ্যামিলটন অ্যাণ্ড অ্যানারডিন কোম্পানি। ১৪৪৫ টন ওজনের 'কাউণ্টেস অফ সাদারল্যাণ্ড' জাহাজটি নির্মিত হয় ১৮০১ সালে। ১৮০২ সালে সুসান এবং ১৮০৩ সালে তৈরি হয় ফ্রেডারিক। এরপর টিটাগড়ে আর কোন জাহাজ তৈরি হয়নি। খিদিরপুরে এখনও নানা ধরনের জাহাজ তৈরি হচ্ছে এবং ডকের আধুনিকীকরণও ঘটেছে।

শিক্ষার প্রসার

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে চব্বিশ পরগণার অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কলকাতা শহরের বিকাশ পর্ব যখন সবে সূচিত হচ্ছে, তার বহু আগেই উত্তরে নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া এবং দক্ষিণে চাংড়িপোতা, জয়নগর পণ্ডিত সমাজের আবির্ভাবে ছিল চিহ্নিত। সংস্কৃত শাস্ত্র ও ন্যায় আলোচনায় খ্যাতনামা পণ্ডিত-কুলের অনেকেরই জন্ম এসব অঞ্চলে। শহর কলকাতার পত্তনকালেও এখানকার

পণ্ডিতসমাজ শহর কলকাতায় এসে বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারও ঘটেছিল গোটা চব্বিশ পরগণার মধ্যে বারাসাত, রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া, জয়নগর, মজিলপুর, বারুইপুর, বসিরহাট, দত্তপুকুর, চাংড়িপোতা (বর্তমান সুভাষগ্রাম), কাঁচড়াপাড়া, প্রভৃতি এলাকায় অনেকেরই আগে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে এই জেলায়। অনেকের জন্ম এখানে, আবার কেউ কেউ এখানে এসে বসবাস করেছেন। শিক্ষা বিস্তার, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সংগীত সর্বক্ষেত্রেই এদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল, যা থেকে সহজেই এই রত্নগর্ভা জেলাটির পরিচয় পাওয়া যায়।

অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য—গরিয় ১৩১১ বঙ্গাব্দ।
অক্ষয় কুমার বসু—১২৫৮ বঙ্গাব্দ (?) জাগুলিয়া।
অঘোর নাথ চক্রবর্তী—১৮৫২ রাজপুর।
অঘোরমণি—১৮২২ (?) কামারহাটি।
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী—২২ মার্চ ১৮৪৯ শিখরবালি।
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৬২ পানিহাটি।
অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য—৫ এপ্রিল ১৮৮২ আড়বেলিয়া।
অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৮৭৬ নিমতা।
অক্ষয় কুমার দত্ত—১৫ জুলাই ১৮২০ পুড়াগ্রামের কাছে গন্ধর্বপুর। বর্ধমানের চুপীতে জন্ম।
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—হালিশহর। জন্ম ভাগলপুরে।
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—১৮১৯ কোদালিয়া।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—২৫ ফাল্গুন ১২১৮ বঙ্গাব্দ (১৮১২) কাঁচড়াপাড়া।
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫ মার্চ ১৮৫৬ খিদিরপুর।
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—৯ জুন ১৮৮৬ ইচ্ছাপুর, জন্ম হয় ভবানীপুরে।
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ দক্ষিণেশ্বর।
কেশবচন্দ্র সেন—১৯ নভেম্বর ১৮৩৮।
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১২ এপ্রিল ১৮৬৩ খড়দহ।
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—নবগ্রাম বারুইপুর।
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—১৮৮৩ হারনাভি।
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—১৮ আগস্ট ১৮৫৮ পানিহাটি, জন্ম ভবানীপুরে।
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—২৬ জানুয়ারি ১৮৪৪ বোড়াল।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২২ রাজপুর।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—এপ্রিল ১৮০৬ মুচাদিপুর।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—১২৬১ বঙ্গাব্দ বারুইপাড়া হালিশহর।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—৩১ অক্টোবর ১৮৪৩ বাঁসআচড়া-বনগাঁ।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—৬ শ্রাবণ ১২৫৪ বঙ্গাব্দ রহুতা শ্যামনগর।

দীনবন্ধু মিত্র—১৮৩০ চৌবেড়িয়া।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—এপ্রিল ১৮১৯ চাংড়িপোতা।

দ্বারকানাথ মিত্র—১৮৩৩ আগুনসি।

দীনেশচন্দ্র মজুমদার—১৯০৭ বসিরহাট।

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু—১৮৩৫ নৈহাটি।

নিখিল নাথ রায়—ডিসেম্বর ১৮৬৫ পঁড়া বসিরহাট।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—১৩১২।

নীলরতন সরকার (ডাঃ)—১ অক্টোবর ১৮৩১ ন্যাতড়া।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—২০ ডিসেম্বর ১৭৬৬ হালিশহর, জন্ম হয় ভবানীপুরে।

প্রমথনাথ বসু—১২ মে ১৮৫৫ গৈপুর গোবরডাঙা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২৬ জুন ১৮৩৮ কাঁঠালপাড়া।

বলদেব পলিত—১৮৩৫ কোণা হালিশহর।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ মুরাতিপুর।

বিধানচন্দ্র রায়—১জুলাই ১৮৮২ টাকী শ্রীপুর, জন্ম পাটনায়।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২০ জুলাই ১৮৪২ শাসন বারুইপুর।

মোহিতলাল মজুমদার—২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ কাঁচড়াপাড়া।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—১৮৮৭।

মনোমোহন বসু—ছোট জাগুলিয়া। জন্মস্থান যশোহরের নিশ্চিন্তপুর।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ—১০ জুলাই ১৮৮৫ পেয়ারা।

রামপ্রসাদ সেন—১৭২৩ হালিশহর।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ শুঁড়া।

রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি—২৩ জুন ১৮৫৪ ভ্যাবলা বসিরহাট।

রমেশচন্দ্র মিত্র—১৮৪০ রাজারহাট বিষ্ণুপুর।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—২৯ মাঘ ১৭৮৬ পালপাড়া।

রাজনারায়ণ বসু—৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ বোড়াল।

রামকমল সেন—১৫ মার্চ ১৮৮৩ গরিফা।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ হরিনাভি।

শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি—১৮৩৯ বরাহনগর।

শিবনাথ শাস্ত্রী—৩১ জানুয়ারি ১৮৪৭ চাংড়িপোতা।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী—১৫ জুলাই ১৮৬১ বারাকপুর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ নিমতা।

সুভাষচন্দ্র বসু—২৩ জানুযারি ১৮৯৬ কোদালিয়া। কটকে জন্ম।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বৈশাখ ১২৩৪ বঙ্গাব্দ কাঁঠালপাড়া।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী—১৭৬২ পালপাড়া।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ নৈহাটি।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—১৮৬২ বেহালা।

ইংরেজ আগমনের পরে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার ঘটতে থাকে। কলকাতা দেশের প্রশাসনিক ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বারাসাত অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটে দ্রুত। এর কারণও ছিল। বারাসাত ছিল ইংরেজ প্রশাসকদের প্রধান কেন্দ্র। সে সময়ে ইংরেজভাবাপন্ন বেশকিছু শিক্ষিত বাঙালীর বসবাস ছিল এখানে। সংস্কৃতি সচেতন ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন পরিবেশ এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাব স্থানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। যার প্রভাব বসিরহাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বারাকপুর বারাসাত বসিরহাট কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনপ্রবাহ গ্রামীন চেতনার সঙ্গে পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে দীর্ঘকাল। ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। প্যারীচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড় প্রভৃতি বিশিষ্ট বাঙালীর পদার্পণে নতুন জীবনের সঞ্চার হয়।

দক্ষিণে রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোতা লাঙ্গলবেড়ে অঞ্চল ছিল সংস্কৃত চর্চায় অন্যতম পীঠস্থান। চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। "…দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এই অঞ্চলটি একসময় 'দক্ষিণ-নবদ্বীপ বলে খ্যাত হয়েছিল।…অনন্তরাম কণ্ঠাভরণের পুত্র শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। এই বংশে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্ন খ্যাতিমান ছিলেন। মালঞ্চের কাছে লাঙ্গলবেড়েতে ঘৃতকৌশিকদের বংশে কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগিশ, ধনেশ্বর ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ,

নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি পণ্ডিতরা জন্মগ্রহণ করেন। লাঙ্গলবেড়ের গৌতম গোত্রে স্বর্গত পণ্ডিত ভরত শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতসমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। হরিনাভির ঘৃতকৌশিক গোত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি, নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার, রামকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতির জন্ম। হরিনাভির গৌতম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বাসুদেব বেদান্তবাগীশ, দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, দীননাথ বিদ্যালঙ্কার ন্যায়রত্ন, গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন, মধুসূদন বাচস্পতি, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তার কনিষ্ঠ রামনারায়ণ তর্করত্ন ('কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক প্রণেতা), চণ্ডীচরণ ন্যায়বাগীশ, হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন এবং আরও অনেকে। জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, ঈশান চূড়ামণি, উমাচরণ তর্করত্ন, রামতারণ শিরোমণি, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হরানন্দ ভট্টাচার্য, তাঁর পুত্র শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই দক্ষিণ-নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।" (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২২১)। চাংড়িপোতায় (বর্তমান সুভাষগ্রাম) জন্ম দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের। তাঁর সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার পাতায় উনিশ শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনধারার চিত্র ধরা পড়েছে নিখুঁত ভাবে।

দক্ষিণ অঞ্চলের বারুইপুরে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটে সকলের আগে। নিমক মহল ও নীলকুঠির সাহেবদের বসবাসের কারণে এবং স্থানীয় জমিদারদের আনুকূল্যে সনাতন জীবন ধারায় পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। ইংরেজি স্কুল ও গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য চব্বিশ পরগণা জেলায় সর্বপ্রথম স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩২ সালের ১৪ জুন টাকীতে। রামমোহন অনুরাগী জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম সাতদিনে ৩৪০ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল।

দ্বিতীয় ইংরেজি বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হয় পানিহাটিতে। জমিদার রায়চৌধুরীদের নাচঘরে স্কুলের জন্ম। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী ও প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।

তৃতীয় ইরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তারকনাথ সেন সুখচরে।

চতুর্থ ইংরেজি বিদ্যালয় ১৮৩৭ সালের বারাকপুরে প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড অকল্যাণ্ড। স্কুলে বেতন দিতে হত না। ছাত্রদের বই, খাতা, কলম দেওয়া হত বিনামূল্যে। উঁচুক্লাসের ছাত্ররা নিচু ক্লাসে পড়াবার সুযোগ পেত। এজন্য তাদের দক্ষিণাও মিলত। এই স্কুলের ছাত্রদের জন্য মেডিকেল কলেজ ও হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই স্কুলটি পরবর্তীকালে বারাকপুর গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে পরিণত হয়।

পঞ্চম ইংরেজি বিদ্যালয় বরাহনগরে স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে। স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন রামরতন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী ও প্রাণনাথ রায়চৌধুরী।

ষষ্ঠ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বারাসাতে। অন্যতম উদোগী ছিলেন, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ মৈত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৬-৫৭ সালে। তার আগেই ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে চব্বিশ পরগণা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। ৪টি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত।

মন্দির ॥ মসজিদ ॥ মেলা

বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে জেলার বিভিন্ন স্থানে। সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিলের সময় পাওয়া গেছে বহু মূর্তি ও মন্দিরের ভগ্ন দেওয়াল।

পানিহাটিতে আছে বৈষ্ণব মহান্তদের স্মৃতিসৌধ। খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির ও গঙ্গার ধারে চব্বিশটি শিবমন্দির আছে। টিটাগড়ের দ্বাদশটি শিবমন্দির ও অন্নপূর্ণার মন্দির বিখ্যাত। শ্যামনগরে কালীবাড়ি ও দ্বাদশ শিবমন্দির আছে। ভাটপাড়ার জয়চণ্ডীদেবীর মন্দির, বেশ পুরনো। চারটি রত্ন মন্দির শিবমন্দির হিসাবে পরিচিত। একটি মন্দিরে আছে পোড়ামাটির কাজ। হালিশহরে রামপ্রসাদের পঞ্চবটী, চারটি আটচালা মন্দির, দুটি পঞ্চরত্ন শিব মন্দির দর্শনীয়। কয়েকটি মন্দিরে আছে পোড়ামাটির কাজ। আটচালা কৃষ্ণরায়ের বিরাট মন্দির আছে কাঁচড়াপাড়ায়। শ্যামনগরের নবরত্ন কালীমন্দির, আটটি আটচালা ও দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির বিখ্যাত। এখানে আছে পালযুগের দুটি বিষ্ণুমূর্তি। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীমন্দির, মদনমোহন মন্দির আছে। বারোটি আটচালা শিবমন্দির একালে বিশেষ পরিচিত। বড়িষার দ্বাদশ শিবমন্দির, রাজপুরের আনন্দময়ী কালীমন্দির, বহড়ুর শ্যামসুন্দর মন্দির, কোদালিয়া (সোনারপুর) বৃহৎ কালীমন্দির, জয়নগরের বারোটি আটচালা শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ গোবিন্দপুরের ভগ্ন মন্দির, মহেশপুরের ভগ্ন জোড়বাঙলা কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির, বোড়ালের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, রামনাথপুরের কেশবেশ্বরের আটচালা মন্দির, বেড়াচাপার খনা মিহিরের ঢিবি বিখ্যাত।

দক্ষিণবাঙলার প্রাচীনতম মন্দির জটার দেউল ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মথুরাপুর থানায় অবস্থিত। একসময় স্থানটি ছিল জঙ্গলাবৃত। জঙ্গল হাসিলের সময় আবিষ্কৃত হয় মন্দিরটি। পালযুগের স্থাপত্যরীতি অনুসারে এটি নির্মিত হয়েছে।

এখনও ৮০।৮৫ ফুট দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপরের অংশের চিহ্ন মাত্র নেই। সম্ভবতঃ মন্দিরটি শিবের অপর নাম জটাধর অনুসারেই জটার দেউল নামে খ্যাত।

শিব, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, দক্ষিণরায়, বারা, ধর্মঠাকুর, বাবাঠাকুর, বাসলী, রংকিণী, মাকাল ঠাকুর, আটেশ্বর, ঘাটুদেবতা, ঘণ্টাকর্ণ, হাড়িঝি, হাড়িঝি চণ্ডী, কালু রায়, সিনিদেবতা, বনবিবি, বৃক্ষপূজা, ধর্মরাজ, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, অসংখ্য পীর, ফকির ও দরবেশ এবং অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা ছড়িয়ে আছে জেলার প্রতিটি গ্রামে।

চড়কপূজা ও গাজন, দোলযাত্রা, মাঘীপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, নীলপূজা, পীরের স্মরণোৎসব, রথযাত্রা, বারুণী স্নান, ঈদ উৎসব, মহরম, গোষ্ঠযাত্রা, গঙ্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। ক্ষেত্র দেবতা বারাঠাকুর খুবই জনপ্রিয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে। পৌষসংক্রান্তিতে বারাঠাকুরের পূজাও বেশি হয়ে থাকে। হিন্দু দেবতা দক্ষিণ রায় ও মুসলমান দেবতা পীর গাজী বা বড় খাঁ গাজীর প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। ধপধপিতে আছে দক্ষিণ রায়ের মন্দির ও মূর্তি। পয়লা মাঘে দক্ষিণ রায়ের পূজা হয়। পীর গাজী বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে হাড়োয়া থানার পীর গোরাচাঁদ ও ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী বিখ্যাত। উভয় দেবতা হিন্দু মুসলমানের দ্বারা পূজিত এবং উভয়ের বাহন বাঘ অথবা ঘোড়া।

বাঘের পিঠে বসা বনদেবী বা বনবিবি বা বিবিমার পূজা কোন নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। অরণ্য প্রবেশকালে বা ফিরে এসে দেবীপূজা করা হয়। ওলাবিবি, দেবী মনসা, চণ্ডীদেবীর পূজা হয়ে থাকে জেলার বিভিন্ন অংশে। পয়লা পৌষ বেনাকী দেবতার পূজা করে ডায়মণ্ডহারবার ও ফলতার কৃষকসমাজ। কালুরায় জ্বরাসুরও বেশজনপ্রিয়। জ্বরাসুরের গায়ের রঙ ঘন নীল, তার মধ্যে কালোদাগ, তিনটি মাথা, নয়টি চোখ, ছয়টি হাত ও তিনটি পা। মাথায় মুকুট ও শরীরে ওড়না থাকে। এই দেবতাকে শীতলা মন্দিরে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। জেলেদের মাকাল ঠাকুর, শিশুদেবতা পাঁচুঠাকুর, পশুদেবতা আটেশ্বর, মানুষের মঙ্গলের দেবতা বারাঠাকুর বা পঞ্চানন, হাঁড়িঝি, সাতবোন বা সাতবিবি, বসন্তরায়, মাণিকপীর, চর্মরোগের দেবতা ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু এই জেলার অন্যান্য লোকদেবতা। তাছাড়াও আছেন বিভিন্ন দেবদেবী।

জেলায় মেলারও অন্ত নেই। সারা বছর জুড়ে থাকে তার রেশ। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মেলা হল ঃ বারুইপুরের রাসযাত্রার মেলা, জয়নগর মজিলপুরে গোষ্ঠযাত্রা ও ধনন্তরী কালীর বার্ষিক উৎসব, তারাপুকুরে শাহপীরের মেলা, বড়িষার চণ্ডীমেলা, ভাটপাড়ার রাসের মেলা, খড়দহের রাসের মেলা, হাড়োয়া ও আমডাঙায় পীর গোরাচাঁদের মেলা, শাঁকরশহর গ্রামে বাবনপীরের মেলা, গঙ্গাসাগরের মেলা, ঘুটিয়ারী শরীফে পীর গাজীমোবারক আলির আবির্ভাব উৎসব ও মেলা, দলুইপুরে রাসযাত্রার মেলা, মামুদপুরে ধর্মরাজের মেলা, পদ্মপুরে গঙ্গাপুজোর মেলা, সহরার চড়কের মেলা, ধানিরামচকে বিবিমার মেলা, ভরতগড়ে শীতলা পুজোর মেলা, রায়বাঘিনীর চড়কের মেলা, ক্যানিংয়ের ব্রহ্মপুজোর মেলা, মরিচায় পীর ইসমাইলখাঁর আবির্ভাব উৎসব ও মেলা, ধপধপির দক্ষিণরায়ের মেলা, রাজপুরের ধর্মরাজের মেলা, ভাড় রামকৃষ্ণপুরে গোষ্ঠ উৎসব, দেউলিয়ার রথ ও চড়কের মেলা, দেগঙ্গার রথ ও জগদ্ধাত্রীপুজোর মেলা, দাসপুরে বুড়ীমার মেলা, কদম্বগাছির মানিকপীরের মেলা, ভাগ্যমন্তপুরে চড়কের মেলা, মাশুণ্ডার চণ্ডীপুজোর মেলা, আমডাঙায় করুণাময়ী কালীপুজোর মেলা, শিলপাড়ার চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, সুমতীনগরে দুর্গাপুজোর মেলা, মৃত্যুঞ্জয় নগরে শিবরাত্রির মেলা, লালপুরের দুর্গাপুজো, রাসযাত্রা ও শিবপুজোর মেলা, অমরাবতীর মকর স্নানের মেলা, মাধব নগরের গোষ্ঠযাত্রা মেলা, মণিপুরে গঙ্গাপুজোর মেলা, কামদেবপুরে চন্দনী উৎসব, দেরিয়ার রথযাত্রার মেলা, মশাটের মহরমের মেলা, হরিণডাঙায় রক্ষাকালীর মেলা, কুলটিকরী বারুণীস্নানের মেলা, পারুলিয়ার পঞ্চানন্দের মেলা, কোদালিয়া ও ফতেপুরের মেলা, দোস্তপুরে গঙ্গাযাত্রার মেলা, ঝুখিয়ার মহরমের মেলা। এসব ছাড়াও আছে। চব্বিশ পরগণার তরজা গান, ওলাবিবির গান, মানিকপীরের গান, বনবিবির পাঁচালী গান ও যাত্রা এবং পুতুলনাচ বিখ্যাত। মাণিকপীরের একটি গান আছে ঃ

বেগম বেগম বলে মাণিক ছাড়িল জিগির।
কালুঘোষের মা বলে, এসো সত্যপীর ॥
কালুঘোষের মা আর নন্দ ঘোষের ঝি।
বলে, সকালে এসেছে ফকির ভিক্ষা দেব কী ?
চাল কড়ির ফকির নই মা, চাল কড়ি নিব।
একটুখানি দুগ্ধ পেলে দোয়া করে যাবো ॥
যার যেমন ভাগ্য মাগো, তেমনি করবে দান।
গোয়ালেতে বাড়বে গরু, বংশে বাড়বে মান ॥

জেলায় এমন কিছু দেবদেবী আছে যাকে দেখা যায় না অন্য কোন জেলায়। সুন্দরবন অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায়, বেশির ভাগ দেবদেবীর কল্পনায় এসেছে আরণ্যক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এসব দেবতা শাস্ত্র থেকে উঠে আসেননি। কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না মন্ত্রোচ্চারণে। দেবতার অবস্থান বহু ব্যয়ে নির্মিত মন্দিরে নয়—হাট-মাঠ যত্রতত্র।

প্রথমেই আসে দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গ। বাঘের দেবতা হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ রায়ের আধিপত্য ছড়িয়ে আছে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। দক্ষিণ দ্বার, দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণদর, বাবাঠাকুর নামেও পরিচিত কোথাও কোথাও। বর্তমানে উচ্চ সমাজে এই লৌকিক দেবতা ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি পৌরহিত্য করেন। সকল শ্রেণী ও বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা পূজিত দেবতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তবে অরণ্যে প্রবেশ করে সুন্দরবনাঞ্চলের বাউলে, মৌলে, শিকারী, আবাদকারী প্রভৃতি। মুসলমান ও খৃষ্টানদের কাছেও ইনি শ্রদ্ধেয়। নিত্যপূজা হয় থান বা মন্দিরে। শনি ও মঙ্গলবারেও পূজা হয়। বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠানের সময় পৌষ সংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ। কেবল সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নয়, বাঙলাদেশের খুলনা, যশোহর ও নোয়াখালি অঞ্চলেও এই দেবতা পূজিত। "দক্ষিণ রায়ের মত সুশ্রী ও সুপুরুষ আকৃতির লৌকিক দেবতা বিরল। হিন্দুযুগীয় রাজা বা রাজযোদ্ধার বেশ, সঙ্গে বহু প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি দু'এক স্থানে এঁর হাতে মুঙ্গেরী বন্দুকও দেখা যায়। কোন কোন স্থানে এঁর বাহন ব্যাঘ্র, কোন স্থানে অশ্ব। বাহনহীন অবস্থাতেও যোদ্ধাবেশী দক্ষিণরায়ের মূর্তি দেখা যায়, সেক্ষেত্রে তাঁর পাশে ব্যাঘ্র বা অশ্বের মূর্তিও থাকে। দক্ষিণরায়ের মনুষ্যাকৃতি বিগ্রহ অপেক্ষা এঁর বারা বা মুখচিত্রিত ঘট প্রতীক অধিক পূজিত হয়। উক্তরূপ ঘট প্রতীক প্রায় সর্বত্র দু'টি থাকে। কোন স্থানে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে একটি নারীমুখ-চিত্রিত ঘট থাকে, সেটি ভক্ত সমাজে দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীর ব'লে পরিচিত। কোন কোন স্থানে ঐরূপ দু'টি বারাই পুরুষ মুখ-চিত্রিত দেখা যায়; সেক্ষেত্রে একটি দক্ষিণরায়, অপরটি তাঁর সহচর বা ভ্রাতা কালুরায়ের প্রতীক বিশ্বাসে ভক্তেরা পূজা ক'রে থাকেন। বারা প্রতীকে দক্ষিণরায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর মাতা বলে কথিত নারায়ণীর সঙ্গে পূজিত হন।" (বাঙলার লৌকিক দেবদেবী-গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি। পৃঃ ১৫৫)।

দক্ষিণরায় সম্পর্কে নানান কাহিনী প্রচারিত। অনেকের বিশ্বাস তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ নগরের মুকুট রায়ের সেনাপতি। বড়খাঁ গাজি একপাল বাঘ নিয়ে ব্রাহ্মণনগর অধিকার করে রাজকুমারী চম্পাবতীকে বিয়ে করেন। পরাস্ত সেনাপতি দক্ষিণরায়

পালিয়ে যান সুন্দরবন। পরে গাজির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে, ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকেন। বাঘের সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না। বিস্তর বাঘ তিনি মেরে ছিলেন। যা কারণে তিনি বাঘের দেবতার প্রসিদ্ধি পান। বহু পুঁথি বা গাঁথায় দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে।

ধর্মঠাকুর আর একজন জনপ্রিয় লোকদেবতা। এঁরও অগুন্তি নাম। যেমন, বাঁকা রায়, ক্ষুদি রায়, পুরন্দর, কালাচাঁদ, যাত্রাসিদ্ধি রায়, মতিলাল, স্বরূপরায়, বৃহদাক্ষ, সুন্দর রায়, চাঁদরায় প্রভৃতি। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজন উৎসবের প্রচলন বেশি। বর্তমানে ধর্মঠাকুর উচ্চ হিন্দু সমাজে পূজিত। ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার রেওয়াজ চালু হয়েছে। অবশ্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মঠাকুর পূজার প্রচলন বেশি। যোদ্ধাবেশী মূর্তি কল্পনা হলেও, প্রস্তর খণ্ড, মাটির ঢেলা, বৃক্ষশাখা, কূর্ম প্রতীক, ঘট প্রতীক, পোড়ামাটির ঘোড়ারূপেও কল্পিত।

বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ বা পঞ্চাননের সঙ্গে শিবের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। শিবঠাকুর শ্বেতবর্ণ। আর বাবাঠাকুরের গায়ের রঙ লাল এবং মুখ উগ্রভাবপূর্ণ। বাহনও দৃষ্টি শোভন নয়। ষাঁড়, ভালুক, বামন, মামদো ভূত, গোভূত নিয়ে এঁর অবস্থান। দুই সহচরের আকারও ভয়ঙ্কর। তারা হলেন 'পেঁচো-খেঁচো' বা ধনুষ্টঙ্কার। বাবাঠাকুরের পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়ার প্রথা আছে। নাথ সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিতের কাজ করলেও, ব্রাহ্মণরা শিবরূপে পূজা করেন।

দেবী বিশালাক্ষী, বাসলী বা বাসুলী সাধারণতঃ মৎসজীবী সমাজে অধিক পূজিত। এই লৌকিক দেবীকে শাস্ত্রীয় দেবী হিসাবে কেউ কেউ স্বীকৃতি জানালেও, বজ্রযান বা সহজযানী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবী বা সহজিয়া বৈষ্ণব দেবীও মনে করেন অনেকে। তান্ত্রিক দেবীও মনে করা হয়।

মৎসজীবীদের আর এক দেবতা মাকাল ঠাকুর। দেবতার কোন মূর্তি কল্পনা হয় না। দুটি মাটির ঢিবি হল দেবতার প্রতীক। যে কোন সময়ে এই দেবতার পূজা হয়।

গ্রাম বা পশুরক্ষক দেবতা আটেশ্বরের গায়ের রঙ হালকা নীল, মাথায় পাগড়ী। মাথায় চুল ঝাকড়া করা। পরনে হলুদ রঙের কাপড়। ডান হাতের মুগুরে কাটা বসানো। কোথাও কোথাও তাঁর রাজবেশ। চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরেও আটেশ্বরের পূজার প্রচলন রয়েছে। অবশ্য মেদিনীপুরে মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। চর্মদেবতা ঘাটুদেবতা বা ঘণ্টাকর্ণের কল্পনা বিচিত্র। দেবতার মূর্তি নেই।

বনের দুর্গন্ধযুক্ত ফুল দিয়ে পূজা হয়। কালো হাঁড়ি, কড়ি, ছেঁড়া কাপড়, গোবর প্রভৃতির সাহায্যে তাঁর মূর্তি কল্পনা।

হাঁড়ি ঝির পাকা মন্দির আছে সোনারপুর রেলওয়ে জংশনের কাছে। কোন বিগ্রহ নেই। মুণ্ডমূর্তি পূজা পান। সুন্দরবনের কোথাও কোথাও গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পিত।

কালু রায় বাঘ বা কুমীর দেবতারূপে পূজিত।

ওলাওঠা বা কলেরা রোগের নিরাময়কারিনীরূপে দেবী ওলাবিবির কল্পনা। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পূজা করে।

বন রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি বাঘের দেবী হিসাবে কল্পিত। মুসলমানরা পূজা করলেও, হিন্দুদের শ্রদ্ধেয়।

হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র চব্বিশ পরগণা। যে সব লোকদেবতার উল্লেখ করা হল তাদের কয়েকজন মুসলমান সমাজে পূজিত হচ্ছেন। যেমন ওলাবিবি। এবং তারা হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের কাছেও আরাধ্য। বৌদ্ধ-খৃষ্টান-বৈষ্ণব-তান্ত্রিক নানান ধর্ম বিশ্বাসীরাও এই জেলায় সহাবস্থান করছেন সুদীর্ঘকাল। সুন্দরবনাঞ্চলে আদিবাসী একদা এসেছিল, তাদের প্রভাবও রয়েছে। আর সকল ধর্মমতের সমন্বিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণাংশে ইসলাম ধর্মমত প্রচারিত হয়। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এই ধর্মের পীর-গাজীদের মাহাত্ম্য কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। যা আকৃষ্ট করে অন্য ধর্ম বিশ্বাসীদেরও। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ এই অংশে তেমন প্রবাহিত নয়। বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারকে মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্ম স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। যে কারণে, নিম্ন সমাজের হিন্দুরা এই ধর্মমতকে মেনে নিয়েছিল হিন্দু ধর্মের কঠোর বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্য। পীর বড়খাঁ গাজী, পীর একদিল শাহ, পাগল পীর, পীর হজরত শফিকুল আলম, রওশন বিবি, খুঁড়ি বিবির প্রভাব দক্ষিণাংশে এখনও যথেষ্ট। সেই সঙ্গে মনসা ও শীতলাকে আশ্রয় করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ মাটির কাছাকাছি জীবনকে স্বাভাবিক গতিধারায় অব্যাহত রেখেছে। আর আছেন দেবী চণ্ডী। যে দেবীর সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডী বা দুর্গার কোন সাদৃশ্য নেই। যার মধ্যে তান্ত্রিক ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের মিশ্রণ ঘটেছে।

জেলার উত্তর ও দক্ষিণে দুই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। ভাটপাড়াকে কেন্দ্র করে উত্তরাংশে ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিকাশ ঘটে। যার শিকড় নিম্ন সমাজ পর্যন্ত কোন দিন পেঁছাতে পারেনি। শাস্ত্রীয়

অনুশাসনে ধর্মক্ষেত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। এখানে লৌকিক সংস্কৃতির কোন প্রভাবই পড়েনি। বলা যায়, ভাটপাড়া থেকে বড়িশা হয়ে রাজপুর হরিনাভি কোদালিয়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে ধারা প্রবাহিত ছিল সাধারণ মানুষ সব সময়ই ছিল তার প্রভাব মুক্ত। "নিম্নবঙ্গের জঙ্গলের মধ্যে বিশেষ করে প্রাচীন ভাগীরথী বা আদি গঙ্গার তীরবর্তী নানাস্থানে তান্ত্রিক সাধকরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শক্তি-সাধনার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন দেখা যায়। ছত্রভোগ থেকে আরম্ভ করে মজিলপুর ময়দা রাজপুর বোড়াল কালীঘাট চিৎপুর প্রভৃতি আদি গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলি শক্তি সাধনার কেন্দ্র ছিল।" (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি-বিনয় ঘোষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২৫৪)।

আলিপুর মহকুমা

অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার জেলা সদর আলিপুর নানা ঘটনায় সমৃদ্ধ। মূলত ইংরেজ আগমনের সময় থেকে স্থানটির গুরুত্ব বাড়ে। শোনা যায়, নবাব মীরজাফর এবং প্রণয়িনী মণিবেগমের প্রাসাদ ছিল এখানে। কোথায় ছিল সে দুটি প্রাসাদ তা নিয়ে মত পার্থক্য আছে। কেউ বলেন, চিড়িয়াখানার জায়গায়, কেউ বলেন এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যানের কোথাও। হেস্টিংস এখানে বাস করে গেছেন। সিরাজদৌলা কলকাতা আক্রমণ ও দখল করেন ১৭৫৬ সাল। তিনি কলকাতার নামকরণ করেন আলিনগর। পলাশীযুদ্ধে সিরাজের বিপর্যয়ের পর কলকাতা থেকে আলিনগর নামটি হারিয়ে গেলেও, আলিনগর বা আলিপুর নামটি বেঁচে থাকল। গার্ডেনরীচ, আলিপুর, বালিগঞ্জ এইস্থানগুলি সেকালে স্বাস্থ্যকর ছিল। যে কারণে, এসব এলাকায় ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের বড় বড় বাগানবাড়ি তৈরি হয়। তার বেশির ভাগেরই চিহ্নমাত্র নেই।

জাফর আলিখাঁ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কলকাতায় আসেন বসবাসের জন্য ১৭৬০ সালে। আলিপুরে তার বসবাসের ব্যবস্থা হয়। বেগম বাড়ি ও সাহিব বাগান ছিল তার বাসস্থান। তাছাড়া বেশ কিছু বাড়ি ছিল তার সঙ্গীদের বসবাসের জন্য। ঠিক কোন বাড়িটায় জাফর আলি বাস করতেন সে বিষয়ে সঠিক নির্ণয় করা শক্ত। তবে অনুমাণ করা যায় বর্তমান জজ কোর্টের কাজেই কোন বাড়িতে তিনি বাস করতেন। ১৭৬৩ সালে পুনরায় নবাবপদ লাভের পর হেস্টিংসকে এই বাড়ি, বাগান ও যাবতীয় জমিজমা দান করেন। আলিপুরে হেস্টিংস নতুন বাড়ি তৈরি করেন এবং ভারত ত্যাগের সময় পর্যন্ত এই বাড়ি ছিল তার দখলে। বর্তমানে পরিচিত হেস্টিংস হাউসের পশ্চিমদিকের একটি বাড়িতে হেস্টিংস প্রথম বাস করতেন। পরে নিজের তৈরি বাড়িতে উঠে যান। হেস্টিংস তার আলিপুরের বাড়ি ও জমি তিনটি লটে বিক্রি করে দেন। কাগজে বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুটি লট কেনেন যথাক্রমে টার্নার ও জ্যাকসন এবং তৃতীয় লটটি কেনেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি হনিকম্ব। লর্ড কার্জন, হেস্টিংস হাউস কিনে ভারতীয় রাজন্যদের অতিথি ভবন হিসাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখেন। সে সময় বাড়িটি দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়েছিল চারদিকের বিরাট উদ্যানজুড়ে নানা ধরনের মূল্যবান গাছ লাগিয়েছিলেন হেস্টিংস।

বেলভেডিয়ার হাউসে জাফরআলী বাস করেন নি। বেলভেডিয়ার এবং এগ্রি-

হার্টিকালচারলে সোসাইটির বাগানে বেশ কিছু বাড়ি ছিল। পুকুরের পূব পাড়ে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধি ছিল গত শতকের শেষ পর্যন্ত। এটি পরিচিত ছিল বেগমের সমাধি নামে। ১৮৯০ সালে এটি সমান করে, তার ওপর গাছ লাগান হয়।

জাজেস কোর্ট রোডের দক্ষিণ দিকে হেস্টিংস হাউস বাড়িটির খবর একালের অনেকের অজানা। একটি প্লেটে লেখা ছিলঃ "হেস্টিংস হাউস নামে পরিচিত এই বাড়িটি ছিল ১৭৭৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের পল্লীভবন। ১৯০১ সালে ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালার জন্য বাড়িটি কিনেছিলেন।" লর্ড কার্জন বাড়িটির ব্যাপক সংস্কার করেন।

এই বাড়িতেও ওয়ারেন হেস্টিংস তার দ্বিতীয় পত্নী মেরিয়ানকে নিয়ে থাকতেন। মহিলা বিলেত চলে যাওয়ার পর হেস্টিংস তাঁর সেই বিখ্যাত প্রেমপত্র 'প্রিয়তমা মেরিয়ান' লিখেছিলেন। ১৭৮৫ সালের পর তিনবার বাড়ি সমেত সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়। এখন জজ কোর্টের সম্পত্তি। পরে মহিলা শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

হেস্টিংসের সময়ে বেশ কিছু পয়সাওয়ালা মানুষ আলিপুরে বাড়ি করেন। তিনি বেশির ভাগ সময় আলিপুরে থাকতেন। হেস্টিংসের বন্ধু বারওয়েল এবং শত্রু ফিলিপ ফ্রান্সিসেরও বাড়ি ছিল আলিপুরে। এরা দুজনেই ছিলেন কাউন্সিল সদস্য। ১৮৫৪ সালে নিম্ন বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হলে, বাঙলার লেফটন্যাণ্ট গভর্নরের বাসভবন স্থাপিত হয় আলিপুর। তাছাড়া প্রেসিডেন্সি ডিভিশন ও চব্বিশপরগণার সদরও স্থাপিত হয় এখানে। একদল ভারতীয় সেনা স্থায়ীভাবে এখানে ছিল। তাদের জন্য একটি ব্যারাকও গড়ে তোলা হয়। আলিপুরে তৈরি হয় ডিস্ট্রিক্ট জেল। তাছাড়া ছিল সেনাবাহিনীর পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরী, সরকারী টেলিগ্রাফ দপ্তরের গুদাম ও ওয়ার্কশপ এবং ভ্যাকসিনেশন স্টেশন। আলিপুর ব্রিজের কাছেই ছিল একটি বিখ্যাত বটগাছ—যার নিচে ডুয়েল লড়ত সেকালের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজরা।

আলিপুর যেতে টলির নালা পেরোতে হবে। একসময় বলা হত আদিগঙ্গা, গোবিন্দপুর খাল বা সুরমানের নালা। এই এডওয়ার্ড সুরমান ১৭১৫ সালে দিল্লির দরবারে প্রেরিত মিশনের নেতা ছিলেন। কাছেই সুরমানের যে বাগানবাড়ি ছিল, সেটি পরে হেস্টিংসের বাড়ি নামে পরিচিত হয়। সুরমান খালের আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ১৭৭৫ সালে কর্নেল টলিকে খালটি বার বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়। তিনি নিজের খরচে নালাটি কাটেন। তার নাম থেকে

টালিগঞ্জ শব্দটির সৃষ্টি। যাই হোক কর্নেল টলি খালে যাতায়াতকারী নৌকো থেকে শুল্ক আদায় করতেন। এবাবদ মাসে আয়ের পরিমাণ ছিল ৪,৩০০ টাকা। খাল কাটা শেষ হওয়ার পর টলি বেশিদিন বাঁচেন নি। ১৮২০ সালের মধ্যে খালে ছফুট পলি জমে যায়।

বেলভেডিয়ার হাউসের যেদিকে বর্তমানে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগান, তার কাছেই ছিল ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাগানবাড়ি। সেখানে পরে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আবাস হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। বাড়িটি ছিল বেলভেডিয়ারের জমির আওতাভুক্ত। সরকার বেলভেডিয়ার হাউস কিনেছিল ঐ বাড়িটি বাদ দিয়ে। ঐ বাড়িসহ ১০০ বিঘা জমি বিক্রির ব্যবস্থা হলে, সরকার সেই জমি কিনে নিয়ে চল্লিশ বিঘা জমি বেলভেডিয়ারের সঙ্গে যুক্ত করে এবং ৬০ বিঘা জমি দেওয়া হয় এগ্রি-হর্টি-কালচারাল সোসাইটিকে। সে সময়ে ঐ জমিতে যে পুরনো বাড়িটি ছিল, সোসাইটির বাড়ি তৈরির সময় সেটি ভেঙে ফেলা হয়।

ফ্রান্সিসের বাগানবাড়ি ছোট হলেও, পাশের জমি ছিল বেলভেডিয়ার থেকেও বেশি। আর সেই জমির তিনদিকে টলির নালা এবং একদিকে বর্তমান জেলখানা ও অন্যান্য বাড়ি গড়ে উঠতে থাকে। ফ্রান্সিস এদেশে আসবার এক বছর বাদে ১৭৭৫ সালে এই সম্পত্তি কেনেন এবং ১৭৮০ সালে ভারত ছেড়ে যাওয়ার ছমাস আগে এই জমি বন্ধু লিভিয়াসের কাছে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে যান।

হেস্টিংস হাউসে ১৯১৫ সালে একটি বয়েজ স্কুল চালু হয়েছিল।

বর্তমানে আলিপুরে বেলভেডিয়ার ভবনে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী অবস্থিত। উত্তর দিকে জিরাট ব্রিজ বরাবর প্রবেশপথের ওপর একটি সিংহীর মূর্তি। সুসজ্জিত গাছপালার মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা। দুটো পিতলের কামান সামনে সাজানো। কামান দুটি ১৮৫৬ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাশীপুরে বানিয়েছিল।

বাড়িটি কোনসময়ে তৈরি সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কে যে প্রথম মালিক তারও সঠিক কোন বিবরণ নেই। তবে জানা যায় ১৭০০ সালে আজিম-উস-সাম এই বাড়িটি বানিয়েছিলেন। লং সাহেব বাড়িটিকে হেস্টিংস হাউস নামে উল্লেখ করেছিলেন ১৭৬২ সালে। এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ামের কাগজপত্রে দেখা যায়, "মিঃ হেস্টিংসের বাড়িটি নবাবের সম্বর্ধনার জন্য কেনা হয়েছে।" কোম্পানির কোন উৎসবের সময় মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম এখানে এসে বাস করতেন। এ সময়ে নবাব প্রতিদিন হাত খরচ পেতেন এক হাজার টাকা।

ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর মিঃ কার্টিয়ার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের পদ ত্যাগ করলে, ওয়ারেন হেস্টিংস তার স্থলাভিষিক্ত হন। টলির নালার বিখ্যাত মেজর টলি ১৭৮০ সালে বেলভেডিয়ার হাউস কেনেন। এ বছর ১৭ আগস্ট গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে ডুয়েলে আহত ফিলিপ ফ্রান্সিস এই বাড়িতে এসে ওঠেন। ১৮৭৪ সালে মেজর টলি মারা যান। বছরে ৩৫০ পাউন্ডে বাড়িটি ভাড়া নেন মিঃ ব্রুক। এই ভাড়ার টাকা দেওয়া হত লণ্ডনে। ফোর্ট উইলিয়ামের কমাণ্ডার-ইন-চীপ জেনারেল স্যর এডয়ার্ড পেগেট ১৮২২ থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত তার সরকারী বাসস্থান হিসাবে বেলভেডিয়ার হাউসে বসবাস করেছিলেন। তারপর বাড়িটি কিনে নেন অ্যাডভোকেট জেনারেল চার্লস প্রিন্সেপ। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ৮০ হাজার টাকায় বাড়িটি বিক্রয় করে দেন ১৮৫৪ সালে। এই সময় থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ছিল বাঙলার লেফন্যাণ্ট গভর্নরের বাসভবন।

একসময় এই ভবন বিভিন্ন ইংরেজ শাসকের মূর্তিতে ছিল সুসজ্জিত। পমেরয়ের তৈরি লর্ড কার্জনের শ্বেতপাথরের মূর্তি ছিল। পাঁচটি ছোট কাচের দরজা দিয়ে বল নাচের ঘরে ঢুকতে হত। গোটা বাড়িটা ছিল দোতলা। দুসারি স্তম্ভে সাজানো প্রাসাদের বাইরের দিক। স্তম্ভগুলির ওপরিভাগ করিন্থিয়ান এবং নিচের দিকে ডোরিক শিল্পকলা নিদর্শন সমৃদ্ধ। প্রবেশ পথের ওপরিভাগ ছিল রাজকীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত। দক্ষিণ বারান্দায় ছিল ক্লাইভ, ওয়েলেসলি এবং ডালহৌসির মূর্তি।

বিভিন্ন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর বেলভেডিয়ার হাউসের নানারকম পরিবর্তন করেছিলেন। স্যর ইডেন মাঝখানের প্রবেশপথ ও প্রধান বলরুমের মেঝেতে কাঠের প্লাটফরম তৈরি করেন। ব্রেকফাস্ট রুম বানান স্যর স্টুয়ার্ট বেইলি। পশ্চিম দিকের দোতলা বানান স্যর চার্লস ইলিয়ট। স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি আনেন বৈদ্যুতিক আলো। স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার সুন্দর বলরুম তৈরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে তার নিচের সাফার রুমটি।

ভারতের রাজধানী ১৯১২ সালে সরে যায় দিল্লিতে। তারপর থেকে ভাইসরয় কলকাতায় এসে বেলভেডিয়ার হাউসে বাস করতেন। বলরুমে সে সময় বহু বিখ্যাত বলনাচের আসর বসেছিল। উত্তরের প্রবেশপথের কাছেই হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের ডুয়েল অনুষ্ঠিত হয়।

এই ঐতিহাসিক ভবনটিতে অবস্থিত ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী প্রসঙ্গে কিছু পুরোন কথা এসে যায়। এসপ্লানেড রোডে ১৮৩৫ সালে ডঃ এফ স্ট্রঙের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত

হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী। ১৮৪১ সালে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। তার পর মেটকাফ হলে। ১৯০২ সালে নতুন নাম হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। সে সময়ে সরকার এসপ্লানেড ইস্টে লাইব্রেরির জন্য স্থায়ী বাড়ি দেয়। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন সরকারীভাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বইয়ের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। এখন বইয়ের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার। সদস্যা সংখ্যা ১৮,০০০। ২৫,০০০ ব্যক্তি বই পড়তে নিয়ে যান। ৩০,০০০ ওপর বই বছরে সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে ১৮,০০০ হাজার পত্রপত্রিকা জমা পড়ে ডেলিভারি অফ বুক অ্যাক্ট অনুসারে। ৮০০০ হাজার বই ও ৭০০ পত্রিকা বছরে কেনা হয়। বিভিন্ন দেশিবিদেশি সরকারী তথ্য আছে ৫,০০,০০০ এবং ৭২ হাজার ম্যাপ ও ৩০০০ পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

পুরনো বাড়িতে লাইব্রেরীর স্থান সংকুলান না হওয়ায়, নতুন বহুতল বাড়ি বানিয়ে বিভিন্ন দপ্তর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বেলভেডিয়ার ভবনের উত্তর পশ্চিমে ছিল একটি সুবৃহৎ বস্তি, যার ওপর পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে চিড়িয়াখানা। আলিপুরের চিড়িয়াখানা নামে পরিচিত। এশিয়াটিক সোসাইটির কয়েকজন প্রাণী প্রেমিকের উদ্যোগে চিড়িয়াখানার পত্তন। সে হল ১৮৬৭ সালের ঘটনা। ১৮৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর স্যর রিচার্ড টেম্পল কলকাতায় চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার জন্য চারজন উচ্চপদস্থ সরকারী এবং তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি বর্তমান স্থানটিকে চিড়িয়াখানা স্থাপনের উপযোগী বিবেচনা করেন। জমির পরিমাণ ত্রিশ একর। টালির নালার বামদিকে এই স্থানটি তাদের পছন্দ হওয়ার অনেক কারণ ছিল। টালির নালায় জল থাকত সব সময়। জল সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকায়, গাছপালা সহজে বাড়তে পারত। তাছাড়া ছিল সুন্দর লতাপাতার ঝোপ। জায়গাটা এমনই যে, এখানে চিড়িয়াখানা স্থাপনের সকল সুবিধাও ছিল। জনগণের আসা যাওয়ার অসুবিধা হবে না। সরকার সম্মত হওয়ায় বস্তির জমি দখল করা হয়। অনারোরী ম্যানেজিং কমিটির হাতে জমিটি তুলে দেওয়া হয়। স্থির হয় তারাই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

বাঙলা সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতার ১৮৭৫ সালে চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ সালের ১ জানুয়ারি সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন প্রিন্স অফ ওয়েলস) উদ্বোধন করেছিলেন। কলকাতার বহুগণ্যমান্য ব্যক্তির দান তো ছিলই, তার উপর বর্ধমানের মহারাজা ৩০ হাজার টাকা এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকে

২ হাজার টাকা চিড়িয়াখানার তহবিলকে পুষ্ট করে। ভারতীয় তার বিভাগের কর্মী মিঃ কার্ল শয়েন্ডলার তার অনেক আকর্ষণীয় সংগ্রহ দান করেছিলেন এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার সময়। বাগানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

(1) To provide recreation, instruction, and amusement for all classes of community

(2) To facilitate scientific observation of the habits of wild animals generally and in particular of those peculiar to tropical climates.

(3) To encourage the acclimatisation, domestication and borceeding of animals and birds.

(4) To promote zoology as a science by means of interchange, import and export of animals.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিড়িয়াখানার অবস্থা সব থেকে করুণ হয়ে উঠেছিল। বাগানটি মিলিটারি নিয়ে নেয়। বুলডোজার, ট্রাক, ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় সমস্ত সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। অনেক বৃহৎ আকারের মাংসাশী প্রাণী মেরে ফেলা হয়। কতকগুলি দানও করে দেওয়া হয়। সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয় মিলিটারি সরিয়ে নেওয়ার পর। অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে চিড়িয়াখানার আবহাওয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। এর জন্য স্থানীয় কর্মীদের অবদান কম নয়। স্বাধীন ভারত সরকার চিড়িয়াখানার উন্নতির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮'০৫ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব অনারারী কমিটির ওপর আছে। ১৯৫৭ সালের আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন রুল অনুযায়ী এর কর্তৃত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক সাহায্য করে থাকে। কর্পোরেশন তার প্রাপ্য বাৎসরিক ট্যাক্স্ গ্রহণ করে না। চিড়িয়াখানার বাৎসরিক আয় পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি। খরচ অবশ্য এর থেকে অনেক বেশি। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার সঙ্গে সরকারী অনুদান মিলিয়ে চলে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়। বৎসরে প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ এখানে আসে।

একটি হিসাবে পাওয়া যায়—১৮৯০-৯১ সালে ১০ লক্ষ ১৬ হাজার দর্শকের গেট ফি বাবদ আদায় হয়েছিল ৭ হাজার ৩০০ টাকার মত। ১৯০২-৩ সাল পর্যন্ত এখানে স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা ছিল ৫০৪, পাখি জাতীয় প্রাণী ২৪৬। ১৯০৬-০৭ সালের একটি হিসাব থেকে জানা যায়, ঐ সালে চিড়িয়াখানার দর্শক সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৫৪

হাজার। বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩০২ টাকা। ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৯ হাজার ১১১ টাকা। ঐ সালেই চিড়িয়াখানা-পরিবারে আরও ১৯২ টি স্তন্যপায়ী জীব, পাখি এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী দান হিসাবে সংযোজিত হয়।

যদিও দর্শনীর পরিমাণ এখন বাড়ছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে দর্শকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শাদাবাঘ ও মিনি-চিড়িয়াখানার জন্য লাগে আলাদা দর্শনী। চিড়িয়াখানার দক্ষিণপ্রান্তে (স্ট্রানডেল রোডে) ১৯৬৪ সালে একটি নতুন প্রবেশপথ চালু করা হয় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে। আগের তুলনায় আকর্ষণ অনেক বেড়েছে। সরীসৃপ ভবন, বর্ধমান হাউস (বাঘের খাঁচা), মুক্তাঙ্গন বাঘ, দর্শন ও শ্রবণকেন্দ্র, পোক ঘর আছে। শতবর্ষের আগেই শীলমাছের পুল ও মাছের জন্য দুটি সুদৃশ্য ভবন নির্মিত হয়। বিশ্রামাগারটিও সুসজ্জিত করা হয়। পঞ্চাশটি কামরাযুক্ত গোলাকার সরীসৃপ ভবনের জন্য ব্যয় হয় প্রায় আট লক্ষ টাকা। ঐ ভবনের মাঝখানে কুমীরের আবাস। মাছ ঘরের জন্য খরচ হয় সাত লক্ষ টাকা।

হাতি, জিরাফ, বাইসন, জলহস্তী, খুরওয়ালা ও শিঙওয়ালা নানাপ্রকার জন্তু, নানা শ্রেণীর বানর—বিশেষ করে গিবন, ওরাংওটাং দর্শকদের আকৃষ্ট করে। সরীসৃপের সংগ্রহ রেপটাইল হাউসে সংরক্ষিত। পাখির সংগ্রহ সব থেকে মূল্যবান। দেশবিদেশের নানারঙের পাখি আছে। সবই খাঁচায় আটকানো। কিন্তু দেখবার চমৎকার ব্যবস্থা। একজোড়া সাইবেরিয়ার উসুরী বাঘ দর্শকদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। হরিণের বেশ কয়েক ধরনের নমুনা আছে। হরিণগুলির সবই প্রায় থাকে খোলা জায়গায়। অ্যান্টিলোপ, নীলগাই, জাইনোসরস, হাতি, আফ্রিকান ও ইণ্ডিয়ান লায়ন, সাধারণ বাঘ, শাদা বাঘ, জাগুয়ার, পুমা, লিওপার্ড, ব্ল্যাকপ্যান্থার, গোল্ডেন ক্যাট, জেব্রা, ভালুক, ক্যাঙারু, বনমানুষ, পিগমিহিপো, উটপাখি, এমু, কাকাতুয়া, প্যারাফিট, ডাভ, লেসারপাণ্ডা, এাকিডনাহোয়াইট বাক, হোয়াইট মংগুজ, হোয়াইট ক্রো, ক্লাউডেড লেপার্ড, হগ ব্যাজার, কাঁকড়াখেকো মাংগুজ, ইন্ডিয়ান প্যানগালিন, সম্বর হরিণ, ইণ্ডিয়ান রেটেল, লেপার্ড ক্যাট, ক্যাপড ল্যাংগুর, কাঠঠোকরা—প্রভৃতি পুরোন নতুন সংগ্রহ যারা দেখেছেন তাদের কাছে চিড়িয়াখানার আকর্ষণ একদিনের নয়, বহুবারের, অনেকদিনের। বয়সে প্রবীণ সাদা কাকাতুয়া একসময় দর্শকদের আকৃষ্ট করত। মার্কিন মুল্লুকের একটি বকের টকটকে লাল রঙ ফিকে হয়ে যেতে দেখেছে বহু দর্শক। গাছের মধ্যে সবচেয়ে বড় আফ্রিকার বাওয়ার বৃক্ষ। চারটির মধ্যে একটি শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। 'হিমাদ্রি' 'নিলাদ্রি' ও 'মালিনী'—এই তিনটি বাঘ এক সময় চিড়িয়াখানার আকর্ষণ বাড়িয়েছিল। মধ্য প্রদেশের জঙ্গল থেকে

রেওয়ার মহারাজ ১৯৫১ সালে একটি শাদা বাঘ ধরেন। বাঘটির নাম রাখা হয় মোহন। মোহনের সঙ্গে সাধারণ রঙের একটি বাঘিনীর মিলনের ফলেই ১৯৬০ সালের ১৮ জুন 'হিমাদ্রি' ও 'নীলাদ্রি' শাদা বাঘ দুটির জন্ম হয়। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেওয়ার মহারাজার কাছ থেকে বাঘ দুটি কিনে নিয়ে চিড়িয়াখানায় দেন। 'মালিনী' হল সাধারণ রঙের বাঘিনী। হিমাদ্রি নিলাদ্রির সহজাত ভগিনী। পশুশালার কর্তৃপক্ষ একে বিনিময় ভিত্তিতে সংগ্রহ করেন।

টোকিও চিড়িয়াখানা থেকে উপহৃত বৃহৎ আকারের স্যালামানডার এবং একজোড়া ব্রাউনবিয়ার আছে। তাছাড়া আছে বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারের মাংসাশী জন্তু। চিড়িয়াখানায় ছিল দুটি সুবৃহৎ কচ্ছপ ১৮৭৫ সাল থেকে। সে দুটি মারা গেছে কয়েক বছর আগে।

একটি চিলড্রেন্স কর্ণার আছে। এখানে আছে বসবার সুন্দর জায়গা, একটি লাইব্রেরী, পাখিদের ছোট ছোট ঘর এবং শিশুদের জন্য নানারকম আনন্দদায়ক ব্যবস্থা।

অসংখ্য পাখি আছে খোলা জায়গায়। মাঝখানে সুন্দর লেক। ছোট ছোট দ্বীপগুলি গাছ ও ফলে ভর্তি। এখানে জলপ্রেমিক ডানাওয়ালা পাখিরা এসে ভিড় করে। বাগানে আছে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গাছপালা। এর মধ্যে ফল দেয় না, কেবলমাত্র ফুল দেয় এমনও গাছ আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়।

আলিপুরে এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার উদ্যান আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রথমে নাম ছিল 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি'। পরে 'হর্টিকালচারাল' যুক্ত হয়। ডঃ উইলিয়াম কেরী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"I hope it will ultimately be of great benefit to the country and contribute to prepare its inhabitants for the time when they shall beat their swords into plough shears and spears into pruning books."

আলিপুরে পঁচিশ একর জমির ওপর সোসাইটির বাগানটি দেশীবিদেশী প্রতিটি মানুষেরই আকর্ষণের বস্তু। বহু দুষ্প্রাপ্য সুদৃশ্য গাছের সংগ্রহ আছে এখানে। আপেল, কমলালেবু, নেশপাতি, কিশমিশ, পীচফল, আঙুর বিদেশ থেকে এনে উপযুক্ত আবহাওয়ায় চাষ শুরু হয়েছিল। সোসাইটি ভারতে কৃষি উন্নতি ও উদ্যান রচনায় এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। একদিকে যেমন ভারতের খাদ্যসমস্যা সমাধানে দেশীবিদেশী শস্যবীজ এনে গবেষণা চলেছিল, অপরদিকে চলেছিল ভারতকে

আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলবার সাধনা। অবশ্য সে সব এখন হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস মাত্র।

'এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের ডঃ উইলিয়াম কেরীর নামই সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। কেরী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্ভিদ প্রেম। শ্রীরামপুরে ছিল দেশীবিদেশী গাছপালায় ভর্তি তার একটি বাগান। ১৮১৪ সালে বন্যার জল এই বাগানটি নষ্ট করে দেয়। বাঙলা দেশের গাছপালা, বাঙলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি এবং কৃষি গবেষণায় কেরীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। বোটানিক গার্ডেনের রক্সবারো এবং নাথানিয়েল ওয়ালিচ দুজনই ছিলেন তার বন্ধুস্থানীয়। এই বাগানে কেরী অনেক দেশী এবং বিদেশী গাছপালাও দান করেছিলেন। রক্সবারোর উদ্ভিদ সংক্রান্ত তিনখণ্ডের মূল্যবান গ্রন্থও কেরী প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর কেরী টাউনহলে একটি সভা ডেকেছিলেন। বত্রিশজন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে সভা ডাকা হলেও উপস্থিত ছিলেন মাত্র সাতজন। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং রামকমল সেন উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সভায়। কেরী অস্থায়ী সম্পাদক হলেন, রামকমলও সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। লর্ড ও লেডী হেস্টিংস ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। শ্রীরামপুরে মিশনের জোসুয়া মার্শম্যান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৮২০ সালের ২ অক্টোবর তেরজন সদস্য নিয়ে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তার মধ্যে ছিলেন ঃ রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জন পামার, জেমস কীড, জোসুয়া মার্শম্যান এবং কয়েকজন। ১৮২২ সালে নাথানিয়েল ওয়ালিচ সোসাইটির স্থায়ী সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাধাকান্ত দেব মাত্র প্রথমদিকে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেরী সম্পাদক পদ ত্যাগ করলেও পরে সভাপতি হয়েছিলেন।

টিটাগড়ে জমি কিনে সোসাইটি সেখানে উঠে যায়। এই জমিতে নানারকম চাষ আবাদ সুরু হয়। এদেশের কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি দ্রব্যাদি সম্পর্কে গভীর গবেষণামূলক কাজের সৃষ্টি হয়। ১৮৩৮ সাল থেকে পুস্তক প্রকাশ হতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি ছিল ঃ "এগ্রিকলচুরেল সোসাইটি হইতে এদেশের কৃষি বৃদ্ধির নানা উপায় বাঙ্গলা ভাষায় সংকলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিতানন্তর প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তক পাঠে কৃষি কারিদিগের ও তদ্বিষয়ে উৎসাহবন্ত লোক সকলের বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে

পারিবে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে ঐ পুস্তক অল্প মূল্যে এগ্রিকলচুরেল সোসাইটির কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহারা প্রয়োজন হয় উক্তস্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। তৃতীয়খণ্ড অবধি প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য দুই আনামাত্র। ই, এফ, ক্লোইস্ট। অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি।”

এখানকার সভার কৃষিবিষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হত। ১৮৪২ সালে সোসাটির মুখপত্র 'মন্থলি জার্নাল' প্রকাশিত হয়। কৃষিদ্রব্যের বাৎসরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল।

টিটাগড়ে সাত বৎসর থাকবার পর, সোসাইটির বাগান উঠে আসে আলিপুরে। এই জমি এবং আক্রায় পরীক্ষা কাজের জমি সরকার থেকে পাওয়া। কৃষি বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ হল অন্যতম উদ্দেশ্য। এর থেকে উৎপন্ন ফসল প্রদর্শনীতে নিয়ে আসা হত এবং শ্রেষ্ঠ চাষী পুরস্কৃত হত। সোসাইটির উপযুক্ত ও সার্থক কার্যক্রম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকার বাৎসরিক দশ হাজার টাকা সাহায্য দিতে রাজী হন।

সোসাইটির নাম বহুদেশে ছড়িয়ে পড়ে ১৯০০ সালের মধ্যে। বাঙলাদেশের মধ্যে কয়েকটি স্থানে শাখা স্থাপিত হয়। তাছাড়া মীরাট, লক্ষ্মৌ, মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর, দানাপুর, বাঙ্গালোরেও শাখা স্থাপিত হয়েছিল। বাঙলা ও ভারতের বাইরের কৃষি দ্রব্য এখানে নিয়ে আসা হয়। সোসাইটি যখন বোটানিক গার্ডেনে, তখন দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সিনকোনা চাষের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয় ১৮৫২ সালে। এদেশে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য কুইনাইন অত্যাবশ্যক। এই সিনকোনা গাছ থেকেই কুইনাইন পাওয়া যাবে। বোটানিক গার্ডেনে সিনকোনার চাষ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৬১ সাল থেকে। তাছাড়া সোসাইটির চেষ্টায় আমেরিকা থেকে তুলা ও শস্যবীজ, পশ্চিম আফ্রিকা, চীন ও ম্যানিলা থেকে শস্যবীজ, মরিসাস থেকে ইক্ষু, উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ফুল কফির বীজ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে তুলার বীজ, যব, নানা রকমের ধানের বীজ এনে চাষাবাদ শুরু হয়। পাটনায় ফুলকপির চাষ সফল হয়। এই সমস্ত শস্যের বীজ বিনামূল্যে দেওয়া হয় চাষীদের।

সোসাইটির সমস্ত টাকা পয়সা ছিল আলেকজাণ্ডার কোম্পানিতে। এই এজেন্সী হাউসই ছিল সেকালের ব্যাঙ্ক। ১৮৩৩ সালে হাউসটি ফেল পড়ায় সোসাইটির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। আলিপুর ও আক্রার জমি সরকার নিয়ে নেন। কিন্তু সোসাইটির উদ্যোগীরা নীরব হয়ে গেলেন না। ১৮৩৬ সালে শিবপুর বোটানিক

গার্ডেনে দু একর জমিতে তারা আবার কৃষি কাজ শুরু করেন। পরে গার্ডেন কর্তৃপক্ষ সোসাইটির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আরো তেইশ একর জমি দেন। এখানে চল্লিশ বৎসর ছিল সোসাইটি। তারপর উঠে আসে বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাশের জমিতে। ১৮৭২ সালে সরকার এই জমি সোসাইটিকে দেয়। সর্ত ছিল, যতদিন সোসাইটি থাকবে, ততদিন জমি তারা ভোগ করতে পারবে।

সোসাইটির ছিল বিরাট লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ও অফিস। স্টাণ্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে মেটকাফ হলে ছিল এই তিনটি বিভাগ। এই ভবনটি ভারত হিতৈষী মেটকাফের স্মৃতিতে নির্মিত। ভবন নির্মাণ ব্যয়ের তিন ভাগের এক ভাগ ছিল সোসাইটির টাকা। ১৮৪৪ সালে সোসাইটি এই টাকা দেয়। ১৯০০ সাল পর্যন্ত একতলাটি সোসাইটির অধিকারে ছিল। ইতিমধ্যে সরকারি কৃষি বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। ফলে সোসাইটি সরকারি আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। নিজস্ব আয়ে সোসাইটির বিস্তৃত কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর ১৯০০ সালে পাবলিক লাইব্রেরীর (পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) জন্য সমগ্র মেটকাফ হলটি নেওয়া হয়। সোসাইটিকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় এজন্য। সোসাইটি এরপর আলিপুরের জমিতে উঠে আসে। স্থির হয় সরকার বছরে ছয় হাজার টাকা সাহায্য দেবে। এতদিন সোসাইটি নিজস্ব কর্মধারা রেখেছিল বিস্তৃত। এবার সংক্ষেপকরণ ঘটতে থাকে। ফুল উৎপাদন ও উদ্যান রচনা, পুষ্পসজ্জা ও বিতরণ কাজটিই মুখ্য হয়ে ওঠে। একসময়ে যে সোসাইটির উদ্যানে উন্নতধরণের চাষ নিয়ে গবেষণা চলেছে, সিনকোনা, তামাক, গোল আলুর উন্নত ধরণের চাষ পরীক্ষিত হয়েছে, কালক্রমে তার রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্তমান উদ্যানে বিড়লা ব্রাদার্সের দানে একটি ল্যাবরেটরী ও চারটি গ্লাস হাউস তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত গ্লাস হাউসে আবহাওয়া সংরক্ষণ করে উদ্ভিদ গবেষণা সম্ভব। তাছাড়া চারা গাছ, বীজসংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য কয়েকটি গ্লাস হাউসেও আছে।

আলিপুরে অবস্থিত আবহাওয়া অফিস একটি গুরুত্ব পূর্ণস্থান। ১৮৭৫ সালে এই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সাল থেকে দৈনিক আবহাওয়া বুলেটিন প্রচার হতে থাকে। ধীরে ধীরে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসান হয়। ১৯২৬ সালে সিমলা থেকে স্টর্ম ওয়ার্নিং সার্ভিস সরিয়ে আনা হয় আলিপুরে। ইণ্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকায় আলিপুর আবহাওয়া অফিস ওপর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম ও

ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এই কেন্দ্র। বেসামরিক, সামরিক জাহাজ চলাচল, কৃষি, অরণ্য, চাষাবাদ, জনসাধারণের জন্য আবহাওয়া অফিস গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আলিপুরে বিশ্বের সব থেকে কর্মব্যস্ত টাকশালটি অবস্থিত। ১৯৫২ সালের ১ মার্চ এই ভবনটিতে টাকশালের উদ্বোধন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সি ডি দেশমুখ। কোন বিদেশী সহযোগিতা ছাড়াই পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ও টাকশাল কর্মীরা সম্মিলিতভাবে এই বাড়িটি নির্মাণ করে। খাঁটি তামা ও রুপো গালিয়ে মুদ্রা তৈরির সর্বাধুনিক ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। টাকশাল বানাতে খরচ হয়েছিল ৬০ লাখ টাকা।

ভারত সরকারের এই সুবিশাল বাড়িটি অনেকেই চোখে পড়ে। সারি সারি সাজানো গাছের মাঝখানে সবুজ লনের ভিতর বিশাল স্তম্ভসারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মব্যস্ত টাকশালটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। তারও ইতিহাস আছে। বাঙলার নবাবের প্রতিকূলতায় ১৭৬০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কোন টাকশাল তৈরি হয়নি। যদিও কাগজপত্রে দেখা যায় ১৭৫৭ সালে একটি টাকশাল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটি কোথায় ছিল, তা জানা যায়নি। ১৭৯২ সালে একটি টাকশাল তৈরি হয় বড়বাজার ও চার্চ লেনের মধ্যে কোথাও। ৪৭ স্ট্রান্ড রোডে তৈরি হয় তৃতীয় টাকশাল। ২৪ লাখ টাকা খরচ করে প্রতিষ্ঠিত হয় এই টাকশাল। ক্রমে বিশ্বের সব থেকে কর্মব্যস্ত টাকশালে পরিণত হয়। কিন্তু এখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায়, আলিপুরে নতুন জায়গা নেওয়া হয়। স্ট্রান্ড রোডের টাকশাল বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৩ সালে।

বিষ্ণুপুর

একসময় ছিল সম্পর্ক গ্রামাঞ্চল। দেশবিভাগের পর থেকে লোকসংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। বর্তমানে ২১৩-৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বিষ্ণুপুর থানা এলাকার খুব সামান্য অংশেই আছে শহরের পরিবেশ। তার মধ্যে কন্যানগরেই নাগরিক জীবনের ছাপ পড়েছে। ক্রমশই বাড়ছে। আয়তন ১.৮ বর্গকিলোমিটার কন্যানগরের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববর্তী আমতলার জনসংখ্যা বাড়ছে। এখানেও গড়ে উঠছে নাগরিক জীবনের পরিবেশ। ১৯৭১ সালে কন্যানগরের জন্য সংখ্যা ছিল ৫,৬২৯ জন এবং আমতলার ৩,৯১০ জন। ১৯৮১ সালে দুই এলাকা মিলিয়ে বর্তমান জনসংখ্যা ১২,০৮১ জন। পুরুষ ৬,৩৫৫ ও নারী ৫,৭২৬ জন। শিক্ষিত জনসংখ্যা পুরুষ ৪,৩৮১ নারী ২,৬৭২ জন। বিষ্ণুপুরে দুটি ব্লক ১নং ব্লকের আয়তন ৪৫ বর্গমাইল এবং ২নং ব্লকের আয়তন ৩৭.৪৩ বর্গমাইল।

শিক্ষাব্যবহার দ্রুত প্রসার ঘটছে। প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংখ্যা প্রায় ১৫০। উচ্চবিদ্যালয় সংখ্যা ৪টি। গ্রামগুলিতে সড়কযোগ ছিল না একসময়। এখন স্বচ্ছন্দে চলাচল করা যায়। পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও লক্ষ্যণীয়। কৃষিপ্রধান অঞ্চল হওয়ায় সমবায় কৃষি ঋণ সমিতি গড়ে উঠেছে। মৎসজীবীদের 'পেলান কম্পোজিট ফিস ফারম থেকে চারা পোনা ও জাল প্রস্তুতের জন্য সুতি ও নাইলন সুতো দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে।

বাওয়ালীর জমিদারদের এলাকাভুক্ত ছিল একসময়। বিষ্ণুপুর থানার ঝিকুড়বেড়ে, জয়রামপুর, বাখরাহাট, জয়চণ্ডীপুর, কাঙ্গনবেড়িয়া, নাদাভাঙা, মৎসখালি, ভাড়ু রামকৃষ্ণপুর, নানা দেবদেবীর উৎসব ও মেলায় সারা বছরই ব্যস্ত থাকে।

কাঙ্গনবেড়িয়া গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার মেলা হয় দুদিন। জগন্নাথদেবের দারুমূর্তি আছে। নীলপার্বণ ও শিবপূজা হয় জাঁকজমকের সঙ্গে। একটি শিবমন্দির আছে। তাছাড়া পঞ্চানন্দ, বিশালাক্ষী ও মনসাপূজাও হয়। নাদাভাঙ্গা গ্রামে বহু প্রাচীন গোষ্ঠ উৎসব ও গাজনের উৎসব প্রচলিত। একটি বট গাছের নীচে আছে দেবী ভগবতীর সিংহবাহিনী মূর্তি। মৎসখালি গ্রামে গোষ্ঠ উৎসব, দোল ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ ও শিবপূজার প্রচলন রয়েছে। মনসা, বিবিমা, বড়খাঁ গাজি, শীতলা, পঞ্চানন্দের থান আছে গ্রামে। ভাড়ু রামকৃষ্ণপুরে গোষ্ঠ উৎসব মেলা বসে চার-পাঁচদিন। রাস পূর্ণিমার মেলায় যথেষ্ট জনসমাগম হয়। দুটি উৎসবই শতাধিক বছরের প্রাচীন। পঞ্চানন, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসার থান থেকে এদের প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। গ্রামগুলি কৃষিপ্রধান।

ঝিকুড়বেড়ের 'ভূতের কাছারী' বা বড় কাছারীতে মানুষজন আসে মনস্কামনা পূরণের বাসনায়। একটি প্রাচীন অশ্বত্থগাছের ছায়ায় এই কাছারী। বাওয়ালীর জমিদার রাজকিশোর মণ্ডল পনের কাঠা জমি খাজনা বিলি করেন গোবিন্দচন্দ্র কাঁঠালকে। তখন এখানে একটি শ্মশানঘাট ছিল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই। বাবার চিহ্ন স্বরূপ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় পোঁতা আছে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন নীল পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। কাঁঠালদের উত্তর পুরুষরা এখনও বর্তমান। তাদের গৃহে আছে নারায়ণ শিলা এবং অষ্ট ধাতুর গোপালজীউ বিগ্রহ। বৈশাখ মাসের গোষ্ঠ উৎসবকালে মূর্তি দুটি এনে বড় কাছারিতে রাখা হত। এখন গোষ্ঠ উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া গ্রামে পঞ্চানন ও বিবিমার থান রয়েছে।

আমতলার কাছেই জয়রামপুর গ্রাম। এখানে আছে খড়্গেশ্বর শিবমন্দির। ম ন্দিরটি পশ্চিমমুখী ও আটচালা রীতিতে তৈরি। শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট আছে।

একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে ছিল মন্দির। রোগমুক্তি ঘটায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বর্তমান মন্দির তৈরি করে দেন প্রিয়নাথ রায় এবং তার স্ত্রী কুসুমকুমারী দাসী। মন্দিরের সামনে নাট মন্দির ১৩৩১ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন রাধাকান্ত নস্কর ও গৌরহরি নস্কর। খড়্গেশ্বর শিবের গাজন উৎসবটি বিখ্যাত। চৈত্রমাসের আরম্ভ থেকেই গাজন উৎসব শুরু হয়ে যায়। এই গাজনের মেলাটিও আকর্ষণীয়। বহু লোক-সমাগম ঘটে, কেনাকাটা চলে। গাজন ছাড়াও, শিবরাত্রি, বৈশাখী পূর্ণিমায় 'অভিষেক উৎসব' এবং কার্তিক মাসের প্রতিদিন ভোর রাতে মঙ্গলারতিতে নানান উৎসব হয়। খড়্গেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দুটি পুকুর রয়েছে।

মন্দিরের উত্তরে দক্ষিণাকালীর মন্দিরটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন বাদলচন্দ্র বারিক। মূর্তিটি প্রাচীন। এখানে কার্তিক অমাবস্যায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। শিবমন্দিরের কাছেই দুটি বিবিমার থান, মন্দিরের কিছু দূরে একটি জগন্নাথ মন্দির এবং বামুন পাড়ায় শীতলা মন্দির আছে। শীতলা মন্দিরে শীতলা ও মনসার মূর্তির সঙ্গে আছে নারায়ণ শিলা। মন্দির দুটিতে নিত্যপূজা হয়। জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব হয় সাড়ম্বরে।

বাখরাহাট গ্রামের বিশাল আটচালা দক্ষিণমুখী রাধাবল্লভজীউ মন্দির ১২১৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণচরণ মণ্ডল। মন্দিরে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ এবং পিতলের গোপাল মূর্তি আছে। কৃষ্ণের পাশে অষ্টধাতুর যে রাধারাণী বিগ্রহ ছিল সেটি চুরি হয়ে গেছে। জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রায় নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়। দোলযাত্রার মেলাটি এখন আর বসে না। তবে মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। বাখরাহাটে শীতলা পূজার মেলা হয় বাজারের কাছে।

জয়চণ্ডীপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী জাগ্রত দেবী হিসাবে অনেকের বিশ্বাস। জনশ্রুতি, জনৈক মহিলার জালে একটি মুখমণ্ডল ও ঘট উঠে আসে পুকুর থেকে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি ঘটটি স্থাপন এবং পূজার ব্যবস্থা করেন। পাকা মন্দির তৈরি করে দেন শুকদেবপুরের পালরা। কারণ তারা দেবীর কাছে মানত করে মামলায় জেতেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে গেলে, বর্তমান মন্দির তৈরি করেন স্থানীয় শী পরিবার। কষ্টিপাথরের তৈরি দক্ষিণাকালীর মূর্তি বস্ত্র পরিহিতা এবং চতুর্ভুজা ; শিলায় খোদিত মহাদেবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা। দেবীর ঘরেই দক্ষিণরায়ের মূর্তি অবস্থিত। তাছাড়া মনসা ও চণ্ডীপূজার ব্যবস্থা আছে। মাঘমাসে আক্ষিণ পূজায় একটি মেলা বসে মন্দিরের সামনে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের একটি ঘরে ধর্মরাজ ও দুটি বিষ্ণু মূর্তি এবং শিবমূর্তির পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়। প্রতিবছর

বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের অভিষেক উৎসবে মেলা বসে। এই গ্রামের 'খানে খোদার' থানে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা দেন এবং পৌষমাসে মেলা হয়।
বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে শুকদেবপুর গ্রামে। দুটি জোড়া শিবমন্দির, একটি আটচালা মন্দির কোনক্রমে টিকে রয়েছে। মন্দিরের উল্লেখযোগ্য অলংকরণের চিহ্নমাত্র নেই।

গোবিন্দপুর গ্রামে কারুকার্যময় আটচালা শিবমন্দিরটি একসময় ভক্ত আগমনে মুখর হয়ে উঠত। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির এখন আগাছা-সমাকীর্ণ। এখনও কিছু কিছু টেরাকোটার কাজ চোখে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে পোড়ামাটির ফলক নিয়ে গেছে নানা জনে। মন্দিরটি স্থানীয় পালদের প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত ১৭৬৯ সালে তৈরি।

বোড়াল

সোনারপুর থানার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামটির দূরত্ব কলকাতা থেকে মাত্র চার মাইল। এই গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর জন্ম। তারই দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ। রাজনারায়ণের পিতৃপুরুষের ভিটায় রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয়েছে।
গ্রামের পাশ দিয়ে একসময় প্রবাহিত হত গঙ্গা। বোড়াল যাওয়ার পথে ভাগীরথীর শুষ্ক খাতের পাশে কয়েকটি পুরানো শিবমন্দির আছে। স্থানটি একসময় ছিল তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান। গ্রামের মাটি খুঁড়ে বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে।
সরলদীঘি ও সেনদীঘি নামে দুটি প্রাচীন দীঘি রয়েছে গ্রামে। সেনদীঘির পূর্ব পাড়ে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির এবং পশ্চিমপাড়ে ভৈরব পঞ্চানন্দের অবস্থান। সরলদীঘির পাড়ে বাবাঠাকুরের থান।
অনেকের ধারণা ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠস্থানটি সেনবংশীয় রাজা সুযোগ্য সেন প্রতিষ্ঠা করেন সাতশ বছর আগে। সে মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘকাল জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। জগদীশ ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি জঙ্গল কেটে জমিদারি পত্তন করেন। তাঁরই উত্তরপুরুষ হীরালাল ঘোষ মাটি খুঁড়ে বিনষ্ট ত্রিপুরাসুন্দরীর দারুবিগ্রহ উদ্ধার করেন। তিনি অনুরূপ একটি মৃত্তিকামূর্তি নির্মাণ করেন ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর ১৩০১ বঙ্গাব্দে। পরে একটি কমিটি দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন এবং এই কমিটি দেবীর ৫½ ফুট অষ্টধাতুমূর্তি নির্মাণ করায়। প্রতিবৎসর মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে মহোৎসব হয় এখানে। উৎসব চলে তিনদিন। আগে ছাগ বলি হত। এখন বন্ধ হয়ে গেছে।
দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপ যথারীতি পড়ে আছে। এই স্তূপ ও মন্দির এবং

পুকুর খননকালে নানা ধরনের জিনিস পাওয়া গেছে। যা থেকে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই মন্দির পাল বা সেন বংশীয় রাজাদের আমলে তৈরি। মাটির পাত্র, ইট, জালের কাঠি, অষ্টম শতকের বিষ্ণুমূর্তি, লাল বেলে পাথরের তারামূর্তি ও নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া গেছে। "গঙ্গার লুপ্ত খাতের ধারে বোড়ালের পথে প্রাচীন দেবালয় ও গঙ্গার ঘাট আজও বনাকীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়। দীঘি ও পুষ্করিণী পুনরুদ্ধারকালে বোড়ালে কয়েকটি পাথরের মূর্তিও পাওয়া গেছে। মনে হয় বিষ্ণু মূর্তি। মূর্তির স্থূলত্ব দেখে অনুমান করা যায়, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর (সেন আমলের) মূর্তির চেয়ে প্রাচীন, পাল যুগেরও হতে পারে। বোড়ালের সুবৃহৎ সেনদীঘি (প্রায় ৪২ বিঘা জুড়ে), বোড়াল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনলিপি এবং মৃত্তিকাগর্ভোত্থিত অন্যান্য নিদর্শন ইঙ্গিত করে যে, সেন আমলে বোড়াল গ্রামে একটি বর্ধিষ্ণু সভ্যতাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" (পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২২৯)।

সোনারপুর

সোনারপুর ছিল চব্বিশ পরগণার অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। রাজপুর ও হরিনাভি গ্রাম দুটি প্রাচীন ও বিখ্যাত। রাজপুর গ্রামে দুশ বছরের প্রাচীন ওলাবিবির পূজা প্রচলিত। রাজপুর উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে ময়দানবেশ্বরী গ্রামদেবীর পূজা হয়। ভবানীশ্বর আটচালা, শিবমন্দিরে আছে দুটি শিবলিঙ্গ। ১৭১১ শকাব্দে পোড়ামাটি কারুকার্যখচিত এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। শিবলিঙ্গ গৌরীপট্টভেদী। মন্দিরের উত্তরে একটি সুদৃশ্য দোতলা রাসমঞ্চ আছে। হরিনাভির ঘোষেরা এই রাসমঞ্চটি স্থাপন করে।

রাজপুর গ্রামে ওলাবিবির পূজা ছাড়াও, পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়। একটি দোলমণ্ডপ এবং গাজিসাহেব ফকিরের থান আছে। গ্রামে প্রতিবছর চারটি মেলায় এখনও প্রচুর জনসমাগম হয়। মেলাগুলি হল ঃ বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ পূজার মেলা (৭ দিন), ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী মেলা (৭ দিন) ও দোলযাত্রা মেলা (১ দিন) এবং চৈত্রমাসে শিবের গাজন মেলা (৭ দিন)।

সোনারপুরে বৈশাখ মাসে একদিনের গোষ্ঠ উৎসব মেলাটি বহু প্রাচীন। সোনারপুর বাজারের কাছে একটি পীরের থান রয়েছে। কামরাবাদ গ্রামে শ্রীধরজীউ মন্দির, শিব মন্দির, শীতলা মন্দির আছে। শীতলার মূর্তি ছাড়াও শীতলামন্দিরে আছে ষষ্ঠীর মূর্তি ও পঞ্চাননশিলা। খুঁড়িগাছি গ্রামেও আছে শীতলা মন্দির। বনহুগলি গ্রামের দুটি শিবমন্দির, চড়কের মেলা, রায়পুর গ্রামের চণ্ডী

দেবীর মন্দির, মনসা, পঞ্চানন, শীতলা ও বিবিমার থান, সাঙ্গুর ও নভাসন গ্রামে দুদিন ব্যাপী গোষ্ঠযাত্রার মেলা ও গজীসাহেবের থানে পুণ্যকামী মানুষের সমাগম ঘটে। এসব গ্রামে শিব, পঞ্চানন, বনদেবী, কালী, দুর্গা, সকলেরই প্রভাব রয়েছে। গোড়খাড়া গ্রামের চড়ক মেলাটি বহু প্রাচীন।

রাজপুর গ্রামে বেশ কিছুকাল ব্রহ্মার পূজা হয় মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। হংসোপরি ব্রহ্মার চারটি রক্তবর্ণ মুখসহ মৃন্ময় মূর্তি তৈরি হয়। পূজার সময় আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। যাত্রা, কথকতা, কবিগান ও পতুলনাচের ব্যবস্থা করা হয়।

সোনারপুর থানার মালঞ্চ গ্রামটি সাধারণত পঞ্চবটী নামে পরিচিত। জমিদার গৌরীপ্রসাদ মৈত্র শিবসহ অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির সম্ভবত ১২৬৬ বঙ্গাব্দে তৈরি। ১২০৮ বঙ্গাব্দে তৈরি হয়েছিল পঞ্চ শিবলিঙ্গের মন্দির।

আটচালারীতির নারায়ণী মন্দির ও দুটি শিবমন্দির ১২০৫ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেন রাজপুর হরিনাভির জমিদার দুর্গারাম কর।

মালঞ্চ মাইনগরে ১২৪৪ বঙ্গাব্দে একটি মাঝারি ধরনের আটচালা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সোনারপুর ও সুভাষগ্রাম রেলস্টেশনের মাঝখানে ধান খেতে 'হাড়িঝি' নামে চণ্ডী দেবীর পূজা হয় একটি মন্দিরে। আগে খোলা মাঠে দেবীর পূজা হত।

হরিনাভি

আদিগঙ্গার তীরে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল হরিনাভি। মজা গঙ্গার ধারে আছে টেরাকোটার অলংকরণ সমৃদ্ধ আঠার শতকে তৈরি আটচালা ভবানীশ্বর শিবমন্দির। জনশ্রুতি, হুগলির আখনা-শ্রীপুর থেকে ঘোষরা এখানে এসে বসতি করেন। এই পরিবারের রামসুন্দর ঘোষ শিব মন্দিরটি তৈরি করান। এই মন্দিরের কাছে প্রায় ১০০ বছর আগে একটি দোলমঞ্চ তৈরি করেন নবীনচাঁদ ঘোষ। দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে হরিনাভি স্কুলের কাছে। হরিনাভি স্কুলমাঠের পাশে একটি পুরানো দোতলা দোলমঞ্চ দেখা যায়।

ঘোষদের বাড়িতে ঠাকুরবাড়ি, নাটমণ্ডপ বা রাসবাড়ি আছে। প্রধান দেবদেবী রাধাকৃষ্ণ। একটি সিংহবাহিনী অন্নপূর্ণা মূর্তি আছে। মন্দিরের সামনে ১৬ থাম যুক্ত নাটমণ্ডপ। রাস উৎসব উপলক্ষে চৈত্র পূর্ণিমায় তিনদিনের মেলা হয়।

এক সময় রথযাত্রা উৎসব হত সাড়ম্বরে। রাস উৎসবে পুতুলনাচ, গোপাল উড়ের যাত্রা, সঙ, খেমটার নাচ, সারি গান প্রভৃতির আয়োজন করতেন ঘোষবাড়ির কর্তারা।

হরিনাভি গ্রামটি একসময় ছিল মুসলমান প্রধান। নেতাজী সুভাষ রোডের পূর্বদিকে শতাধিক বছরের পুরানো একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদে ছিল কারুকাজ। তাছাড়া ছিল চারটি মিনার ও একটি গম্বুজ। মসজিদের কাছে বিবিমার থান ও শেখ পরিবারের কবরখানা। মসজিদটি তৈরি করেন মেজো দর্জি। হরিনাভির নিজামতলায় একটি পীরের দরগা আছে।

হরিপোঁতা একটি সুপ্রাচীন স্থান। জনশ্রুতি হরির মন্দির ও মূর্তি ছিল। সে সব মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে।

বেহালা

বেহালা নামকরণ নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। কেউ কেউ মনে করেন বহুলা শব্দ থেকে এসেছে বেহালা। বহু অর্থাৎ অনেক, লা অর্থাৎ নৌকা। এখানকার নদী পথে অসংখ্য নৌকা চলাচল করত যেকারণে স্থানটি পরিচিত হয় বহুলা নামে। বর্তমানে বেহালা হিসাবে পরিচিত স্থানটির আয়তন সেকালে আরও বড় ছিল। পরিচিত ছিল সাউথ সাবারবান হিসাবে। এই এলাকাভুক্ত ছিল, সুরসুনা, বড়িশা, পর্ণশ্রী, নস্করপুর, সাহাপুর, বাজার বেহালা, উত্তর বেহালা ও দক্ষিণ বেহালা।

অন্যমতে, বেহুলা-লক্ষীন্দর কাহিনীর বেহুলা থেকে বেহালার উৎপত্তি। সে সময়ে পবিত্র গঙ্গা প্রবাহিত হত এই পথে। আর লক্ষীন্দরের দেহকে ভেলায় চাপিয়ে এই নদীপথে স্বর্গদ্বারে যাত্রা করেন বেহুলা। চণ্ডীতলায় তারই স্মৃতিবহ নেতা ধোপানীর ঘাট ও কমলেকামিনী ঘাট বহুকাল ছিল। চণ্ডীপূজা হয় জাঁকজমকের সঙ্গে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার মহিলা পুণ্যার্থীদের সমাবেশ ঘটে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিরাট এলাকা নিয়ে ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাউথ সাবারবান মিউনিসিপ্যালিটি। প্রথম ভারতীয় বেসরকারি চেয়ারম্যান হন রায়বাহাদুর অম্বিকাচরণ রায়।

যাই হোক, বেহুলা অপেক্ষা বহুলা শব্দ থেকে বেহালা শব্দটির সৃষ্টি, এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। নিত্যানন্দ ও তিনপার্ষদসহ চৈতন্যদেব এই নদীপথে গিয়েছিলেন নীলাচল। একদিন নদীরেখা পরিবর্তন করল তার পথ। আদিগঙ্গার পাড় জুড়ে জলাজঙ্গলের সৃষ্টি হল। নদী রেখা বরাবর যে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তাও প্রাণহীন হয়ে পড়ল। পড়ে থাকল কিছু খালবিল-নদীনালা। তার মধ্যে দুমোহানীর খাল,

বাঘেপোতার খাল, মনিখালির খাল, বেগোর খাল, কাওরাপুকুর খাল, চড়িয়াল খাল, ছিল গঙ্গার খাড়ি। এর মধ্যে চড়িয়াল খাল যেটুকু প্রাণবন্ত ছিল, আজ তা জোকা ইলেকট্রিক স্টেশনের কাছে অবরুদ্ধ।

প্রতাপাদিত্যর খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় বেহালার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রায়গড় রাজ্য। তার প্রতিষ্ঠিত দুর্গের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল আছে কাছারী। আর দুই সতীনের পুকুর কমলা ও বিমলা, খিড়কী পুকুর এবং রায়দীঘি। বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলির মধ্যে যমুনা পরুই, গঙ্গারামপুর, বাসুদেবপুর, শিবরামপুর, রামনারায়ণ আজ সমৃদ্ধ জনবসতি।

এই অঞ্চলটি ছিল প্রতাপাদিত্যর রাজ্যভুক্ত। এখানকার নদীপথে তাঁর নৌবাহিনী চলাচল করত। তাঁর ছিল বিশ হাজার ঢালী ও সাতশ রণতরী। যমুনা পরুইতে ঢালিপাড়ার অস্তিত্ব এখনো বর্তমান। পরুই-এর পশ্চিমদিকে আঠারোটি বাঁক যুক্ত বাঘের খাল প্রবাহিত হত। তখন খালটি ছিল যথেষ্ট চওড়া। এখানে খালের আঠারোটি বাঁক ছিল। যাকে বলা হত আঠারো বাঁকি। একটি জায়গাকে বলা হত লাঘাটা। অর্থাৎ ছিল নৌকার ঘাট। এই নৌকা ছিল প্রতাপবাহিনীর।

গঙ্গার বিভিন্ন শাখানদী প্রবাহিত ছিল এই অঞ্চলে। চণ্ডীতলার মন্দিররে কাছের জলাশয়টির সৃষ্টি হয়েছিল গঙ্গার শাখা থেকেই। এর শুষ্ক গর্ভ থেকে নৌকার মাস্তুল, জাহাজের অংশ পাওয়া গেছে। আরও বেশ কিছু বড় জলাশয় ছিল এখানে। গঙ্গার পশ্চিমমুখী একটি শাখা চণ্ডীতলা থেকে রায়বাহাদুর রোড ধরে পুরানো ট্রামডিপোর পাশ দিয়ে বীরেন রায় রোড ওয়েস্ট বরাবর রায়দীঘির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিশেছিল বেগোর খালে। তারপর মনিখালি হয়ে মিলেছিল কাটিগঙ্গায়। ট্রাম ডিপোর কাছের জঙ্গলের পূর্বদিকে শ্মশানের পাশে ছিল ডাকাতের আস্তানা এবং ডাকাতে কালীমন্দির। সেই মন্দিরই এখনকার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। মজে যাওয়া বেগোর খালের চিহ্ন জিঞ্জিরাপুলের উত্তর-পশ্চিমে ছিল কিছুকাল আগেও। রাজার বাগানকে এখন বলা হয় রায়নগর। রাজার বাগান ছিল ৭৫ বিঘা জমির ওপর। রাজার পুকুর ছিল বীরেন রায়ের বাড়ির দক্ষিণে। পুকুরটি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। রায়বাহাদুর রোডে ছিল নেলোর পুকুর। নেলো শব্দ এসেছে নেহাল থেকে। নেহাল অর্থাৎ ধনী। রাজার বাগানের দক্ষিণদিকের জলরেখাটি একসময় ছিল গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। মিশে ছিল ডায়মন্ডহারবারে। গঙ্গার আর একটি শাখা ঠাকুরপুকুর হয়ে কাওরাপুকুর খালে যুক্ত ছিল। ঠাকুরপুকুরের পাটকেল ঘাটা, জায়গীর ঘাট নদী তীরবর্তী ঘাটকেই বোঝায়।

কোম্পানি আমলে জলা জায়গা বুজিয়ে তৈরি হয় ডায়মন্ডহারবার রোড। রাস্তাটি যুক্ত করা হয়েছিল ফলতার সঙ্গে কলকাতার। রাস্তাটির আগে নাম ছিল রাজার রাস্তা। বীরেন রায় রোড ইস্ট ও ওয়েস্ট এবং গঙ্গারামপুর রোডের নাম ছিল দ্বারীর জাঙ্গাল। জাঙ্গাল অর্থাৎ নদীতীরের উঁচুভূমি। নদীপ্লাবন থেকে গ্রামকে রক্ষার জন্য এই জাঙ্গাল তৈরি হয়েছিল নবাবের আদেশে।

নস্করপুরে ছিল বর্ধমান রাজের দুর্গ। এখানে তার লস্কর বা সৈন্য থাকত বলেই স্থানটি লস্করপুর নামে পরিচিত হয়। অনেক পরে হয় নস্করপুর। বড়িশায় ছিল বর্ধমান রাজের খাসমহল এবং বেহালায় বাই মহল। চৌধুরী ও হালদার পরিবার বেহালায় এসে বসবাস শুরু করে বর্ধমানরাজের কর্মসূত্রে। নস্করপুরে পঞ্চানন্দ ঠাকুর ও বিশালাক্ষী দেবী ছিলেন খুবই জাগ্রত। দুটি থানে তাদের পুজো হত।

বেহালার বাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিল হালদার পরিবার। ডায়মন্ড হারবার রোডে পঞ্চানন ঠাকুরের বিগ্রহ ও মন্দির আছে। প্রথমে এই বিগ্রহ ও মন্দির (আটচালা ঘরে) প্রতিষ্ঠা করেন নিমাইচাঁদ হালদার। হালদারদের আদিবসতি ছিল বর্তমান আর্য সমিতির আশেপাশে। এখানে আছে ভগ্ন শিবমন্দির।

পর্ণশ্রীতে (নস্করপুর) একটি পাতালেশ্বর শিবমন্দির ও একটি শীতলার থান নষ্ট হয়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। হরিসভার কাছে ধর্মতলায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরে কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুরের মূর্তি আছে।

ভারতের প্রথম কুকুর দৌড়ের মাঠ নির্মিত হয়েছিল বেহালায়। এই জমির ওপর তৈরি হাউজিং এস্টেটে বহুলোক বর্তমানে বাস করে। অন্ধদের জন্য একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বেহালা প্রসঙ্গে বেহালার ফ্লাইং ক্লাবের নাম আসে স্বাভাবিক ভাবে। উপযুক্ত পাইলট তৈরির জন্য বেহালার বীরেন রায়ের নিরলস পরিশ্রম ও অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তারই চেষ্টায় ১৯২৮ সালে লাইট এরোপ্লেন ফ্লাইং ট্রেনিং আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বিমান চালনা করেছেন।

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষাক্রম শুরু হয় দমদম বিমান বন্দরে ১৯২৯ সালে। নিজেদের খরচে ১৯৩২ সালে একটি ক্লাব হাউস তৈরি হয়। যুদ্ধের পর বীরেন রায় আবার এগিয়ে আসেন এবং আলিপুরে অ্যারোড্রামের কাজ শুরু হয়। দুবছর কাজ

চলবার পর ১৯৪৮ সালে এটি ছেড়ে দিতে হয়। সেই বিমান বন্দরের রানওয়ে এখন তারাতলা রোড নামে পরিচিত। অ্যারোড্রামের বিভিন্ন অংশ এখন টাকশাল ও নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বীরেন রায় থেমে গেলেন না। বারাকপুরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি পরিত্যক্ত কন্ট্রোল টাওয়ারকে শিক্ষাদানের স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হল। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫০ সালে এখানে বিমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। সে সময়ে বীরেন রায় ছিলেন নতুন দিল্লীর **Aero Club of India**-র চেয়ারম্যান এবং **Bengal Flying Club**-এর প্রেসিডেন্ট।

স্থায়ী জায়গা না হলে শিক্ষাক্রম চালান শক্ত। তখন এয়ার-চীফ মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী মহিউদ্দিন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় বেহালায় এয়ার ফিল্ডে জায়গা পান। ১৯৬০-৬১ সালে এখানে ক্লাব উঠে আসে।

বীরেন রায়ের অন্যতম কৃতিত্ব ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিমানের নক্সা বানিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে। বিমানটির নাম মেঘদূত। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। ভারত সরকার সমস্ত বেসরকারী বিমান নির্মাণ সংস্থা নিষিদ্ধ করায় কলকাতায় মেঘদূত এয়ার ক্রাফট কর্পোরেশন লিমিটেড বন্ধ হয়ে যায়।

ঠাকুরপুকুর

বেহালা বড়িশার মত ঠাকুরপুকুরও প্রাচীন স্থান। এক সময় বলা হত পূর্ব বড়িশা। একটি পুকুরের মাহাত্ম্য কাহিনী থেকে গ্রামটির নামকরণ ঘটে। লোকশ্রুতি বৃহৎ একটি পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ তার প্রার্থিত বস্তুটি কামনা করত। পরদিনই সে প্রার্থিত বস্তুটি পেয়ে যেত। এক ব্যক্তির গৃহে বিবাহের সময় কিছু বাসন পত্রের প্রয়োজন পড়ে এবং সে প্রার্থনা জানায়। পরদিন সে সমস্ত জিনিস পেয়ে যায়। আদেশ হয়, কাজ মিটে গেলে ঐ বস্তুগুলি আবার পুকুরের ধারে ফেরত দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে আদেশ পালন করেনি। সেই থেকে কেউ আর প্রার্থিত বস্তু পায় নি। পুকুরটি বড়িশার সেন্ট এলিজাবেথ বালিকা বিদ্যালয়ের পিছনে অবস্থিত।

পূর্ব বড়িশার কাছেই কলুয়া গ্রাম। পশ্চিম বড়িশার দক্ষিণে জোঁকা ও হাঁসপুকুর এবং উত্তরে জায়গীরঘাট গ্রাম। জোঁকা বর্তমানে একটি সমৃদ্ধ জনবসতি। ট্রাম চালু হয়েছে জোঁকা পর্যন্ত।

ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারী গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহুকাল আগে। এখানকার গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম লোকবিহারের সংগ্রহ সমৃদ্ধ। সম্প্রতি ক্যান্সার আরোগ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বড়িশা

বড়িশার ইতিহাস কলকাতা থেকেও পুরানো। বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের কয়েক ঘর উত্তর পুরুষ এখনও এই গ্রামের বাসিন্দা। পনের শতকের মাঝামাঝি সাবর্ণ চৌধুরীদের এক পূর্ব পুরুষ হাবেলি শহর পরগণার শাসনভার লাভ করেন। এরা বাস করতেন হালিশহরে। সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল, কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর কালীঘাট, উত্তর চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত এলাকা ছিল এদের জমিদারিভুক্ত।

সাবর্ণ চৌধুরীদের এক পূর্ব পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে মাগুরা, আনোয়ারপুর, পাইকান, কলকাতা ও খাসপুর (বড়িশা) এই পাঁচটি গ্রামদান করেন মানসিংহ। কালীঘাটে মায়ের মন্দির নির্মাণের জন্য সাতশ স্বর্ণ মুদ্রা এবং সাতশ বিঘা জমিও দান করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্তর পুত্র গৌরহরি মজুমদার দমদমের কাছে বিরাটি থেকে কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। গৌরহরির পুত্র শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের পুত্র কেশবচন্দ্র নবাবের কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি পান। বিরাটি থেকে বড়িশা বেহালায় এসে বসতি করেন কেশবচন্দ্র। তখন স্থানটি ছিল জঙ্গলাবৃত। বড়িশায় পরবর্তী সময়ে এরা দ্বাদশ শিবমন্দির, কালীঘাটে কালীমন্দির, পঁটিয়ারিতে শ্মশানের কাছে করুণাময়ী কালীমন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির, সুশীলেশ্বরী কালীমন্দির, করুণাময়ীর ঘাট নির্মাণ করেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের জায়গায় সত্তর শতকে ছিল এদের পাকা কাছারি বাড়ি। সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ রায়চৌধুরী কালীঘাটের বর্তমান কালী মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। এক সময় কালীমন্দির ছিল এদের সম্পত্তি। এই বংশের মনোহর রায় চৌধুরী, রামচাঁদ রায় চৌধুরী, প্রাণ রায় চৌধুরী, মনহর দেব এবং রামভদ্র ইংরেজ কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছিলেন সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা। এখানে তিনটি গ্রামের বিক্রয় কোবলা উদ্বৃত হল ঃ

Deed of Purchase Or 'Bai Namah'
of the Three Towns

British Museum Additional M S 24039, No. 39

We submissive to Islam, declaring our names and descent, viz. Monohar Das son of Bas Deo, the son of Raghu, and Ramchand, the son of Bidhyadhar, son of Jagdis ; and Ram Bhadur, the son

of Ram Deo, son of Kesu ; Pran the son of Kalesar, the son of Gauri ; and Manohar Singh, the son of Gandarb 2, being in a state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given by the law ; avow and declare upon this wise ; that we conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the village Dihi Kalkatah, and Sutaluti, within the jurisdiction of parganah Amirabad and village Govindpur under the jurisdiction of parganah Poeqan and Kalkatah, to the English Company with rents and uncultivated lands and ponds and graves and right over fishing and woodlands and dues from resident artisans, together with the lands appertaining thereto bounded by the accustomed notorious and usual boundaries, the same being owned and possessed by us (up to this time the thing sold being in fact and in law free from adverse rights or litigation forming a prohibition to a valid sale and transfer) in exchange for the sum of one thousand and three hundred ruppes, current coin of this time including all rights and appurtenances thereof internal and external and the said purchase money has been transferred to our possession for the possession of the said purchases and we have made over the aforesaid purchased thing to him and have excluded from this agreement all false claims, we have become absolute guarantors that if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries should come forward, the defence thereof is incumbent upon us ; and henceforth neither we nor our representatives absolutely and entirely, in no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid boundaries, now shall the charge of any litigation fall upon the English Company. For these reasons we have caused to be written and have delivered these few sentences that when need arises they may be evidence. Written on the 15th of the month Jamadi I in Hizri year 1110 equivalent to the 44th year of the reign, full of glory and prosperity."

সাবর্ণ চৌধুরীদের বিভিন্ন প্রায় চারশ পরিবার বড়িশা গ্রামের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। আটচালা বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। যা এখনও চলছে। কিন্তু পরে এই আটচালায় ছাদ দেওয়া হয়। তার কিছু অংশ ভেঙে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে কিছু থাম। বড়িশার প্রাচীন চিত্র এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত। আধুনিক শহরের ছাপ সর্বত্র অন্যান্য অঞ্চলের মতই।

চণ্ডীর মাঠে প্রায় দুশ বছর ধরে চণ্ডীদেবীর বার্ষিক উৎসব ও মেলা হয়। দেবীর মাটির মূর্তি তৈরি হয় এই উপলক্ষে। সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের মহেশচন্দ্র রায়-চৌধুরী এই পূজার প্রবর্তন করেন। শোনা যায়, তিনি সুরশুনা গ্রামের জমিদার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে যথাযোগ্য সমাদর না পাওয়ায় ফিরে এসে এই পূজার ব্যবস্থা করেন। বিস্তর খরচ ও দানধ্যান করতেন। মহেশচন্দ্রের ছেলে হরিশচন্দ্রও পূজা প্রচলন রেখেছিলেন।

জনশ্রুতি, চণ্ডী মাঠের পুকুর থেকে পাওয়া একটি তামার ঘটের মধ্যে দেবী অবস্থান করছেন, এমন স্বপ্নাদেশ হয়েছিল। যে কারণে, এই ঘটটি রায়চৌধুরী বাড়িতে এখনও পূজা হয়ে থাকে।

তবে, দেবী চণ্ডীর পূজা এখন আর পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়। বর্তমানে দেবী গ্রামদেবীতে পরিণত হওয়ায়, বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সাবর্ণ পাড়ায় বারটি আটচালা শিবমন্দিরে আছে পোড়ামাটির নানা অলংকরণ। শিবমন্দিরের দোতলা দোলমঞ্চে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি রাধাকান্ত মন্দির আছে সাবর্ণ পাড়ায়।

মহেশতলা

মহেশতলা থানার বাগপোতা একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামে বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা উপলক্ষে বড়ঠাকুরতলায় মেলা বসে। মেলা চলে তিন দিন। তাছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডীপূজার মেলা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার মেলা ও চৈত্র মাসে হয় গাজনের মেলা। এই গ্রামে কয়েকটি শীতলা মন্দির আছে।

মহেশতলা বর্তমানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ। আকবরের সময় ছিল প্রতাপাদিত্যের অধীন এলাকা। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় সরশুনার রায়গড়ে যে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, তার চিহ্নমাত্র নেই। সেকালে যাতায়াতের পক্ষে নদীপথ ছিল প্রশস্ত। একটি প্রশস্ত রাস্তা মহেশতলার ব্যানার্জী পাড়ার উত্তর দিক দিয়ে বেহালা চৌরাস্তায় ডায়মন্ড হারবার রোডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মূলত ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। গঙ্গার মনিখালি খাল, বেগোর খাল, মীরপুর খাল, চড়িয়াল খাল দিয়ে প্রবাহিত জল ছিল কৃষি-সহায়ক। এই পথে নৌকা চলাচল করত। নানা সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে ছিল গ্রামীণ জীবন।

বহু আগে বাওয়ালির মণ্ডলদের সম্পত্তি ছিল। লোকবসতি তেমন ছিল না। জঙ্গল ঘেরা স্থানটিতে ছিল বন্যপ্রাণীর বাস। সিরাজদৌলার পতনের পর থেকেই

পরিবর্তনের সূচনা। প্রথম চট্টকালিকাপুরের রায়েরা বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত করে জমিদারি পত্তন করে চট্টা ও পাশের এলাকায়। এদের প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দির এখনও বর্তমান। চাণক গ্রাম (বারাকপুর) থেকে এসে গণিপুরে বসবাস শুরু করেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাস্তুভিটা বিশ্বপোতা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই পরিবার বিত্তশালী হয়ে ওঠে। বর্তমান ব্যানার্জী পাড়ার উত্তরে নতুন বাড়ি বানায় বসবাসের জন্য। ঐ বাড়ি ভবানী ভবন নামে পরিচিত।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সৌভাগ্য সূচনা ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তরের সময়। ধানচালের ব্যবসা করে বিশ্বনাথ অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রচুর জমি কিনে ফেলেন। বিশ্বনাথের ছেলে রামরাম মহেশতলার জমিদারি লাভ করেন। ভূকৈলাস রাজবংশের সাহচর্যে এসে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। মোমিনপুর থেকে মহেশতলা পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত করে নেন। রামরাম ছিলেন কোম্পানির ক্ষমতা প্রসারে অন্যতম সহযোগী। তাঁর সহকারী মহেশ খাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখতে মহাদেবনগর মৌজাকে মহেশতলা নাম দেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি ভদ্রাসন ভবানীভবন বাড়িটি সুবিশাল। নহবতখানা, অতিথিশালা ছিল। জোড়া শিবমন্দির আছে এখানে। দুর্গাপূজা হত সাড়ম্বরে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন শোনা যায়। মহেশতলা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এই পরিবারের উদ্যোগে। প্রথমে স্কুলটি ছিল বর্তমানে এস এফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাছে। ১৮৫৮ সালে স্কুল উঠে যায় রায়পুর বকুলতলার কাছে পীরতলায়। বর্তমান স্থানে ১৯১৩ সালে স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সে সময়ে পার্শ্ববর্তী কোথাও কোন স্কুল ছিল না। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার এই অঞ্চলে আসবার আগে থেকেই একটি হাট বসত নিয়মিত। বিভিন্ন গ্রামের মানুষ আসত বেচাকেনায়। বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমিদারি পত্তনের পর, হাটটিরও সংস্কার করে। হাটে ছিল তাদের কাছারি। একটি শীতলা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করে। পরে এই হাটটিই ব্যানার্জী হাট নামে পরিচিত হয়। এই বংশের উত্তরপুরুষদের উদ্যোগে আদি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকড়া স্টেশনের কাছে মনিখালি কৃষ্ণনগর গ্রাম। কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই অঞ্চলের জমিদার। কোম্পানি আমলেই এদের ক্ষমতার প্রসার ঘটে। তার বিশাল রাসভবনটি ছিল নানান মহলে বিভক্ত। বহু অর্থব্যয়ে বাড়িটি তৈরি করেন কৃষ্ণমোহন। ঠাকুরবাড়ি বানিয়েছিলেন রাজা নবকৃষ্ণের ঠাকুর বাড়ির অনুকরণে। দুটি শিবমন্দির

আছে। এই বংশে বহু কৃতী সন্তানের জন্ম ঘটেছে। এদেরই এক উত্তর পুরুষ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতার সিমলায় আছে রাস্তা। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বংশের দৌহিত্র।

মহেশতলার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়দের মত, আকড়ার মুখোপাধ্যায়, নঙ্গীর চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, পুটখালির হালদার, চিংড়িপোতার দত্ত বংশও ছিল সুপরিচিত।

মহেশতলার জালখুরাকে একসময় বলা হত 'ঈদ গা'। গ্রামটি ছিল মুসলমান প্রধান। কৃষি প্রধান এই গ্রামটির 'নকশী কাঁথা' একসময় ছিল বিখ্যাত। পার্শ্ববর্তী সন্তোষপুর, চন্দননগর, নুঙ্গী, রায়পুর, চট্টা, আকড়া, চিংড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের মত জালখুরায়ও দর্জির ব্যবসা প্রাধান্য পায়।

খালবিলের প্রাধান্য থাকায় প্রথম যুগে নৌকাই ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। জমিদারি পত্তন ও লোকবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির চলাচল শুরু হয়। ১৮৯০ সালের ৪ এপ্রিল বজবজ লাইনে শুরু হয় ট্রেন চলাচল। বৃহত্তর পরিবর্তনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। পরে এসেছে মোটরগাড়ি, বাস, ট্যাক্সি, লরি, সাইকেল রিকসা। কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কুল, কলেজ হয়েছে জনবৃদ্ধির চাহিদার কারণে।

বিভিন্ন ধরনের কলকারখানার মধ্যে বাটা, অ্যালায়েড রেসিনস, হিন্দুস্থান গ্যাস, উষা টেলি হয়েস্ট, অ্যাটলাস কর্পোরেশন প্রভৃতি বিখ্যাত। আরও কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। একদা কৃষি অঞ্চলের সর্বত্র এখন নাগরিক জীবনের স্পর্শ।

মহেশতলার প্রধান যান চলাচলের রাস্তা গঙ্গারামপুর রোড এবং বজবজ রোড। রাজা বসন্ত রায় এই অঞ্চলের যে পাঁচটি গ্রামের পত্তন করেন গঙ্গারামপুর ও শিবরামপুর তার অন্যতম। গঙ্গারামপুর থেকে শিবরামপুর হয়ে বজবজ রোডের সঙ্গে মিশেছে গঙ্গারামপুর রোড। বজবজ রোড সম্পর্কে প্রচলিত কিম্বদন্তী হল ঃ রামা মুন্দ-ফরাস নামে জনৈক ডোম বহু অর্থ সঞ্চয় করে তার একমাত্র মেয়ের বিয়েতে খরচ করবার জন্য। কিন্তু অসুন্দরী মেয়ে, তারপর ডোম হওয়ার কারণে মেয়ের বিয়েতে ঐ টাকা সে খরচ করতে পারে নি। তখন রামা সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এই প্রশস্ত রাস্তাটি তৈরি করে। অবশ্য তার তৈরি রাস্তা আকাবাঁকা ভাবে মোমিনপুরের কাছে বর্তমান ডায়মন্ড হারবার রোডে মিশেছিল। এখন অবশ্য বজবজ রোড সোজা সাহাপুরে মিশেছে। পুরানো বজবজ রোড দিয়ে বাঙলার গভর্নর হিসাবে ক্লাইভ এসেছিলেন কলকাতায়।

সুন্দরবনের আরণ্যক প্রকৃতির মধ্য থেকেই বর্তমান মহেশতলার আবির্ভাব। আঞ্চলিক লৌকিক দেবদেবী কল্পনার মধ্যে আরণ্যক গ্রামীণ জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট। দক্ষিণরায়,

বারাঠাকুর, কুমীর, মনসা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, হরিঠাকুর, ঘেঁটু, মানিকপীর, বুড়োশিব বিভিন্নস্থানে এখনও পূজা পেয়ে থাকেন। গোপালপুর অঞ্চলের দক্ষিণদর তলায় বারাঠাকুরের পূজা হয় মকর সংক্রান্তিতে। কৃষিজীবীদের 'আখ্যেন' কৃষি উৎসব পালিত হয় এদিন। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির আগের মঙ্গলবার কেয়াতলা গ্রামের শ্মশানে মনসাদাঁড়ির মেলা হয়। শ্মশানে হয় বৃক্ষপূজা। বাখরাহাট গ্রামেও বৃক্ষপূজা হয়। দেবতার নাম বড় কাছারী। নীল ষষ্ঠীর দিন বিভিন্ন গ্রামে হয় কুমীর পূজা। এই কুমীর হলেন ষষ্ঠী দেবী। যিনি অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবেন নবজাতককে। মহেশতলায় শীতলা মন্দিরের পূজা তিনশ বছরের পুরানো এ বিশ্বাস অনেকেরই। সাপা রায়পুর গ্রামে আছে ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দির। মহেশতলার জোত শিবরামপুর গ্রাম এবং বেহালার পরুই গ্রামের মধ্যবর্তী বেগোরখালের ধারে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দির আছে। ইনি 'জলার পঞ্চানন্দ' নামে পরিচিত। কুম্ভকার পাড়ায় আছে মানিকপীরের থান। বিভিন্ন গ্রামে এখনও ঘেঁটুপূজা হয়। মহেশতলায় বৈষ্ণব প্রভাবও পড়েছিল। হরির লুঠ বা হরিঠাকুরের পূজা এখানকার বিভিন্ন গ্রামে হয়ে থাকে। বাঙলার অন্য কোথাও এই পূজার প্রচলন নেই।

নঙ্গী/বাটানগর

মহেশতলার পশ্চিমে নঙ্গী গ্রাম। এখন আর কেউ নঙ্গী বলে না। বাটানগর নামে পরিচিত হয়েছে। জমিদার চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমির ওপর বাটা কোম্পানির জুতোর কারখানা গড়ে উঠেছে। এই কারখানার শ্রমিকদের জন্য গড়ে তোলা উপনিবেশটি বাটানগর হিসাবে পরিচিত ছিল। তার থেকে সমগ্র অঞ্চলটির নাম হয়ে গেছে বাটানগর।

নঙ্গীতে এখন নাগরিক জীবনের ছাপ স্পষ্ট। তবুও গ্রামীণ ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যায় নি। এই গ্রামে আছে বুড়ো শিবতলা। কৃষির দেবতা বুড়ো শিব লৌকিক দেবতা। গ্রামের বটতলায় আছে বুড়ো শিবের মন্দির। এই স্বয়ম্ভূ দেবতা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ বলেন, ইনি তারকেশ্বরের তারকনাথের বড় ভাই। চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়। চড়ক ও গাজন অনুষ্ঠানে বহু মানুষ যোগ দেয়। এই গ্রামের শীতলা মন্দিরটি বহু প্রাচীন।

বেহালা, ঠাকুরপুকুর, বাড়িশা, নঙ্গী প্রভৃতি এলাকা ছিল কৃষি-ভিত্তিক। তাছাড়া ছিল সুন্দরবনের এলাকাভুক্ত। লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল এই অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে। "কৃষীভিত্তিক সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনযাত্রা,

দেবদেবীর পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। এমন কি এক একটি গ্রামদেবতার ভিতর দিয়ে গ্রামীণ মানুষের সামাজিক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহাপুর অঞ্চলে বুড়োশিবতলা কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের ঐতিহ্য বহন করে। বুড়ো শিব কৃষিদেবতা এবং বিপদ আপদ থেকে গ্রামকে রক্ষা করতেন। চণ্ডীতলার চণ্ডীদেবীও গ্রামদেবী। স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনা, বন্ধ্যানারীর পুত্র কামনায় এই দেবীর পূজা হতো। গঙ্গার উপকূলবর্তী বলে জেলে মাঝি ও বণিক সম্প্রদায় জলযাত্রার নিরাপত্তার জন্য পূজা দিত। নস্করপুরের জাগ্রত দেবতা বুনোবাবা ছিলেন অরণ্যদেবতা। সমগ্র অঞ্চলটি ছিল তাঁর সুবিস্তৃত রাজ্য। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে কোনো মানুষেরই কল্যাণ হতো না। ঠাকুরপুকুরের বুনোপঞ্চানন্দ, বেহালার বাবাঠাকুর বেগোর খালের জলার পঞ্চানন্দ, গড়াগাছার পঞ্চানন্দ, মুরাদপুরের পঞ্চানন্দ, বড়শের পঞ্চানন্দ আদিম অরণ্য সমাজ ও কৃষিভিত্তিক জীবনের পরিচয় বহন করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির বেহালা নস্করপুরে আছে। ইনি মূলত মৎস্যজীবীদের দেবী ছিলেন। বেহালা ও পরুই (যমুনা পরুই) গ্রামের বুড়োশিব লৌকিক জীবন যাত্রার পরিচয় বহন করেন। পরবর্তী কালে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এ সমস্ত দেবদেবীকে পৌরাণিক সংস্কৃতির দ্বারা শোধিত করে নেন। এ অঞ্চলের বহুস্থানে চড়কমেলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে সূর্য উৎসব। অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা লাভের জন্যে এবং যাতে সুপ্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তার জন্যে চড়কপূজা ও গাজন উৎসব হতো। চর্মরোগের দেবতা ঘেঁটু, ওলাওঠার দেবী ও ওলাবিবি এবং বসন্ত রোগের দেবী শীতলার থান এখানে প্রচুর আছে। চৈত্র সংক্রান্তির নীলপূজার দিনে এ অঞ্চলে মাটির কুমীর নির্মাণ করে পূজা করা হয়। কুমীর পূজার কথা সুন্দরবনের অরণ্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কালু রায় ছিলেন কুম্ভীর দেবতা। মকর সংক্রান্তিতে দক্ষিণরায়ের (ব্যাঘ্রদেবতা) পূজা কৃষক সমাজ ব্যাপকভাবে করতেন। এ সময় লৌকিক দেবদেবীর পূজা পার্বণ থেকে বেহালার বহু নদীনালা বিশিষ্ট অরণ্যভূমি ও কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের সংহত প্রাচীন রূপটি অনুমান করা যায়।" (প্রাচীন বেহালার ইতিকথা—সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

গড়িয়া

আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত গড়িয়ার কাছ দিয়ে। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে ছিল বাঁশদ্রোণী, রায়নগর, কামডহরী, মানিকগঞ্জ, বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া, ফরতাবাদ, লস্করপুর, রাজপুর, গোবিন্দপুর, বারুইপুর, সূর্যপুর, জয়নগর, প্রভৃতি গ্রাম। আদিগঙ্গা প্রবাহ মজে যাওয়ার পর লোকবসতি গড়ে উঠতে থাকে।

কামডহরীর পূর্বদিকে ছিল মানিকগঞ্জ। আর কামডহরী, বৈষ্ণবঘাটা ও ফরতাবাদ গ্রামের মধ্যবর্তী অংশ পরিচিত ছিল গড়িয়া নামে। এখনকার গড়িয়ার সঙ্গে সেদিনের গড়িয়ার কোন মিল নেই। গড়িয়া তখন একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। পূর্ববঙ্গ ও অন্যান্য অঞ্চলের বড় বড় নৌকো এসে ভিড়ত। ধান, চাল, পাট, ডাল, সুঁদরী কাঠ, তেল, গোলপাতা প্রভৃতির ব্যবসা চলত। সেই সঙ্গে ছিল বড় বড় আড়ত। কালক্রমে আদিগঙ্গা হয়ে পড়ল নৌকাচলাচলের অনুপযোগী। আজ তার স্মৃতি রয়েছে মাত্র পুকুরের আকারে। গড়িয়া স্টেশনের পাশ দিয়ে টলির নালা গিয়ে মিশেছে বিদ্যাধরী নদীতে। এইপথে বেশ কিছুকাল বাণিজ্য চলত। কিন্তু মানিকগঞ্জের কাছে গঙ্গাস্রোত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় সেটিও বন্ধ হয়ে যায়।

মানিকগঞ্জে গঙ্গার ঘাটে ছিল হোগলার ঘর। সেখানে এসে ভিড় করত তীর্থযাত্রীরা। কালীঘাটের ভিড় এড়াবার জন্য অনেকেই তীর্থ কাজ সারত মানিকগঞ্জে। এমন কি মানিকগঞ্জের ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনও হত। মেলাও বসত কখনও কখনও। মানিকগঞ্জ ছিল পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পরিবারেব সম্পত্তি। যশোহরের নিবাসী রায় (সাহা) এই জমি কেনেন। তাঁর কর্মচারী স্বরূপচন্দ্র সিকদার মানিকগঞ্জের গঙ্গার ঘাটে পাকা চাঁদনী ও যাত্রীদের জন্য পাকাঘাট নির্মাণ করেন। এটি পরিচিত ছিল স্বরূপ সিকদারের চাঁদনী ও ঘাট নামে। কিন্তু টলির নালাও মজে যায়। বিদ্যাধরীও শুকিয়ে আসে। গড়িয়া গঞ্জের মৃত্যু হল নিঃশব্দে।

চাঁদনীর মাঝখানে মাটির কালীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বোড়ালের বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁদনী ভেঙে যেতে থাকায়, মূর্তি সরিয়ে নেওয়া হয় গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে। পরে জনসাধারণের দানে নির্মিত হয় পাথরের বিগ্রহ। গড়িয়ার প্রাচীন বন্দরকে খুঁজে পাওয়া আজ শক্ত।

গড়িয়ার আদিশ্মশানে আছে দুটি জীর্ণপ্রায় আটচালা শিব মন্দির। মন্দিরের গাঁথনি থেকে বোঝা যায় খুবই প্রাচীন। একটি মন্দিরের ভিতরে তান্ত্রিক সাধনার উপযোগী পরিবেশ বর্তমান।

"বালিগঞ্জ থেকে বোড়াল। প্রায় ১৫০ বছর আগে এই পথে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমশায়েরা 'দক্ষিণ-নবদ্বীপের' দিকে ছ্যাকরাগাড়িতে যাতায়াত করতেন, কলকাতা শহরের গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ থেকে। বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁর পিতা, রামমোহনের বন্ধু, এই পথেরই যাত্রী ছিলেন। গড়িয়ার হাট পর্যন্ত এই আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথটি প্রসারিত ছিল বলে বালিগঞ্জের অভিজাত নাম হয়েছে 'গড়িয়াহাট'। এই ঐতিহাসিক পথের উপর ঢাকুরিয়া, আরকপুর, ইব্রাহিমপুর বৈষ্ণবঘাটা গড়িয়া

বাঁশদ্রোণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রাম। আদিগঙ্গার প্রাচীন ঘাটের তীরবর্তী গ্রামগুলিতে আজও প্রাচীন ঘাট ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, যেমন গড়িয়ায়। বৈষ্ণবঘাটা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, বিখ্যাত পণ্ডিতদের বাস ছিল এখানে এবং আজও তার চিহ্ন (জীর্ণ ঘরবাড়ি দেবালয়) গড়িয়ামুখী পথে নাকতলা পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যায়। বর্তমানে লোকবসতির আধিক্যের জন্য এখানকার গ্রামশ্রী-সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু একদা ঢাকুরিয়ার ধর্মঠাকুরের উৎসব, যাদবপুরের মানিকপীরের মেলা, বৈষ্ণবঘাটার দেবদেবালয়, পঞ্চানন, মনসা, শীতলা প্রভৃতি পূজাপার্বণ এতদঞ্চলের গ্রাম্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল।" (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২২৮)।

গার্ডেনরীচ

স্থানটির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজির আলি শাহর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। লর্ড কর্নওয়ালিশের রাজত্বকালে তাঁকে স্বরাজ্য অযোধ্যা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ওয়াজির আলি মারা যাওয়ার পর, তাঁর কবরের জন্য ৭০ টাকা খরচ করা হয়। অথচ তার বিবাহের সময় ১৭৯৪ সালে খরচ হয়েছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে একসময় বহু ইংরেজ ধনী ব্যক্তি এখানে এসে বসতি করেছিল। নদী-তীর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ছবির মত সাজানো বাড়িগুলো ছিল গাছপালা ঘেরা। এ সব বাড়ির বেশির ভাগ তৈরি ১৭৬৮ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশ বদলে যায় ১৮৪৭ সালে অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজির আলি শাহর কলকাতায় আসার পর। ১৮৫৭ সালের মধ্যে তাঁর অনুরাগীদের আগমনের পর তাদের এক বিরাট বসতি গড়ে ওঠে। কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যর লরেঞ্জ পীলের (১৮৪৮—১৮৫৫) সুন্দর সুসজ্জিত বাগানবাড়ি সহ আরো কয়েকটি বাড়ি নবাব কিনে নেন। তারপর থেকে য়ুরোপীয়দের এই অঞ্চলে বসতি করার আগ্রহ হ্রাস পায়। সুয়েজ ক্যানেল চালু হবার পর, খিদিরপুর ডকের গুরুত্ব বেড়ে যায়। গার্ডেনরীচে দেশবিদেশের নাবিকদের নানাবিধ অফিস ও বসতি গড়ে ওঠে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে) প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। নবাবের সম্পত্তি একটি সিন্ডিকেট কিনে নেয়। তাঁর মৃত্যুর পর নবাবের আশ্রিতরাও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। গার্ডেনরীচ অঞ্চলে তারপর চটকলের আবির্ভাব ঘটে। খিদিরপুর বন্দরের ক্রমোন্নয়ন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে গার্ডেনরীচেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

টালিগঞ্জ

কালীঘাটের দক্ষিণে টালিগঞ্জ। বিখ্যাত টলির নালার কর্নেল টলির নাম মনে রেখেই টালিগঞ্জ। এখানে চার্চ মিশনারী সোসাইটির কেন্দ্র গড়ে ওঠে ইংরেজ আমলে। সুদৃশ্য কয়েকটি মন্দিরও এসময়ে তৈরি হয়। রসাপাগলায় মহীশুরের রাজপরিবারের নির্বাসিতদের আশ্রয় মিলেছিল। টিপুর দুই পুত্র ও পরিজনবর্গের সমাধি আছে এখানে।

নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য টালিগঞ্জে আছে টালিগঞ্জ হোমস্। জনগণের চাঁদায় ১৮৪১ সালে আমহার্স্ট স্ট্রীটে (বর্তমান রামমোহন সরণী) তৈরি হয়েছিল আলম্স্ হোমস্। পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির। ১৯২১ সালে এই বাড়ি বিক্রি করে টালিগঞ্জে নতুনবাড়ি তৈরি হয়। এবার নাম হয় টালিগঞ্জ হোমস। ৭৯ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য এখানে আরামদায়ক ব্যবস্থা করা হয়। বাইরে যাতায়াত ও অতিথি আপ্যায়নে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না।

প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের মোড়ে প্রিন্স গোলাম মহম্মদের নাতি প্রিন্স গোলাপ হুসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন উনিশ শতকের শেষে। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর বিপরীতে টালিগঞ্জ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৫ সালে। এখানে রেস, গলফ, সাঁতার ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা আছে। ১৯০৯ সালে লিমিটেড ক্লাব হিসাবে রেজিস্ট্রি করা হয়। বর্তমানে ক্লাব সদস্যদের থাকবার ব্যবস্থাযুক্ত বাসস্থান আছে। সদস্য-সংখ্যা এক হাজারের মধ্যে সীমিত। গলফ ও রেস এখনও চালু আছে।

খিদিরপুর

কলকাতা বন্দরের জন্য খিদিরপুর ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। ১৭৭৫ সালে কর্নেল টলির খাল কাটার পর ১৭৮০ সালে খিদিরপুরে ডক তৈরি করেন কর্নেল হেনরি ওয়াটসন। খিদিরপুরের গোকুল ঘোষালের সঙ্গে ওয়াটসনের মামলা শুরু হয় ডকের জমি নিয়ে। মামলা যায় সুপ্রিমকোর্টে। গোকুল ঘোষাল জিতে যান। ওয়াটসনের লোকসান হয় ১০ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে ওয়াটসন ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ নির্মাণের যন্ত্রপাতি ও কারিগর নিয়ে আসেন। সারপ্রাইজ, ননসাস ও লরেল নামে তিনখানি জাহাজও নির্মাণ করেছিলেন। অবশেষে ওয়াটসনের ডক নির্মাণ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ওয়াটসনের নাম থেকে ওয়াটগঞ্জ। ওয়াটসনের পর ডকের দায়িত্ব নেন কর্নেল কীড। ১৮১৮ সালে ৭৪ টি কামানসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ

হেস্টিংস তৈরি করেন। পরপর বেশ কিছু জাহাজ তৈরি হয়। ফোর্ট গ্লসেস্টারেও জাহাজ নির্মাণ হতে থাকে। পরে এখানে চটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট গ্লসেস্টারে ১৮২১ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ২৭খানি জাহাজ তৈরি হয়েছিল।

আধুনিক কলকাতা বন্দরের জন্ম ১৮৭০ সালে। জেটি ও নোঙর স্থানগুলি নির্মিত হয় ১৮৭৮ সালে। সে সময়ে জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাস করার জন্য ব্যবহৃত হত জলচালিত ক্রেন, যার অস্তিত্ব এমনও জেটিগুলিতে বর্তমান। পণ্য দ্রব্য তীরে নিয়ে আসা ও জাহাজে তোলার জন্য ব্যবহৃত হত ডেরিক। এই সমস্ত নোঙর স্থানে একটি শেড থেকে অন্য শেডে পণ্য স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে জলচালিত লিফট স্থাপন করা হয়। তারপর নিমির্ত হয় ১নং ও ২নং খিদিরপুর ডক ও শেড। প্রথমে জলচালিত ক্রেনে কাজ হত। পরে বসান হয় বৈদ্যুতিক ক্রেন। গার্ডেনরীচ জেটি-গুলি নির্মিত হয় ১৯২৩ সালে এবং কিং জর্জ ডক (বর্তমান নেতাজী সুভাষ ডক) নির্মিত হয় ১৯২৮ সালে। লৌহশিলা রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য লৌহ-শিলা জাহাজে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ৫ কেজি ডি নোঙর স্থানকে প্রায় যান্ত্রিক শিলা নোঙর স্থানে রূপান্তরিত করা হয় ১৯৫৬ সালে। বেশি পণ্য চালনার জন্য আধুনিক বৈদ্যুতিক ক্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল নোঙর স্থানে ১৯৫৭-৫৮ সালে। সম্প্রতিকালে ২½ টন থেকে ৩০ টন পর্যন্ত বিভিন্ন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৬ টি চলমান ক্রেন বসান হয়, যা কোন মানুষের পক্ষে নাড়ান অসম্ভব। কলকাতা বন্দর উন্নয়নের জন্য ১৮৭০ সালে সরকার পোর্ট কমিশনার গঠন করে। ১৮৭৩-৭৪ সাল পোর্ট কমিশনার হাইড্রলিক ক্রেন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। ড্রেজার আনা হয় নদীপথে, জমে যাওয়া পলি কাটার জন্য। প্রথম ড্রেজারের নাম ছিল অক্টোপাশ। ১৮৭০-৭৭ সালের মধ্যে কমিশনাররা কলকাতা বন্দরের বিপুল পবিবর্তন ঘটায়। পরবর্তিকালে নানাভাবে বন্দরের আধুনিকীকরণ ঘটেছে। বন্দরে বছরে ১২০০ থেকে ১৮০০ জাহাজ চলাচল করতে পারে। একসঙ্গে ৯০টি জাহাজ দাঁড়ানোর ব্যবস্থা এবং তার মধ্যে ৭৫টি জাহাজে মাল তোলা ও নামাবার ব্যবস্থা থাকলেও, এক সঙ্গে অতো জাহাজ আর কলকাতা বন্দরে দেখা যায় না।

খিদিরপুরে ভূকৈলাস রাজবাড়ির ইতিহাস শুরু কোম্পানি আমল থেকে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। এই বংশের পূর্ব পুরুষ কন্দর্প ঘোষাল ছিলেন সেকালে বিত্তশালী ব্যক্তি। গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়ামের স্থানে ছিল তাঁর বসতি। দুর্গ নির্মাণের সময় তাঁরা খিদিরপুর চলে যান। কন্দর্প ঘোষালের দুই-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। গোকুলচন্দ্র ভেরলেস্টের দেওয়ানী ক র

প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। ১৭৭৯ সালে তিনি মারা যান। তাঁর সম্পত্তি পান কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল। তিনি ছিলেন সন্দীপে কোম্পানীর কানুনগো। ভূকৈলাস তাঁর নির্মিত। এখানে স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। শিবগংগা ও সতীগংগা নামে দুটি দীঘিও খনন করান। দুটি শিবলিংগও প্রতিষ্ঠা করেন জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণ দিল্লীর শাসকের কাছ থেকে রাজাবাহাদুর উপাধি পান। ত্রিপুরা, ভোলা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও চব্বিশ পরগণায় এদের বহু সম্পত্তি ছিল।

খিদিরপুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। ডায়মন্ড হারবার রোডের পূর্বদিকে খিদিরপুর হাউসটি নানাকারণে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। এই দোতলা বাড়িটির মালিক ছিলেন রিচার্ড বারওয়েল। গভর্ণর জেনারেলের পাঁচজনের কাউন্সিলে বারওয়েল ছিলেন সংখ্যালঘু সদস্য। বিরাট সুদৃশ্য বাগান ছিল। বাড়িটি বল রুমের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। মাদাম হেস্টিংস, লেডী ইম্পে, মিসেস গ্রান্ড, পরে রাজকুমারী টেলিরান্ড, মিসেস ফে এবং সেকালের বহু বিশিষ্ট মহিলা এখানে আসতেন। তাছাড়া এই বাড়িটি ছিল সেকালের অভিজাত ইংরেজদের জুয়া খেলার আস্তানা। এই পথে বারওয়েল ৩৮ বছরে বহু অর্থ উপার্জন করেন। এই টাকা পয়সা নিয়ে লন্ডনে ফিরে তিনি সাসেক্সের স্টানস্টেডে জমিদারি কেনেন ও পার্লামেন্টের সদস্য হন। ১৭৮০ সালের মার্চে বারওয়েল অবসর নেওয়ায় ফ্রান্সিস কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন।

খিদিরপুর হাউসে ১৭৮২ সালে মেজর উইলিয়ম কির্কপ্যাট্রিক বাঙলা সরকারের অফিসার ও কর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন খিদিরপুর মিলিটারি অরফানেজ। তাহলেও বল রুমে নাচের ব্যবস্থা বন্ধ হয়নি। এখানে এসে জুটতেন অবিবাহিত এবং স্ত্রী হারানো স্বামীরা একটা বউয়ের সন্ধানে এবং তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরতেন না।

মেটিয়াবুরুজ

নদীপথে জলদস্যুদের অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, তখন তাদের প্রতিরোধ করতে এখানে একটি মাটির কেল্লা বা বুরুজ বানিয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ। আবার কেউ কেউ বলেন, মোগল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দুর্গটি তৈরি করেন রাজা প্রতাপাদিত্য। এরকম আরো কয়েকটি দুর্গ তিনি বানিয়েছিলেন জগদ্দল, রায়গড়, মাতলা, বেহালা, মুচিখোলা, শিবপুর ও চিৎপুর এলাকায়।

জব চার্নক নবাব বাহিনীর তাড়া খেয়ে সুতানুটি থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন মেটিয়াবুরুজে। সে সময়ে এখানে ছিল বাদশাহী নিমক মহল। এখনও একটি

এলাকা নিমক মহল নামে পরিচিত। চার্নক খানা দুর্গ দখল করে বাদশাহী নিমক মহল পুড়িয়ে দেন। এখান থেকে তার আদেশে ক্যাপ্টেন নিকলসন সসৈন্যে এগিয়ে গিয়ে হিজলী দখল করেন।

মেটিয়াবুরুজে ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর উইলিয়াম জোন্সের বাগানবাড়ি। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জোন্স ১৭৯৪ সালের ১ মে মারা যান তাঁর বাগান বাড়িতে।

বালিগঞ্জ / যাদবপুর

বালিগঞ্জ বর্তমান কলকাতার অভিজাত এলাকা। বিত্তশালী নাগরিকদের বসবাস বেশি। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা। বর্তমানে যাদবপুর, গড়িয়াহাট, বাঁশদ্রোণী, পুঁটিয়ারী, বৈষ্ণবঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যাপক বসতি গড়ে ওঠায় বালিগঞ্জের গড়িয়াহাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঢাকুরিয়ার সম্প্রসারণও ঘটেছে। এর মধ্যে যাদবপুর নানাকারণেই সকলের থেকে এগিয়ে।

যাদবপুর অর্থাৎ এখানে দুগ্ধব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল সব থেকে বেশি। যে কারণে এই নামকরণ। এখন যাদব খুঁজে পাওয়া শক্ত। বিস্তৃত এলাকার ব্যাপক জনবসতি গড়ে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, কলকারখানা মিলে ব্যাপক কর্মব্যস্ততা লক্ষণীয়। যক্ষা হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, সুলেখা ওয়ার্কস যাদবপুরকে সমৃদ্ধ করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের কথা এসে পড়ে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল শিক্ষা বিকাশের জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর বিশিষ্ট বাঙালীদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের। ১৯০৬ সালের ১ জুন কাউন্সিল রেজিস্ট্রি হয়। সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ। গভর্নিং বডির সদস্য—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং অরবিন্দ ঘোষ। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, গৌরীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং ময়মনসিঙের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। ১৯০৬ সালের ১৫ আগস্ট হিউম্যানিটিসের ওপর পাঠক্রম শুরু হয়। অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ। সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, অঙ্কে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প বিষয়ে এ.কে. কুমারস্বামী এবং উপনিষদের ওপর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষণ দিতেন। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। ন্যাশনাল কাউন্সিলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর নাম হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল

ইনস্টিটিউট। রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে ১৩ লাখ টাকা পেয়ে কাউন্সিল টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রসারের পরিকল্পনা নেয়। ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যাদবপুরের বর্তমান স্থানে কর্পোরেশনের ১৯২ বিঘা জমি কাউন্সিলকে ব্যবস্থা করে দেন। ঐবছরের ১১ মার্চ মূল বাড়ির (বর্তমান অরবিন্দ বিল্ডিং) ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে নতুন বাড়িতে ইনস্টিটিউট উঠে আসে। নাম হল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর নানাবিধ পরিবর্তন হয়। জওহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায় কাউন্সিলের এই বিস্ময়কর কাজের স্বীকৃতি জানাতে নানান উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে জন্ম হয় যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়াং অ্যান্ড টেকনোলজির। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড টেকনোলজি, বায়ো-কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পারেটিভ লিটারেচার, ইলেকট্রনিকস্ ও টেলিকমিউনিকেশন, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওলজি, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, ফার্মেসি, বাঙলা, ইংরেজি, সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে।

স্বদেশী আমলে জন্ম সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের। যাদবপুর কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে এদের কারখানা ছিল অন্যত্র। দুই বাঙালী শংকরাচার্য মৈত্র এবং ননীগোপাল মৈত্র এই প্রতিষ্ঠানের জনক। উত্তর চব্বিশ পরগণার সোদপুরেও এদের একটা কারখানা আছে।

বারুইপুর

বারুইপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গা কালীঘাট, বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, সূর্যপুর বা নাচনগাছা, মূলাট, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ হয়ে সাগর দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছিল। তার শুষ্ক খাত বেশ কিছু কাল দেখা যেত। বারুইপুরের শ্মশান কীর্তন খোলা এই আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত।

এই প্রাচীন বর্ধিষ্ণু অঞ্চলটিতে একসময় বারুজীবী সম্প্রদায়ের বাস ছিল খুবই বেশি। যে কারণে স্থানটি বারুইপুর নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে একটি শহর।

বিপ্রদাস চক্রবর্তী ১৪৯৫ সালে লেখেন মনসার ভাসান। চাঁদ সওদাগর সিংহল যাত্রা করেন আদিগঙ্গা দিয়ে। সে সময় তিনি বারুইপুর অতিক্রম করেছিলেন।

"কালীঘাটে চাঁদরাজা কালীকা পুজিয়া।
চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে।।

হুলিয়ার গাঙ্গবাহি চলিত ত্বরিত।
ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাওয়ার সময় বারুইপুরের কাছে আটিসারা গ্রামে একরাত কাটান বৈষ্ণবভক্ত শ্রীঅনন্ত লাল আচার্যের বাড়িতে। বর্তমান বারুইপুর বাজারের কাছে শ্রীঅনন্ত আচার্য তার গৃহে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের দারু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বারুইপুর বাজারের কাছে ৮নং ওয়ার্ডে একটি গৃহ থেকে সেই দারু বিগ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, সেখানে একটি মঠ নির্মাণ করেছে বরানগর পাঠবাড়ি আশ্রম কর্তৃপক্ষ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আনন্দগিরির ধর্মপত্নী তারামণি দেবী বিশালাক্ষী দেবীর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দময়ী কালী মন্দিরের সামান্য দূরে। জনশ্রুতি এই মন্দির প্রাঙ্গণে আছে তারামণির সমাধি। আর আনন্দগিরি মহারাজের সমাধি আছে আনন্দময়ীর সিংহাসনের নীচে পঞ্চমুণ্ডী আসনের ওপর।

বারুইপুরের জমিদার বাড়ি প্রতিষ্ঠিত বিবিমার দরগা আছে বাগানী পাড়ায়। নিত্য সেবার জন্য জমি দান করেছিলেন এবং দরগাটি তাদের তৈরি। এখনও প্রাত্যহিক সেবা খরচ তাঁরাই বহন করেন। মহামারীর হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার জন্য এই বিবিমা (ওলা বিবি) প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুমুসলমান সকলের পূজ্য। বিবিমার বার্ষিক পূজা বা হাজত হয় পৌষমাসের শুক্লপক্ষের শনিবার। রায়চৌধুরী পরিবারের বর্ষীয়সী রমণীরা বেলা বারটা পর্যন্ত উপোস থেকে প্রথম হাজত দেয়। এরপর হয় মুসলমানদের হাজত। তারপর অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা দিতে পারে।

রায়চৌধুরী পরিবারে বিবিমার বার্ষিক পূজার দিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এখনও পালিত হচ্ছে। প্রথমে এই পরিবারের বর্ষীয়সী কোন গৃহিণী কাঁড় দিয়ে সুসজ্জিতা বিবিমার মূর্তি তৈরি করেন। মূর্তি গড়া হয় সন্ধ্যায় আনন্দময়ীর আরতির পর। মূর্তি নির্মাণ শেষে তিনি মনের কামনা জানিয়ে চৌকাঠে জল ঢালেন। এবার অন্যান্যরাও চৌকাঠে জল ঢেলে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়।

এই অনুষ্ঠান শেষ হলে সদর দরজার দেয়ালে বিবিমার মূর্তি আঁকা হয় সিঁদুর-কাজল চন্দন দিয়ে। আবার চৌকাঠে জল ঢালা হয়। বিবিমার পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। যাত্রা, পুতুলনাচ, গান হয় বিবিমার। এই গানে একসময় নাম করেছিলেন নিতাই ছাটুই। বারুইপুরের কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত আটঘরা গ্রামে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের মূর্তি ও মুদ্রা। পাল আমলের কিছু প্রত্নানদর্শনের সন্ধান মিলিছে। অনেকের মতে প্রায় দুহাজার বছর আগে এই স্থানটি ছিল ইন্দো-রোমান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং

গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্যতম বন্দর নগরী। ফাঁসিডাঙায় পাওয়া গেছে বিশাল মৃত জীবজন্তুর কঙ্কাল। বড়বড় দীঘি থেকে শুঙ্গ, কুষাণ যুগের এবং পাল সেন আমলের প্রত্ন বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। কালো পাথরের মূর্তি, মৃৎপাত্র, টেরাকোটা পুতুল, মুদ্রা, লিপি ও সীলমোহর পাওয়া গেছে। দুটি উঁচু ঢিবি আছে সতীমার থান ও দেওয়ানগাজীর মাজার নামে। প্রাচীন গড়ের প্রাচীর আছে দমদম ঢিবির কাছে মাটির নিচে। প্রাচীরের কাছে আছে ইঁটের ঘর। এর ভিতর পোড়ামাটির গোলাকার এক ধরনের অস্ত্র, ধাতু নির্মিত বর্শা ফলক পাওয়া গেছে।

মেদমল্লপরগণার অধীনে বারুইপুরের জমিদারি স্বত্ব পান বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষ। তখন তাঁদের নিবাস ছিল রাজপুর গ্রামে। সেখানে তাঁদের বসত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তখন বারুইপুর ছিল জঙ্গলময়। রাজা মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী প্রথম বারুইপুর আসেন বসবাসের জন্য। তারা বহু জমি দান করে নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে বসবাসের সুযোগ করে দেন। অল্প দিনে স্থানটি জনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেশ কিছু রাজস্ব ও প্রশাসন সংক্রান্ত অফিস এখানে চালু হয়। তার মধ্যে ছিল নিমকমহল, নিমক মহলের অন্যতম সদর কার্যালয় এবং একজন মেডিকেল অফিসারের দপ্তর। নিমক মহলের এজেন্ট প্লাউডন এখানে ১৮২০ সালে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৩ সালে ঐ বিদ্যালয় মিশন স্কুলে পরিণত হয়। খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বারুইপুর। প্রায় ৭০০ লোকের উপযোগী যে গির্জাটি তারা নির্মাণ করেন, তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মিশন যাওয়ার পথের ধারে আছে দুজন ইংরেজের কবর।

রায়চৌধুরী পরিবারের রাজা মদন রায়কে তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা রাজস্ব না দিতে পারায় ১৬৭৬ সালে শায়েস্তা খাঁ বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যান। বাশড়ার জঙ্গলে দৈবশক্তি সম্পন্ন ফকির মোবারক গাজি সে সময়ে বাস করতেন। মদন রায় তার শরণাপন্ন হলে, ঢাকা দরবার থেকে সসম্মানে মুক্তি পান তিনি। জনশ্রুতি, একটি বাঘ নিয়ে বাদশার দরবারে হাজির হয়েছিলেন মোবারক গাজি। পরবর্তী সময়ে মদন রায় গাজী সাহেবের মাহাত্ম্যপ্রচার করেন। ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশনের কাছে গাজী সাহেবের আস্তানা আছে।

বারুইপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে নীলচাষ হত এবং সে নীল ছিল উৎকৃষ্ট মানের। অবশ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের নীল বারুইপুরের নীল নামে পরিচিত ছিল। নীলকরদের সদর দপ্তর ছিল বারুইপুরে। নীলকরদের আবাসস্থান 'বড়কুঠি' নামে

পরিচিত। বারুইপুরের রাস্তার ধারে এই বৃহৎ বাড়িটি ছিল নীলকর সাহেবদের প্রধান কেন্দ্র। নীলকররা এই বাড়ির পিছন দিকে একটি খাল কেটে আদিগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। সে সময় ছত্রভোগ ও কাটান দীঘিতেও ছিল নীলকুঠি। এই নদীপথে ঐ সব কুঠির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত।

বারুইপুরে রাসের মেলা বহুদিন প্রচলিত। প্রচলন করেন জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার। প্রতিবছর কার্তিক পূর্ণিমায় একমাস ধরে মেলা চলে। রথযাত্রার মেলা, দোলযাত্রার মেলা, চড়কের মেলাও বারুইপুরের ঐতিহ্য। এসব মেলা দুশ বছরের পুরানো।

আনন্দগিরি মহাশয় প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী কালীমন্দির আছে জমিদার রায়চৌধুরীদের বাড়িতে। তিনিই গৃহদেবতা। কালী মন্দিরের সামনে পঞ্চমুণ্ডির আসন। বারুইপুরের রাধাকৃষ্ণমন্দির, দুটি পঞ্চানন্দের থান, শীতলা, বিশালাক্ষী, ওলাবিবি, গাজী সাহেবের থান এবং দুটি বাবা ঠাকুরের থান আছে। শ্রীঅনন্ত আচার্যের ভিটায় যে মঠ তৈরি হয়েছে আটিসারা গ্রামে, সেখানে প্রাত্যহিক পূজা হয়। বৈশাখ মাসে উৎসব ও মেলা হয় তিন দিন ধরে। মদারাট গ্রামে শিব, কালী ও পঞ্চানন্দের মন্দির আছে। শিবের গাজন এবং ঈদ, মহরম উপলক্ষে গ্রামটিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। গাজনের মেলা একশ বছরের পুরানো। একটি মনসার থান এবং একটি মসজিদ আছে।

বারুইপুরের কাছেই হোটর রেলস্টেশন। এখানে নেমে যেতে হয় ধনবেড়িয়া গ্রামে। গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ছিল আদি গঙ্গা। তার শুষ্ক খাতের ধারে আজও বর্তমান 'জগদি ঘাট'। অনেকের অনুমান, এইটিই মনসামঙ্গলে বর্ণিত জগতঘাট। মাঘী পূর্ণিমায় বিবিমার উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক জনসমাগম হয়। একটি মেলা বসে ও যাত্রাভিনয় হয়।

কল্যাণপুর রেলস্টেশন নেমে যেতে হয় ইন্দ্রপালা গ্রামে। এই গ্রামের একটি বড় পুকুরের ধারে বৈশাখ মাসে গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে তিন দিনের মেলা হয়। একটি পুরানো ভাঙা মন্দির আছে গ্রামে, বাবাঠাকুর ও মনসার থান আছে কয়েকটি।

মাইকেল মধুসূদন, অরবিন্দ ঘোষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে স্থানটির সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কার্যকালে ১৮৬৪ সালের ৫ মার্চ বারুইপুর আসেন এবং এখান থেকে ১৮৭০ সালে বহরমপুর বদলি হয়ে যান। এই সময়কালের মধ্যে তাঁকে অন্যত্রও যেতে হয়েছিল। বারুইপুরে কেবল নয়, বঙ্কিমচন্দ্র মজিলপুরেও বাস করেছেন কিছুকাল। সেখান থেকে আসতেন বারুইপুর কোর্টে। কলকাতা নির্ভর

শিক্ষিত মানুষদের বসবাস এ সময়ে চাংড়িপোতা রামনগর, রাজপুর, হরিনাভি, জয়নগর ও মাহিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমশ বাড়ছিল। তাছাড়া ছিল সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র এবং সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন এইসব গ্রামের অধিবাসী। বঙ্কিমচন্দ্র একটি সুস্থ পরিমণ্ডল পেয়েছিলেন এখানে। কলকাতা থেকে বঙ্কিমের বন্ধুরা আসতেন মাঝে মাঝে। তার মধ্যে জগদীশ নাথ রায় ও দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বসে লিখেছিলেন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী।

বারুইপুরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান। এই জাতীয় সভার জন্ম ১৮৬৭ সালে। সেকালের স্বদেশপ্রেমিক বিদগ্ধ বহু বিশিষ্ট বাঙালী ছিলেন এর সঙ্গে জড়িত। হিন্দুমেলার শাখা মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বারুইপুরে ১২৭৬, ১২৭৮ ও ১২৭৯ বঙ্গাব্দে তিন বছর। বারুইপুরে যে মেলার আয়োজন হয়েছিল সে সম্পর্কে মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় ছিল ঃ 'চব্বিশ পরগণা বঙ্গদেশের একটি প্রধান জেলা, ইহার উপবিভাগও বিস্তর, ইহা রাজধানীর নিতান্ত সন্নিহিত। এই জিলার বসুমতী শস্যরত্ন চিরবিভূষিতা রহিয়াছেন। বারুইপুর এই জিলার মধ্যে একটি প্রধান এবং মেলার পীঠস্থান, কারণ এখানকার রাসপূর্ণিমার মেলা সাধারণ মেলা নহে। সুতরাং ইহা যে মেলার উপযুক্ত স্থল তাহা বলাবাহুল্য।"

প্রথম বছরের মেলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৩০ ফাল্গুন থেকে ২ চৈত্র পর্যন্ত জমিদার রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন স্থানীয় যুবক মেলার সহ-সম্পাদক নবগোপাল বসু। প্রায় ১০ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। বক্তৃতা, আলোচনা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী, ব্যায়াম, সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার, কুস্তি, দৌড় ও বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ছিল অন্যতম আকর্ষণ। মেলা সম্পর্কে ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র সোমপ্রকাশ পত্রিকা লিখেছিল ঃ "গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে ২রা চৈত্র পর্যন্ত বারুইপুরস্থ চৌধুরী বাবুদিগের বাটীর সম্মুখের মাঠে মহাসমারোহে জাতীয় হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে দর্শনীয় কিছুই ছিল না। শিল্পজাত দ্রব্য যাহা কিছু ছিল তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। মেলাস্থলে প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের লেখা ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের বক্তৃতা বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিদ্যাবাগীশের মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা কৃষক ও অন্যান্য ভদ্রলোক মাত্রেই বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এটী স্থায়ী হইলে এদেশের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।"

পরের বছরেও বিপুল উৎসাহ নিয়ে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার অধ্যক্ষ রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন সোমপ্রকাশ পত্রিকায়ঃ "২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর নামক পল্লীর মধ্যে জাতীয় হিন্দুমেলা…অতিসমারোহে উক্ত স্থানের জমিদার বাবুদিগের বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে হইবে, তজ্জন্য সর্বপ্রকার ব্যবসায়ীদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবে, তৎসমুদয় বিক্রয় হওয়ায় যথেষ্ট লাভ হইবে এবং যাহার অর্জিত দ্রব্য সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

তৃতীয় বারের মেলাটিই বারুইপুরের শেষ হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান। আশাতীত ভাবে এবারের মেলাও সফল হয়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লেখে (১২৭৯ বঙ্গাব্দ ১২ চৈত্র)ঃ "…তিন দিবসই সাধারণের দর্শনোপযোগী অনেক ব্যাপার হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে হিন্দুজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ স্বরচিত বিবিধ সুচারু ও সম্পন্ন শিল্পদ্রব্য সংগৃহীত ও প্রদর্শিত ও নানা প্রকার অসাধারণ ও চমৎকার কৃষিজাত দ্রব্য মেলাস্থানে আনীত হইয়া তৎসমুদায়ের রচয়িতা ও উৎপাদনকারিদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক চমৎকার রূপে ব্যায়াম কার্য সম্পন্ন করিয়া সাধারণের বিশেষ প্রীতি ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। রায়বাঁস নামে একপ্রকার দেশীয় ব্যায়াম হইয়াছিল। মেলাস্থলে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য দেশীয় অসামান্য কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল সঙ্গীত হইয়াছিল তাহার এক একটিতে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের মিথ্যা গ্লানি ঘোষণা ও ভদ্রতার বিরুদ্ধে বাক্য বিন্যস্ত থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।……বাস্তবিক মেলা পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বিশেষ ফলোপধারী ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।"

মল্লিকপুর

রেলস্টেশন মল্লিকপুর একটি পবিত্র বিখ্যাত স্থান। এখানে আছে নাখোদা সম্প্রদায়ের পীর হাবিব আবদুল্লা আল আত্তাসের দরগাহ। পীর সাহেব গণিমা তুল খয়ের ওয়াকফ স্টেট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। দর্শনীয় মসজিদ ঘিরে আছে গোলঘর, জলাশয়, দোতলা কুয়োঘর ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মসজিদের গম্বুজ ও চারকোণের মিনার আকর্ষণীয়। পীর সাহেব দেহরক্ষা করেন আরবে। সে কারণে এখানে পীরের মাজার তৈরি হয়নি, হয়েছে পীরের আস্তানা।

মল্লিকপুরের কাছে মাইনগর গ্রামে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জন্মস্থান। পুরন্দর শিয়াখালার রাজাকে পরাস্ত করে পুরন্দর গড় প্রতিষ্ঠা করেন।

বজবজ

গঙ্গাতীরে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল শহর বজবজ ভারতের অন্যতম কেরোসিন তেল ও পেট্রল ডিপো। জাহাজ বাহিত তেল ও পেট্রল বিরাট বিরাট ট্যাঙ্কারে রাখার ব্যবস্থা আছে। মুসলিম আমলে এখানে যে দুর্গ ছিল, ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণের আগে ক্লাইভ সেটি দখল করে নেন। দুর্গটি বন্ধ হয়ে যায় ১৯০৩ সালে। তখন এখানকার কামান ও যুদ্ধাস্ত্র কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। যুদ্ধের কোন চিহ্নমাত্র নেই। বজবজের পাট ও কাপড় কলগুলি একসময় ছিল উৎপাদনক্ষম।

বজবজের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথী তীরে আচিপুর গ্রামে চীনাদের একটি মন্দিরে প্রতি বছর মাঘ-ফাল্গুন মাসে উৎসব উপলক্ষে কলকাতার চীনারা আসে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় টুং আচুন এইস্থানে একটি চিনি কল স্থাপন করে। গ্রামটি আচিপুর নাম হয়েছে তার নাম থেকে। টুং আচুর অশ্বক্ষুর আকৃতির কবর আছে এখানে।

স্বামী পূর্ণানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'খুকীকালী' নামে খ্যাত একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে চিত্রগঞ্জ শ্মশান ঘাটে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি শিবমন্দির ও কষ্টিপাথরের গোপালমূর্তি ও নারায়ণ শিলা অবস্থিত। মন্দিরের কাছেই আছে স্বামী পূর্ণানন্দের সমাধি, গৌরাঙ্গ মন্দির, মনসা মন্দির, শীতলামন্দির, কয়েকটি মসজিদ, পীরডাঙার দরগা, মায়াপুকুরের কালী মন্দির বজবজের অন্যতম আকর্ষণ। গৌরাঙ্গমন্দিরে ফাল্গুন মাসে উৎসব ও মেলায় প্রচুর জনসমাগম ঘটে। মনসাতলায় ১ বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব ও মেলা, আষাঢ় মাসের রাসযাত্রা এখনও জনপ্রিয়। রথ যাত্রার মেলা হয় গোয়াল পাড়ায়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শীতলাপুজো উপলক্ষে মেলা হয় ডঃ এস. এন. ঘোষ রোড ও আশুতোষ মুখার্জি রোডের শীতলা মন্দিরে। ঐ সময় চলে মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব। আষাঢ় মাসে রথের মেলা হয় বিড়লাপুর বাজারের কাছে। এখানে একটি শিবমন্দির ও গঙ্গার ধারে একটি মসজিদ রয়েছে। সব থেকে বড় মসজিদ আছে মৌলানা আজাদ রোডে।

বজবজ থানার পাইকপাড়ার ধ্বংসোন্মুখ একটি আটচালা মন্দির এখনও মাথা উঁচু করে আছে কোনক্রমে। ১৭৫৪ সালে মন্দিরটি তৈরি করান কেদার দাস। টেরাকোটা কাজসমৃদ্ধ মন্দিরটির শিল্পী ছিলেন বুলচন্দ্র পাল।

বজবজে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০০ সালে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ছড়িয়ে আছে পৌরসভার সর্বত্র এবং বাইরেও। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৬০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট পৌরসভার

জনসংখ্যা ৮০ হাজার। ওয়ার্ড সংখ্যা ১৬। পৌরবাজার ২টি। ৫১.৩১ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে আছে কাঁচা রাস্তা ১১.১৮৫ কিলোমিটার ও ইঁট বাঁধানো রাস্তা ১৫.৩৮০ কিলোমিটার, মেটাল রাস্তা ২১.৩২৩ কিলোমিটার এবং সিমেন্ট কনক্রিট ৩.৪৩২ কিলোমিটার। ২১.৭৩২ কিলোমিটার ড্রেনের ১৬.৯৬২ হল কাঁচা এবং ৪.৭৭ কিলোমিটার হল পাকা ড্রেন। পানীয় জল সরবরাহ হয় ৬৫০টি বাড়িতে। দৈনিক জল সরবরাহের পরিমাণ ২১ গ্যালন। ডিপ টিউবয়েল আছে ৫টি। শ্মশান ও কবর স্থান আছে একটি করে। স্ট্রিট লাইট ১৩৭৩টি; হ্যালোজেন ৬টি এবং মারকারি ভ্যাপার ল্যাম্প ১২টি। পৌরসভার ৩টি ট্রাক্টর রয়েছে। পৌরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮টি। একটি কলেজ আছে এখানে।

গার্ডেনরীচে জলসরবরাহ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর পৌরসভার ৫৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ৭০ ভাগ মানুষ নিয়মিত পানীয় জল পাচ্ছেন।

বজবজের উল্লেখযোগ্য পাট ও তেল কোম্পানির মধ্যে আছে ঃ বজবজ জুট মিল, নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলস, ক্যালেডোনিয়ন জুট ইন্ডাস্ট্রিজ, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি প্রভৃতি। আলোক উদ্যোগ বনস্পতি প্লাইউড লিমিটেড একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান।

বাওয়ালী

বজবজ থানার বাওয়ালী এক সময় ছিল সমৃদ্ধ গ্রাম। বহু পূর্বে অঞ্চলটি ছিল জঙ্গল সমাকীর্ণ। সেই জঙ্গলে ছিল কয়েক ঘর বাওয়ালীর আবাস। তারা মধু ও কাঠসংগ্রহকারীদের সাহায্য করত। এই বাওয়ালী সম্প্রদায়ের বসবাসের কারণে, স্থানটি পরিচিত হয় বাওয়ালী নামে। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে ছিল বাওয়ালী ফকিরের আস্তানা। সেজন্য গ্রামটি বাওয়ালী নাম পায়। কিন্তু অঞ্চলটির কোথাও ফকিরের আস্তানার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

মুঘল আমলে এই জঙ্গলসমাকীর্ণ এলাকায় জমিদারি পত্তন করেন বিত্তশালী মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবভক্ত মণ্ডলরা। আঠারো শতকের কোন সময়ে মণ্ডল পরিবারের হরানন্দ মণ্ডল এখানে জমিদারি পত্তনে এলে, স্থানীয় বাওয়ালীরা সহযোগিতা করে। এদের আদিপুরুষ বাসুদেব রায় মোগল দরবারে চাকরি করতেন। জমিদার হিসাবে এদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে, শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে। বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন মণ্ডলদের অনেকেই। বেশির ভাগ মন্দিরে বিগ্রহ নেই। মন্দিরগুলিও জীর্ণ প্রায়। "...প্যারীলাল মণ্ডল বহু বৃহদায়তন দেবমন্দির নির্মাণ করান।

টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পূর্বকূলে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে তিনি হরিহরধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির সংলগ্ন জমিতে আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দিরে গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার সামান্য দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রাধামদনমোহন জীউর মন্দিরটি মণ্ডল পরিবারের উদয়নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধামদনমোহনজীউর মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার তীরবর্তী আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দিরগুলি মানিকনাথ মণ্ডল কর্তৃক ১২০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত বলিয়া জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে মণ্ডল টেম্পল লেনের উপর বর্তমানে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত যে নবরত্ন মন্দিরটি দেখা যায় উহাও বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের কীর্তি। এইরূপ সুবিশাল নবরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে অতি অল্পই আছে। বর্তমানে এই মন্দিরে কোন বিগ্রহাদি নাই। —(পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ১৩২)।

রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে রাধাবল্লভজীউ, গোপীনাথজীউ ও শ্যামসুন্দরজীউ মন্দিরে। রাধাবল্লভজীউয়ের আটচালা দক্ষিণমুখী মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি ও মেঝে শ্বেত পাথরের। মন্দিরের নক্সা আকর্ষণীয়। সামনে আছে নাটমন্দির ও তুলসীমঞ্চ। এই মন্দিরের পূর্ব-দিকে দক্ষিণমুখী গোপীনাথজীউর সুউচ্চ নবরত্ন মন্দিরের সামনেও আছে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের সামনে রাসমঞ্চ ও ঝুলনমঞ্চ দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত। ১২০১ বঙ্গাব্দে (১৭৯৪ সাল) গোপীনাথজীউ মন্দির নির্মাণ করেন মানিক মণ্ডল। গোপীনাথজীউ মন্দিরের উত্তর দিকে দুটি ভগ্ন মন্দিরের গায়ে কিছু ফুল লতাপাতার কাজ আছে। এখানে অবস্থিত আটচালা রাধাকান্তজীউ মন্দির ১৭৭১ সালে (১৬৯৩ শক) নির্মাণ করেন হরানন্দ মণ্ডল। বুলচন্দ্র মিস্ত্রী ছিলেন প্রধান শিল্পী। পরে মন্দিরের সামনে নাটমন্দির তৈরি করা হয়। রাধাকান্ত মন্দিরের পশ্চিমে চারচালা শিবমন্দির এক সময় আকর্ষণীয় ছিল। মন্দিরের সামনে ছিল দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ। দোলমঞ্চের চিহ্নমাত্র নেই। রাসমঞ্চটি এখনও টিকে আছে। মূল মন্দিরের গায়ে ছিল পোড়ামাটির অলঙ্করণ। রাধাকান্ত মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে এবং পশ্চিমদিকে দুটি বৃহদায়তনের মন্দির আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। একটি মন্দিরের গায়ে কিছু পোড়ামাটির কাজ এখনও দেখা যায়।

গ্রামে চণ্ডী ও সত্যপীরের থান ছাড়াও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। তিনশ বছরের পুরানো মানিকচন্দ্র মণ্ডলের রথযাত্রা এখনও বসে। মেলায় আসে নানা ধরনের গ্রামীণ জিনিসপত্র।

স্থানীয় বুইতা গ্রামে দশবুছরের প্রাচীন কালীপূজা, চড়ক ও গোষ্ঠযাত্রা উৎসব

সাড়ম্বরে পালিত হয়। ওলাবিবি, শীতলা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, মনসার পুজা হয়। চাউলখোলা গ্রামে আছে ছয়টি শিবমন্দির। দুর্গাপুজা, চড়ক, ধর্মপুজা হয়। পঞ্চানন্দ, দক্ষিণ রায় ও মনসার থান আছে।

ধপধপি

ধপধপি হল বারুইপুর জংশন থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে একটি স্টেশন। এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত। বাঘের দৌরাত্ম্যে মানুষের জীবিকা নির্বাহ ছিল অসম্ভব। সুন্দরবনে কাঠ, মধু, মোম সংগ্রহকারীরা দক্ষিণ রায়ের পুজা দিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করত। এই সময় নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের সংঘাত একটি নরবলি দেওয়ার ঘটনা কেন্দ্র করে। মুনশী বয়নদ্দিনের 'বনবিবির জহুরানামা'য় সেই কাহিনীটি আছে। কলিঙ্গা নিবাসী দুই বণিক ধনা ও মনা এক দুঃখিনী বিধবার পুত্র দুখেকে নিয়ে যায় দক্ষিণ রায়ের কাছে বলি দেওয়ার জন্য। বালকের ক্রন্দনে বিচলিত সুন্দরবনের অধিশ্বরী বনবিবি অনুচর জঙ্গলী শাকে পাঠান। জঙ্গলী শা বালককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পরাস্ত দক্ষিণ রায় কুমারখালির বড়খাঁ গাজীর শরণাপন্ন হয়ে সমস্ত ঘটনা জানান। বড়খাঁ গাজী দক্ষিণ রায়কে সঙ্গে নিয়ে কেঁদোখালির চরে বনবিবির দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, বনবিবি দুখেকে কোলে নিয়ে বসে আছেন।

"হেনকালে উপনীত গাজী দক্ষিণ রায়।
ছালাম করিল রায় বনবিবির পায় ॥
তাতল খাঁ খোশাল খাঁ আর অলিগণ।
কর জুড়ি করিয়া আইল সর্বজন ॥
হরি রায় বিষম রায় আর কাল রায়।
আসিয়া ছালাম করে বন বিবির পায় ।।
কহেন বড়খাঁ গাজী শুন নেকমাই।
তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই ॥
দক্ষিণ রায়ের পর কোপ কর দূর।
এখাতের আইলাম তোমার হুজুর ।।
এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল।
সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল ॥
আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না ॥

সংকটে পড়িয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না করিবে ॥
রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার ॥
বনেতে আসিয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে ॥

এইভাবে বড়খাঁ গাজী মিটিয়ে দিলেন বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের সংঘাত। বনবিবির আদেশে ধনা ও মনার মেয়ের সংগে দুখের বিবাহ হয়ে যায়।

অনেকেরই ধারণা এই দক্ষিণ রায় আদিতে ছিলেন মানুষ। সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলের ছিলেন অধিপতি। মুসলমান পীর বা গাজীদের সঙ্গে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে স্থানীয় রাজাদের বিভিন্ন সংঘাতের কাহিনী জানা যায়। দক্ষিণ রায় বনবিবির বর্তমান কাহিনী তারই ইংগিতবহ। বড়খাঁ গাজীর সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়। পরে সন্ধি হয়।

দক্ষিণ রায়ের পিতার নাম ছিল প্রভাকর রায়। ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন তিনি। পরে সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন।

"দক্ষিণরায় নামটিও আদিম যুগের হতে পারে না। এই নাম বহু পরবর্তী কালের এবং কোন ব্যক্তি বিশেষেরও হতে পারে। কোন কোন মনীষী মনে করেন দক্ষিণ রায় এককালে বাঙলাদেশের দক্ষিণতম অংশে মনুষ্য দেহেই ছিলেন, হয়ত বিশাল এক ভূখণ্ডের প্রবল প্রতাপশালী জননেতা বা রাজা ছিলেন, তিনি ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের ভয় ভক্তির আধিক্যে দেবতার মত পূজ্য হন। কালক্রমে পূর্ণ দেবতা হয়ে যান। পৃথিবীর বহু স্থানেই এ রকম ঘটেছে, দেবরাজ উপাসনা (cult) বহু স্থানেই প্রচলিত ছিল। মনে হয় মানুষ দক্ষিণ রায় ঐ মধ্য যুগের এবং কোন এক পরবর্তিকালে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের পূজ্য ব্যাঘ্রদেবতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ব্যাঘ্র দেবতা 'দক্ষিণ রায়' বনে গেছেন। ব্যাঘ্র দেবতা আদি কালের ও দক্ষিণ রায় পরবর্তী সময়ের। কিন্তু তিনি মানুষ এবং ব্যাঘ্র হল পশু, তাই পদাধিকার বলে ব্যাঘ্র তাঁর বাহন হয়ে গেছে। সেই কাল থেকে প্রচলিত মূর্তি অর্থাৎ 'ব্যাঘ্র বাহন দক্ষিণ রায়কে আজও আমরা দেখি।......দক্ষিণ রায়ের বিষয় গবেষকদের অনেকে মনে করেন তিনি ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন। তাঁরা বলেন,—দক্ষিণ রায় আদি পাঠান যুগে একজন স্বধর্ম ও সমাজরক্ষক মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সে সময়ে সশস্ত্র ইসলাম

প্রচারকদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ তার হয়েছিল, সেইজন্যে দক্ষিণ রায়ের পূর্ণ মূর্তি সর্বদা যোদ্ধা বেশেই আজও দেখা যায়। বহু মন্দিরে বা থানে বর্ণ ব্রাহ্মণরাই এঁর পৌরোহিত্য করেন শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে এবং ইনি শিবপুত্র বলেও প্রচারিত হন কিন্তু আকৃতি ও বেশভূষা যোদ্ধাসুলভ।

"মধ্যযুগে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গলে' দক্ষিণ রায়কে মানুষ রূপেই বর্ণিত করেছেন, তবে দক্ষিণ রায় ঐশী শক্তিশালী একথা দু-একস্থানে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় রায়মঙ্গলে বর্ণিত দক্ষিণ রায়ের রাজধানী বলে বর্ণিত 'খাড়ি' নামক স্থান এবং গাজী দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধক্ষেত্র 'খনিয়ার প্রান্তর' বা পল্লী আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মধ্যে দেখা যায়। খাড়ি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান—পাল সেনযুগেও খ্যাতি ছিল তা আবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদি থেকে জানা যায়। খনিয়া এখন নগণ্য পল্লী কিন্তু এখানে 'মুকুট রাজার দীঘি' নামক বিরাট জলাশয় আছে—মাটির নীচ থেকে আদি পাঠান যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। খনিয়ার কিছু উত্তরে চণ্ডীপুর মুসলমান পল্লী, এখানে দক্ষিণরায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী (বর্ণিত) বড়খাঁ গাজীর কবর অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে। কবরের ভাঙ্গা ইঁটগুলি দেখলে পাঠান যুগের বলেই মনে হবে।" (বাঙলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু। পৃঃ ১৫৩)।

ধপধপির দক্ষিণ রায়ের মন্দির ঘিরেই স্থানটির প্রসিদ্ধি। শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে একটি স্টেশনও ধপধপি। ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে। ১ মাঘ প্রতিবৎসর জাঁতাল উৎসবে বিপুল সংখ্যক ভক্ত আগমন ঘটে। বহু পুরানো মেলা বসে ১ মাঘ ও ২ মাঘ। মেলায় আসে দূর দূরান্তের মানুষ। নানা জিনিস বেচাকেনার দোকান বসে। যাত্রা কবিগান হয়। জলসার আসর বসে। বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের জমির ওপর গড়ে ওঠে মন্দির। মন্দির তাদের তৈরি। দেবোত্তর জমিও দেন তারা। সেসব জমির বেশির ভাগই বেদখল হয়ে গেছে।

বাবা দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণ রায়ের কাছে মানত করলে, এমন রোগ নেই যা আরোগ্য হবে না—এমন বিশ্বাস প্রচলিত। ১ মাঘ জাঁতাল উৎসবে সময় দক্ষিণ রায়ের ছোট আকৃতির মাটির মূর্তি গাড়িয়ে মন্দিরে দেয় অনেকেই। এই 'ছলন-মূর্তি' জমা হয় মন্দিরে। পরের বছর পুজার আগে পুরানো মূর্তিগুলি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক সময় সোনা-রূপার মূর্তিও জমা পড়ে।

ধপধপির দক্ষিণ রায় ছিলেন বাঘের দেবতা। আগে স্থানটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বাওয়ালীরা অরণ্যে প্রবেশের আগে বাবা দক্ষিণ রায়কে পুজা দিয়ে কাজে যেত।

নিরাপদে ফিরে এসে আবার পূজা দিত। অরণ্য বহুকাল দূরে সরে গেছে লোকবসতির ফলে। বাবা দক্ষিণেশ্বরের মহিমা অরণ্য থেকে ফিরে এসেছে জনপদে। এখন তিনি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করতে তেলপড়া, জলপড়া আর নানা মালিস দেন। অবশ্য বাওয়ালীদের কেউ কেউ আসে এখনও।

"ধপধপির এই দেবতাটির মূর্তিও বিচিত্র। প্রায় আট ফুট উঁচু বন্দুকধারী এক বীর শিকারীর মূর্তি। ডান পাটি মাটিতে মুড়ে বাঁ পাটি সামনে এগিয়ে রেখে তিনি বসে আছেন। গায়ের রং সাদা। দীর্ঘ আয়ত চোখে মস্ত বড়ো গোঁফে মুখখানায় আত্মপ্রত্যয়ী বীর শিকারীর ভাব পরিস্ফুট। তাঁর বেশভূষাও রীতিমত শিকারীর মত। তবে আধুনিক শিকারী আর পৌরাণিক বীরের সাজসজ্জার সমন্বয়। হলদে রঙের আঁটসাঁট ব্রিচেসের ওপরে হলদে রঙের বেনিয়ান পরা। তার ওপরে হাফহাতা গলাবন্ধ কালো পিরান। পিরানের গায়ে সোনালী ফুলের বিচিত্র চিত্রণ। পায়ে নীলরঙের মোজা আর কালো রঙের ফিতে বাঁধা হান্টিং বুট। দু'হাতে বন্দুক ধরা। বীরের মাথায় পাগড়ি, কল্কা, কানে কুণ্ডল বীর বৌলি, হাতে বালা, আঙ্গুলে আংটি, গলায় সোনার হার, কপালে সিঁদুরের মস্ত বড় ফোঁটা। মূর্তির দুপাশে তীর ধনুক, তুণীর, ঢাল, তরোয়াল, কুড়ুল, বল্লম, ত্রিশূল, সড়কি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রর সজ্জা। মন্দিরের ভেতরে ভক্তদের দেওয়া অশ্বারোহী, বন্ধুকধারী আরও অনেক ছোট বড় 'ছলন-মূর্তি'র মাঝখানে এই বিশাল বিচিত্র বীর মূর্তি দেখলে মানুষতো কোন্ ছার, বাঘেদেরও বোধ হয় হৃৎকম্প হবার জোগাড়।" (পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা। তৃতীয়খণ্ড। পৃঃ ১৬২)।

বাবা দক্ষিণেশ্বরের সমতল ছাদের মন্দিরটি তৈরি হয় ১৯০৯ সালে। অবশ্য পূজা হত এখানে বহু আগেই। মন্দিরের সামনের দিক অনেকটা দুর্গা দালানের মত। মন্দিরে প্রবেশপথে ওপর দিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নানান মূর্তি আছে। গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশ পথ। দক্ষিণেশ্বরের এই মূর্তিটি অনেক পরে তৈরি। মূলে কোন মূর্তি ছিল না। একটি পাথরের টুকরোকে বাওয়ালিরা পূজা দিত। সেই পাথরের টুকরোটি আছে বর্তমান মূর্তির সামনে এবং এখনও পূজা হয়। লৌকিক দেবতা দক্ষিণেশ্বরের পূজা করেন ব্রাহ্মণরা। আদিতে কোন মন্ত্র ছিল না। মন্ত্র তৈরি করেছেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। এই দেবতা সম্পর্কে প্রচারিত কিম্বদন্তী তাদেরই সৃষ্টি। শিব বা গণেশ দু-রূপেই তিনি কল্পিত। শোনা যায়, শনির কোপে গণেশের মুণ্ডু উড়ে গেলে, সেই কাটা মুণ্ডু এসে বাবা দক্ষিণেশ্বরের মাথায় জেগেছে।

ধপধাপির গ্রামে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ছাড়াও আছে দুটি পঞ্চানন্দ, দুটি শীতলা ও দুটি বিবিমার থান। আছে বারাতলা। পুজা হয় শনি মঙ্গলবারে। পুজায় লাগে শোল মাছ, কাঁকড়া ও মদ। দক্ষিণেশ্বরের পুজাতেও প্রয়োজন হয় এই তিনটি উপচারের। ধপধাপির কাছে দুটি প্রাচীন পুকুরকে বলা হত 'কালীদহ' ও 'শিঙ্গাদহ'।

ভাঙড়

ভাঙড় থানায় পীরের মাহাত্ম্য সর্বাধিক। শাঁকশহর গ্রামের বাবনপীর, মরিচাগ্রামের পীর ইসমাইল শা, ভাঙড়ের পীর ভাঙড় সুলতান সাহেব এবং বামুনিয়া গ্রামের গোরাচাঁদ পীর হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পুজা পেয়ে থাকেন। শতাধিক বছরের পুরানো মেলা হয় এই উপলক্ষে।

ভাঙর গ্রামে পীর সুলতান সাহেবের মাজার, একটি কালী মন্দির ও একটি শিবমন্দির আছে। কালী মন্দিরটি বেশ পুরানো। মন্দিরটি ভাঙড় বাজারের কাছে অবস্থিত। কার্তিকমাসের অমাবস্যায় বাৎসরিক পুজা হয়।

প্রতি বছর ১৬ চৈত্র পীর ভাঙড় সুলতান সাহেবের তিরোভাব উৎসব বা উরস্ মোবারক উপলক্ষে একটি মেলা হয়। তাছাড়া ঐদিন গ্রামের মানুষ শোভাযাত্রা করে পীরের মাজারে হাজত দিতে আসে। মেলায় বসে দোকানপাট। সার্কাস, ম্যাজিক ও নানা বিনোদনের ব্যবস্থা হয়।

মরিচা গ্রামে আছে পীর ইসমাইল শার সমাধি। প্রতিবছর ২০ ফাল্গুন এখানে পীরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে সাতদিন ধরে মেলা বসে। মেলাটি 'কালাচাঁদ মেলা' নামে পরিচিত। বামুনিয়া গ্রামে পীর গোরাচাঁদের উরস উৎসব হয় ১২ ফাল্গুন। পীরের থান আছে। বহু ধার্মিক ব্যক্তি উরস উৎসবে যোগ দেন। উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য— এখানে রান্না করা ভাত ও মাংস মানত দেওয়া হয়। আর এই সব খাদ্যবস্তু বিতরণ করা হয় গরিব মানুষদের মধ্যে।

বিদ্যাধরী থেকে প্রচুর শঙ্খ ও শামুক সংগ্রহ করত গ্রামবাসী এবং এইসব দ্রব্যের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে ওঠায় একটি গ্রামের নাম হয় শাঁকশহর। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দুসম্প্রদায়ের সহাবস্থান লক্ষণীয়। পারস্পরিক ধর্মাচার নিয়ে কোন বিরোধ নেই। বাবনপীরের উৎসব উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তিতে যে মেলা বসে সেটি স্থায়ী হয় ১০।১২ দিন। মেলা শতবর্ষের পুরানো। পীরের সমাধি ও মসজিদ আছে। গ্রামে একটি পঞ্চানন্দের থান আছে।

সানপুকুরিয়া গ্রামটি সম্পর্কেও একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। জঙ্গল পরিষ্কার

করে গ্রাম গড়ে ওঠে। একটি পুকুর কাটার সময় মাটির নিচে পাওয়া যায় সানবাঁধানো ঘাট। পুকুর খননকারী স্বপ্নাদেশ পান, পুকুরটি যেন খনন না করা হয়। পুকুর কাটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গ্রামবাসী সেই ঘাটে পুজা দিতে থাকে। আকস্মিকভাবে একদিন ঘাট অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই থেকে গ্রামটি পরিচিত হয় সান পুকুরিয়া নামে। মাঘীপূর্ণিমায় প্রতিবছর একটি বাঁধানো বেদিতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি বসিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মহোৎসব। মেলা বসে দুদিনের। অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনে মেতে ওঠে গ্রাম। এই গ্রামে পঞ্চানন্দ ও শ্মশানকালীর বাঁধানো বেদি আছে। তাছাড়া আছে মনসার থান। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয় শ্মশানকালীর পুজা।

জয়নগর-মজিলপুর ঃ

একদা বহু বর্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত পরিবারের বাস ছিল এখানে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ভিন্ন গ্রাম হলেও পরিচিত যুগ্মনামে। বহু দেবমন্দির, প্রাচীনগৃহ আছে। জয়নগরের মোয়া ও পয়রা গুড় বিখ্যাত। রেল লাইনের পূর্বদিকে মজিলপুর এবং পশ্চিমে জয়নগর। জয়নগর জনপদ তুলনামূলকভাবে প্রচীন। সতের শতকে রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ আছে জয়নগরের। তাছাড়া এখানকার পুকুর খুড়ে বিষ্ণুমূর্তি ও অন্যান্য যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এখানে মুসলমান পূববর্তী আমলে একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল। আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে মজে যাওয়া গর্ভের ওপর গড়ে ওঠে মজিলপুর গ্রাম। "খিদিরপুর থেকে জয়নগর-মজিলপুর পর্যন্ত আদিগঙ্গার দুপাশে গ্রামের নাম প্রাচীন পর্তুগীজ মানচিত্রে পাওয়া যায়। রেনেলের গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানচিত্রে দেখা যায়, বর্তমান মজিলপুরের পশ্চিমাংশের যে বিস্তৃত নিম্নভূমি ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়ে 'গঙ্গা বাদা' নামে পরিচিত, ঠিক তার উপর দিয়েই আদিগঙ্গার প্রবাহ বইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। এই আদিগঙ্গার মজাগর্ভে নতুন বসতি ও গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে বলেই হয়ত তার নামকরণ হয়েছে 'মজিলপুর'। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে প্রাচীন ভাগীরথীর বা আদিগঙ্গার তীরবর্তী অনেক জনপদের উল্লেখ আছে। কিন্তু মজিলপুরের উল্লেখ নেই। অথচ জয়নগরের উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর পরে কোনসময় বর্তমান মজিলপুর গ্রামের (উৎপত্তি না হলেও) খ্যাতি হয়েছে। (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২৫১)। জয়নগর-মজিলপুর বর্তমানে একটি পৌর শহর। থানা, ডাকঘর, স্কুল, কলেজ,

গ্রন্থাগার, হাটবাজার মিলিয়ে আধুনিক জনজীবনের ছাপ সর্বত্র। জয়নগরের মতিলাল, ঘোষ মিত্র এবং মজিলপুরের দত্ত, ভট্টাচার্য, পণ্ডা পরিবার হল প্রাচীন বংশ। অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক বিকাশে এই পরিবারগুলির দান অতুলনীয়। একসময় ছিল বহু টোল ও দেবমন্দির।

জয়নগর মজিলপুরে টাউন কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে। ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল গঠিত হয় পৌরসভা। পৌরসভার আয়তন ৫ ৮১ বর্গকিলোমিটার। ১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যা ২০,০০০। ওয়ার্ড সংখ্যা ১১। হোল্ডিং সংখ্যা ৪.৫০০; ইট বাঁধানো রাস্তা ২৫'১০ কিলোমিটার। পিচের রাস্তা ১৭ ৫০ কিলোমিটার, স্ট্রীট লাইট ৫৫৫। স্যানিটারি পায়খানা ৩৩০, গ্রামীণ পায়খানা ৩১০, কাঁচা ড্রেন ৭৯'৪ কিলোমিটার, পাকা ড্রেন ১৫ ৬ কিলোমিটার, ডিপ টিউবওয়েল ৮০, স্যালো টিউবওয়েল ৪০, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ১, দাতব্য চিকিৎসালয় ১, কমিউনিটি হল, মাধ্যমিক স্কুল ১, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ২, জুনিয়ার হাইস্কুল ৪, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮, গ্রামীণ লাইব্রেরী ১, টাউন লাইব্রেরী ১, সাধারণ পাঠাগার ১। এই নিয়ে বর্তমান পৌরসভা।

জয়নগরের চণ্ডীতলায় আছে দক্ষিণমুখী মন্দিরে দেবী জয় চণ্ডীর বিগ্রহ। দেবীর নাম থেকেই স্থানটির নামকরণ ঘটে জয়নগর। প্রায় তিনশ বছর আগে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতার বিখ্যাত মতিলাল পরিবারের গুণানন্দ মতিলাল। প্রচারিত কিম্বদন্তী হল গুণানন্দ এবং জনৈক টুনুপণ্ডিত নৌকাযোগে আদিগঙ্গা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন সুন্দরী রমণীকে একাকী বিচরণ করতে দেখেন। তীরে নেমে তারা ঐ মহিলাকে আর দেখতে পান নি। রাতে গুণানন্দ স্বপ্নাদেশ পান ঐ রমণী হলেন দেবী জয়চণ্ডী এবং তাঁর নিত্য সেবার আয়োজন করতে বলা হয়। মতিলাল একটি বকুল গাছের নিচে যে পাথর কুড়িয়ে পান সেটি হল দেবী জয়চণ্ডীর প্রতীকচিহ্ন। দেবীর দারুবিগ্রহ পরে তৈরি হয় এবং একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে পূজার ব্যবস্থা হয়। দেবীর বর্তমান সমতল ছাদবিশিষ্ট দক্ষিণমুখী মন্দিরটি তৈরি করেন কলকাতার মহেন্দ্র শ্রীমানি এবং সামনের নাটমন্দির ১৯৫০ সালে তৈরি করে দেন নিত্যহরি মতিলাল। একটি সিমেন্টের বেদীতে কাঠের মঞ্চের ওপর স্থাপিত দণ্ডায়মান দেবীর আড়াই ফুট উঁচু দারুমূর্তি অবস্থিত। বস্ত্রপরিহিতা দেবীর মাথায় শোলার মুকুট। গায়ের রঙ গৌর, তিনটি চোখ ও দুটি হাত। হাত দুটি অলঙ্কার শোভিত। হাতে অভয় ও বরাভয় মুদ্রা।

দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে প্রতিদিন দেবীপূজার ব্যবস্থা রয়েছে। দেবীর বার্ষিক

পূজানুষ্ঠান হয় জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে প্রতিপদ পর্যন্ত পনের দিন। প্রতিদিন দেবীর বেশ পরিবর্তন হয় এইভাবে—দুর্গা, অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী, জাহ্নবী, ইন্দ্রাণী, ভুবনেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, মহালক্ষ্মী, মনসা, রাইরাজা, বৈষ্ণবী, বাসন্তী ও রাজরাজেশ্বরী। রাজরাজেশ্বরী বেশ থাকে তিনদিন। এছাড়া শারদীয় অষ্টমী ও চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজার দিন পূজা হয় জাঁকজমকের সঙ্গে। মন্দিরে দেবীকক্ষের পাশে স্বতন্ত্র কক্ষে আছে দেবীর ভৈরব গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ। দেবী সম্পর্কে বহু কিম্বদন্তী প্রচারিত।

জয়নগরে জমিদারি পত্তন করেন রামগোপাল মিত্র। রামগোপাল ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরীদের কর্মচারী। জয়নগরের অযোধ্যারাম সেনের মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি। যৌতুক পান পলাবাটি, জয়নগর এলাকা। পরে নাম হয় মিত্র পাড়া। রামগোপালের ছেলেরা জয়নগর এসে বসতি শুরু করেন। আদিগঙ্গা সেসময়ে প্রবাহিত ছিল এখান দিয়ে। মিত্রদের কাটাপুকুর 'মিত্রগঙ্গা' দীঘিরূপে বর্তমান। এই মিত্রগঙ্গার ধারে মিত্রদের প্রতিষ্ঠিত একটি দোলমঞ্চ সহ দ্বাদশটি শিবমন্দির আছে। একটি মন্দির নষ্ট হয়ে গেছে। একটি পঞ্চরত্ন, অপরগুলি আটচালা মন্দির। এই দ্বাদশ মন্দিরের সঙ্গে দোল মঞ্চটি তৈরি করেন মধুসূদন মিত্র। একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপিতে উল্লেখ আছে, ১৭৬১ সালে কামদেব মিত্রের তৈরি। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৭২২ সালে নির্মিত। কৃষ্ণমোহন মিত্রের বাড়িতে আছে দুর্গা দালান।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের উত্তর দিকে একটি দোলমঞ্চ সহ আরও চারটি শিবমন্দির আছে। প্রথম আটচালা মন্দিরটি ১৭৬৪ সালে তৈরি করেন কামদেব মিত্র। দোলমঞ্চটি তৈরি করেন রামকানাই বসু। সবথেকে বড় শিবমন্দির ১৭৯৯ সালে রামচন্দ্র বসুর নির্মিত। বাকি তিনটি মন্দির নির্মাণ করেন অবিনাশ মিত্র। তিনি স্নান ঘাট ও তার ওপর দোতলা নহবতখানা বানিয়েছিলেন। অন্তর্জলিস্নানঘাট ছাড়া আরও কয়েকটি ঘাট এখানে তৈরি করা হয়। এখানকার শিবরাত্রি গাজন উৎসব এখনও সাড়ম্বরে পালিত হয়। একটি ট্রাস্টি বোর্ড মন্দিরের পূজানুষ্ঠান তদারক করে। মিত্রগঙ্গার ধারে আছে দক্ষিণেশ্বর। ক্ষেত্র পালের মন্দিরে আছে ভাঙা পাথর মূর্তি। দ্বাদশ শিবমন্দিরের গায়ে যেসব মিথুন মূর্তির অলঙ্করণ ছিল, বিরূপ সমালোচনা হওয়ায় সেগুলি চুন-বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দ্বাদশ শিবমন্দিরে রথের সময় আসে মিত্রদের ও তেলিপাড়ার রথ।

জয়নগরের রাধাবল্লভতলায় রাধাবল্লভের পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ আটচালা মন্দিরটির সংস্কার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কাছেই যে দোলমঞ্চটি আছে সেটিরও

সংস্কার হয়েছে। জনশ্রুতি, এই রাধাবল্লভ মন্দির কোন এক সময়ে ছিল খাড়িতে। খাড়িতে মন্দিরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনায় সরিয়ে আনা হয় রাধাবল্লভ তলায়। বসন্ত রায় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকের অভিমত মূর্তিটি প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত।

জনশ্রুতি, একবার খাড়ি অঞ্চলে জমিদারি তদারক করার সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘর থেকে রাধাবল্লভ বিগ্রহ উদ্ধার করে এনে জয়নগরে প্রতিষ্ঠা করেন মধুসূদন মিত্র। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের উপাধি সরখেল। এখনও তারাই দেবীর পূজারী।

বৃহৎ আটচালা রাধাবল্লভ মন্দির দক্ষিণমুখী। সামনে নাট মন্দির। বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ বারাসাতের বসু পরিবার। সুবৃহৎ দোতলা দোলমঞ্চ তৈরি করেন মধুসূদন মিত্র। নাটমন্দির কৃষ্ণমোহন মিত্র নির্মিত। মন্দিরে একটি কাঠের মঞ্চের ওপর রাধা ও কৃষ্ণের দারুমূর্তি অবস্থিত। দুটি মূর্তিই সুন্দর। এইমঞ্চে আছে ছোট কৃষ্ণমূর্তি, শিবলিঙ্গ, জগন্নাথদেবের মূর্তি। একটি পৃথক বেদিতে শীতলা মূর্তি অবস্থিত।

রাধাবল্লভ মন্দিরের ১ বৈশাখের গোষ্ঠ যাত্রা উৎসব বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দোলমঞ্চটি সাজান হয় সুন্দরভাবে। সন্ধ্যার সময় বাসুদেব বিগ্রহ সহ রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ স্থাপন করা হয় দোলমঞ্চে। জয়নগর মজিলপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গৃহস্থবাড়ির বিগ্রহ শোভাযাত্রাসহ আনা হয় এই মঞ্চে। বিশেষ কয়েকটি হল ঃ জয়নগরের ঘোষদের গোপাল, দুর্গাপুর গ্রামের সরখেল পরিবারের শ্যামসুন্দর, মুলদিয়া ভবানীপুরের পালুইদের রাধাকান্ত বিগ্রহ ও ঘোষদের রাধাগোবিন্দ, কেটোয়ারা বনমালীপুরের মদনমোহন বিগ্রহ, জয়নগর উত্তরপাড়ার মিত্রদের রাধাকৃষ্ণ, সরকারদের বাসুদেব, জয়নগরের মিত্র পরিবারের গোপীনাথ, মজিলপুরের দত্তদের রাধাকৃষ্ণ, পেঁড়া পরিবারের শ্যামসুন্দর। এসব বিগ্রহের কিছু দারু-বিগ্রহ, কিছু প্রস্তর নির্মিত। কয়েকঘণ্টা পূজার্চনা ও আনন্দানুষ্ঠানের পর বিগ্রহ আবার শোভাযাত্রাসহ ফিরে যায় যথাস্থানে। একটি মেলা বসে এই উপলক্ষে। নয়দিন মেলা চলে।

গোষ্ঠ উৎসব ছাড়াও, ফাল্গুনমাসে পঞ্চমদোল, কার্তিকমাসে রাসযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, শ্রাবণ মাসে ঝুলন ও মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলের সময় মেলা বসে। বসন্তোৎসবের সময় বিগ্রহ মন্দির থেকে নিয়ে এসে রাখা হয় দোলমঞ্চে।

দ্বাদশ মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণরায়ের পূজা উপলক্ষে মেলা বসে ১ মাঘ। আষাঢ়মাসে রথের সময় জগন্নাথ বিগ্রহ রূপার রথে নিয়ে যাওয়া হয় মিত্রদের বাড়ি। নয়দিন পরে আবার ফিরে আসে বিগ্রহ। এই উপলক্ষে মেলা বসে দ্বাদশ মন্দিরের সামনে।

উত্তরপাড়ার ঘোষদের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের রাসযাত্রা উপলক্ষে তিন দিনের মেলা বসে। কৃষ্ণমোহন মিত্র এবং রামগোপাল মিত্রের বাড়িতে আছে দুটি দুর্গাদালান।

জয়নগরে আরো কয়েকটি মন্দির আছে। জয় চণ্ডী মন্দিরের কাছে রামহরি চট্টোপাধ্যায় একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করে গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। কাছেই আর একটি নবরত্ন মন্দিরে তিনি রামসীতার শ্বেত পাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন ঘোষের বাড়িতে আছে একটি আটচালা শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ। ঘোষদের কুলদেবতা গোপালকে ফাল্গুন মাসে দোলমঞ্চে স্থাপন করে উৎসব হয়। মতিলাল পাড়ায় একটি শিবমন্দিরে চৈত্র সংক্রান্তির গাজন অনুষ্ঠানে যোগ দেয় বহু ভক্ত। মন্দিরের অবস্থান একটি পুকুরের ধারে। এই পুকুরের এক দিকে আছে পঞ্চনন্দের বিগ্রহ, একটি ছাউনি দেওয়া মন্দিরে। নিত্য পূজা হয়।

রক্তাখাঁ পাড়ার বৃষোপরি পঞ্চানন ঠাকুর শিবরূপে কল্পিত হয়েছেন। এখানে বেশ কিছু প্রাচীন পঞ্চানন বিগ্রহ এবং বিবিমার থানও আছে। রক্তাখাঁ শব্দটি সম্ভবত বড়খাঁ গাজী থেকে সৃষ্টি। এখানে আছে শেখের পুকুর ও খোদার পুকুর।

আনন্দ মোহন ঘোষের বাড়ির কাছে ঘোষ গঙ্গার ধারে বিবিমার থানে শনি মঙ্গলবারে বহু ভক্ত আসেন। পৌষ মাসে হয় মাঙ্গন পূজা। বিবিমার শলন মূর্তিও রয়েছে।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যর মুন্সী ছিলেন চন্দ্রকেতু দত্ত। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন মহারাজা। মুন্সী চন্দ্রকেতুর সঙ্গে সুন্দরবনের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে আসেন ভট্টাচার্য ও পোড়াবংশের পূর্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা রঘুনন্দন পোড়া। "এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদশার সময় যখন রাজা মানসিংহ যশোহর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক, সপরিবারে যশোর বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া ঐ চড়ার উপরিস্থিত গ্রামে সুন্দরবনের ভিতর আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত ও কুলগুরু শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহারই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্বপুরুষ। (শিবনাথ শাস্ত্রী— আত্মচরিত পৃঃ ১২)।

ক্রমে ক্রমে মজিলপুরে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ এসে বসতি স্থাপন করে। স্থানটির গুরুত্ব বেড়ে যায় কলকাতার কাছে থাকার কারণে। দত্ত বংশের এক উত্তর পুরুষ রামচন্দ্র দত্ত সুন্দরবনে জমিদারি স্থাপন করেন। মজিলপুরে গড়ে ওঠে টোল ও

চতুষ্পাঠী। এইসব টোল ও চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহ হত স্থানীয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের দানে। তাছাড়া বেশ কিছু পরিমাণ জমিও তারা দান করেছিলেন। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। নারী শিক্ষার বিকাশ হয়। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে উল্লেখ আছে ঃ

'হার্ডিঞ্জ বাংলা স্কুল স্থাপনের পরেই আমাদের গ্রামে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হরিদাস দত্ত নামে জমিদারবাবুদের বাড়ির একজন যুবক তখন দেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ইনি অল্পদিন পরলোকগত হইয়াছেন। অনুমান করি, প্রধানত ইঁহার ও ইঁহার বয়স্যাদিগের যত্নে ও জমিদার বাবুদের সাহায্যে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আমার মনে আছে যে সেই স্কুলে একজন ইংরাজ হেডমাস্টার লওয়া হইয়াছিল। সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসিত, সে সাহেবের টেবিলের তলায় শুইয়া থাকিত। আমরা তাহাকে দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদার বাবুদের এক বাগান-বাড়িতে থাকিতেন। আমরা তাঁহার পালিত মুরগী ও অন্যান্য পাখি দেখিবার জন্য গিয়া সেই বাগানে উঁকিঝুঁকি মারিতাম। রাস্তায় দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান করিতাম। ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নূতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে; হরিদাস দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের উৎসাহে 'মজিলপুর পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুদিন চলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ব্রজনাথ দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যবয়স্কা বিষয়ী লোক ছিলেন। জ্ঞান চর্চাতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষদিগকে লইয়া সর্বদা জ্ঞানালোচনা করিতে ভালোবাসিতেন। শুনিয়াছি, তিনি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনিই গ্রামে ব্রাহ্মধর্মকে প্রবিষ্ট করেন এবং আমার ভক্তিভাজন স্বগ্রামবাসী গুরুস্থানীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী করেন। এই শিবকৃষ্ণ দত্ত ইহার কিছুদিন পরে 'লুক্রিসিয়ার উপাখ্যান' বাংলাপদ্যে অনুবাদ করেন, এবং বাংলাকাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন।···আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে মজিলপুর শিক্ষাদি বিষয়ে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ প্রদেশে একটি অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। (শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মচরিত পৃঃ ২৬-২৭)।

মজিলপুরের 'ধন্বন্তরী' কালী বিখ্যাত। স্থানটি পদ্মপুকুর নামে খ্যাত। আগে

এখানে ছিল শ্মশান। এই গ্রামের রাজেন্দ্র চক্রবর্তী পরিব্রাজকরূপে ভারত ভ্রমণকালে তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে ভৈরবানন্দ মজিলপুর এসে আদি গঙ্গার ধারে কালীপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সতের শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই পীঠ। চক্রবর্তীরা দেবীপূজার ভার পান। দেবীর মন্দির সমতল ছাদ বিশিষ্ট ও দক্ষিণমুখী। একটি কারুকার্য খচিত কাঠের মঞ্চে শায়িত শিবের বক্ষোপরি বস্ত্রপরিহিতা অলঙ্কার শোভিতা দেবী কালিকার বিগ্রহ অবস্থিত। একটি ঘরের মধ্যে আছে দুটি শিবলিঙ্গ। আর একটি বিগ্রহ সহ শিবমন্দির আছে এখানে। তাছাড়া নাটমন্দিরের সামনে আছে পঞ্চানন্দ মূর্তি ও বাবাঠাকুরের শালন মূর্তি। দেবীর বার্ষিক পূজা হয় বৈশাখ মাসে। সে সময়ে জয়নগরের জয়চণ্ডীর মত ধন্বন্তরী কালীর বেশ পরিবর্তন হয় পনের দিন ধরে। মেলাও চলে পনের দিন। পদ্মপুকুরে বিভিন্ন পূজার বিগ্রহ বিসর্জন উপলক্ষে মেলা বসে ও উৎসব হয়।

মজিলপুরের সম্বিতেশ্বর শিব মন্দির, দুর্গাপুরের শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির, কাটোয়ারা বনমালীপুরে মদনমোহন জীউ মন্দির আছে। রাস, দোল, গাজন উপলক্ষে নানা উৎসব হয়। বসন্তরায়, পঞ্চানন, শীতলা, বাবাঠাকুর, জ্বরাসুর এসব লৌকিকদেবদেবীর পূজাও এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিতপাড়া ও কয়েল পাড়ায় আছে পঞ্চানন ঠাকুর। কয়েলপাড়ায় পঞ্চানন ঠাকুরের সঙ্গে আছে শীতলা ও দক্ষিণ রায়। পণ্ডিতপাড়ায় একটি ইটের ঘরে আছেন পঞ্চানন। সঙ্গে শীতলা। তাছাড়া বাবাঠাকুর, জ্বরাসুর ও বসন্তরায় বিগ্রহ আছে।

জয়নগরের দুর্গাপুর গ্রামে আছে শ্যামসুন্দরের আটচালামন্দির। দেরবাড়িয়া গ্রামে একটি অলঙ্কৃত রাজরাজেশ্বর মন্দির জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়ে আছে। মন্দির ১৮০৫ সালে তৈরি করেন রাজচন্দ্র দেব। মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ছাড়া কোন বিগ্রহ নেই। পাশের দীঘিতে পড়ে আছে একটি ভগ্ন মন্দিরের চূড়া।

জয়নগর থানার ঢোষা গ্রামে ২৮ চৈত্র থেকে ১লা বৈশাখ—এই চারদিন শিবপূজা, গাজন ও দোল উৎসব হয়। পূজা হয় স্থানীয় পঞ্চানন্দ তলায়ও। এই পঞ্চানন্দ তলায় একটি মাটির ঘরে পঞ্চানন্দ, শীতলা মনসা, বনবিবি, বসন্ত রায়ের বিগ্রহ আছে।

বহড়ু

আদি গঙ্গার তীরে বহড়ু ও ময়দা দুটি সমৃদ্ধ জনবসতি ছিল। বহড়ু স্টেশনের পশ্চিমে বহড়ু ও পূর্বদিকে ময়দা গ্রাম। বহড়ুর মধ্য দিয়ে কুলপী রোড জয়নগর মজিলপুর হয়ে চলে গেছে কলকাতার দিকে।

সতের শতকে কৃষ্ণরামদাস রায় মঙ্গলকাব্যে লিখেছিলেন—

"সঘনে দামামা ধ্বনি শুনি রায় গুণমণি
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসাতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে ।।"

এই বড়ু ক্ষেত্রই হল বর্তমান বহড়ু। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ান নন্দকুমার বসুর স্মৃতি। কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির দেওয়ানী থেকে কলকাতায় কাস্টমস হাউসে দেওয়ানী করেন। এর পূর্বপুরুষরা প্রথম এসে বসতি করেন মল্লিকপুরের কাছে মাহীনগরে। তারপর আসেন ময়দা গ্রামে। সেখান থেকে বহড়ুতে। নন্দকুমারই বহড়ুর জমিদারি পত্তন করেন। তিনি সুবিশাল বসতবাড়ি তৈরি করান। জীর্ণ প্রায় সেই বাড়িতে তাঁর উত্তরপুরুষরা এখনও বাস করছেন। বাড়ির ভিতরে যে বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটি ছিল, সেটি নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হত। এখন হয় না। এই পরিবারের রায়বাহাদুর বৈকুন্ঠনাথ বসু ছিলেন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ। কয়েকখানি প্রহসনও লিখেছিলেন তিনি।

বহড়ুর বিখ্যাত শ্যামসুন্দর জীউ মন্দিরটি ১৮২১ থেকে ১৫ সালের মধ্যে তৈরি করেন নন্দকুমার বসু। মন্দির নির্মাণে খরচ হয়েছিল তিন লক্ষ টাকা। নন্দকুমার গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যাওয়ার আগে তার জমিদারির কিছু অংশ দেবোত্তর করে যান। বহড়ুর দক্ষিণমুখী শ্যামসুন্দরজীউ মন্দিরটি নানাকারণে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। ফ্রেসকো সজ্জিত মন্দির -নির্মাণে পাথর আনা হয় জয়পুর থেকে। মন্দিরের ভিতরে পাশাপাশি তিনটি ঘর। মাঝখানের ঘরে কারুকার্যময় কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা মূর্তি অবস্থিত। অপর দুটি ঘরের একটি হল শ্যামসুন্দরজীর শয়নকক্ষ; অপরটি ভোগ ঘর। মন্দিরের কাঠের দরজা ও দরদালান কারুকার্যময়। ফ্রেসকোগুলির অঙ্কন শিল্পী ছিলেন দুর্গারাম ভাস্কর। মন্দিরের ছবি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এরা ছিলেন বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। "প্রবেশপথের শীর্ষে অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয়বস্তু রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলা ইত্যাদি। মোট পাঁচটি প্রাচীর এখানে আছে। সর্ববামে বৃষারূঢ় হরপার্বতী, দুইপাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী। দ্বিতীয়টিতে বনবাসান্তে অযোধ্যায় রাজত্বকারী রামের সভাদৃশ্য। তৃতীয়টি বেশ অভিনব, উপবিষ্ট গণেশকে দু ব্যক্তি বন্দনা করছেন, এদের একজন নাকি নন্দকুমারের পুত্র রামধন বসু। চতুর্থ প্রাচীর চিত্রটি চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত। কেন্দ্রস্থলে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ,

অদ্বৈত, যবন হরিদাস ইত্যাদিকে নিয়ে নৃত্য করছেন। পঞ্চতম চিত্রটিই বেশী সুন্দর মনে হয়। বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপ। অযত্নে অবহেলায় মলিন, তবুও এই প্রাচীর চিত্রটির সজীবতা লক্ষণীয়। অলিন্দের পশ্চিমগাত্রে ৪ ফিট ৪½ ইঞ্চি পরিধির এক বৃহৎ রাসমণ্ডল। রাসমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুঞ্জ এবং সচ্ছ সলিলা যমুনা রাসমণ্ডলের কেন্দ্রে দুই সখীসহ বংশীবাদক কৃষ্ণ। কেন্দ্রের বাইরে অষ্টসখী নৃত্যরত কৃষ্ণ। অলিন্দের পূর্ব গাত্রেও ধর্মীয় আখ্যান চিত্রিত হয়েছে। বিষ্ণুর অবতার বিষয়ক চিত্র যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, কল্কি ইত্যাদি এই অংশ আছে। বলরাম সুভদ্রা জগন্নাথ এবং বিষ্ণু লীলার কয়েকটি দৃশ্যও দেখা যায়। কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বিশেষত বাল্যলীলার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু বিষয় বস্তুর অভিনবত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হোল চৈতন্যলীলার একটি দৃশ্য। চিত্রটিতে চৈতন্যদেবের ষড়ভুজমূর্তি, চৈতন্যদেবের উভয়পার্শ্বে রাজা প্রতাপ রুদ্র এবং তদীয় সভাপণ্ডিত সার্বভৌম।...একেবারে নীচে, সর্বদক্ষিণে যে চিত্রটি আছে তা নিশ্চয় এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্র এবং বিষয়বস্তু হিসাবে এর নির্বাচনে শিল্পীর কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। চিত্রটি এইরূপ ঃ প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্টা অন্যমনস্কা রাধা। উদ্যানসংলগ্ন প্রাসাদের এক কোণ থেকে কৃষ্ণ গোপনে রাধাকে দেখছেন। কিন্তু তাঁর এই আগমন একজন জানতে পেরে গেছেন; তিনি বিশাখা। বিশাখা রাধাকে সতর্ক করতে চান, জানাতে চান কৃষ্ণের উপস্থিতি— অবশ্য এমনভাবে যে কৃষ্ণ বুঝতে না পারেন। বিশাখা তাই রাধার নিকটে মুকুর ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন। মুকুরে কৃষ্ণকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। "(চব্বিশ পরগণার মন্দির—অসীম মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৯৫-৯৬)

অনাদরে বেশির ভাগ চিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামসুন্দরজীউ মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। তাছাড়া ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে রাসযাত্রার উৎসবটিই সব থেকে বড়। তিনদিন যাবত বিশেষ পূজানুষ্ঠান চলে। একটি মেলাও বসে মন্দিরে সরস্বতী এবং গঙ্গাপূজাও হয়।

বহড়ুর অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বহড়ুবাজারের কাছে পাঁচটি ছোট শিবমন্দির। বসুপরিবারের জনৈক বধূ এই মন্দির নির্মাণ করেন ১২৬৩ বঙ্গাব্দে। মন্দিরের খরচ চলে দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে। প্রতিদিন পূজা হয়। তাছাড়া চড়ক ও গাজনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জনৈক চক্রবর্তীর বাড়িতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

নিত্যপূজা হয়। স্নানযাত্রার কিছু খরচ এখনও বসুপরিবার বহন করেন। কারণ এই বিগ্রহ তারাই প্রতিষ্ঠা করেন।

বহড়ুর বাবাঠাকুরের বিগ্রহ আছে একটি চালাঘরে। ইনি হলেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজ মূর্তি সাধারণত কূর্ম রূপে কল্পিত। কিন্তু এখানে আছে তার উপবিষ্ট বিগ্রহ। মাথায় জটা ও সাপের ফণা। গায়ের রঙ সবুজ। পরনে বাঘের ছাল। হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কানে ধুতরার ফুল। বিশাল মূর্তির চোখ তিনটি গোলাকার। বড় পাকানো গোফ। ডান হাত অভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে তোলা। ডান পা মুড়ে রাখা বাম পায়ের ওপর। মূর্তির পাশে আছে শিবলিঙ্গ। ধর্মরাজের এই ধরনের মূর্তি আছে সোনারপুর ও রাজপুর গ্রামে। বেশ বোঝা যায়, রাঢ় অঞ্চলের লোকদেবতা ধর্মঠাকুর শিবরূপ পরিগ্রহ করেছেন। নিম্ন সমাজের ওপর শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাবের কারণেই, ধর্মরাজ মহাদেবের বিগ্রহের মধ্য লীন হয়েছেন এখানে।

এই বাবাঠাকুরের আকৃতিসদৃশ পঞ্চানন্দের বিশাল বিগ্রহ আছে বাড়ুজ্যে পাড়ায়। পঞ্চানন্দের দুইপাশে ভূতপ্রেত এবং পায়ের কাছে জ্বরাসুরের মূর্তি রয়েছে। এখানে দক্ষিণ রায়েরও পূজা হয়।

ধর্মরাজার আর একটি বিগ্রহ আছে দক্ষিণ পাড়ায়।

ময়দা

ময়দার লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। এখানকার মূর্তিও বহড়ুর মত। তবে আকারে কিছুটা ছোট। এইগ্রামে আরো আছেন বিবিমা, শীতলা ও মনসা। আদিগঙ্গা তীরে ময়দার বিখ্যাত কালীমন্দির। মন্দিরে একটি শিলাকে দক্ষিণা কালিকার প্রতীকস্বরূপ পূজা করা হয়। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী আটচালা। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, পূর্ব দিকে রান্নাঘর এবং পশ্চিম দিকে 'কালীকুণ্ড'। কালীকুণ্ড সম্ভবত আদিগঙ্গার অংশ ছিল একসময়।

কিম্বদন্তী, আদিগঙ্গা ধারে এই কালীমন্দিরটি ১১৭৬ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের গঙ্গাধর চৌধুরী। মন্দিরে দেবীর নিত্যসেবার জন্য তাঁরা দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। ১ বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব, জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা, আষাঢ়মাসে অম্বুবাচী, ভাদ্র মাসে তালনবমী, ১ মাঘের উৎসব, শারদীয়া নবমী, কার্তিক অমাবস্যায় মন্দিরে পূজা ও উৎসব হয়। ১ মাঘ উৎসবে একটি মেলা বসে। একটি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে জাহাজের অংশ পাওয়া যায়। সেই কাঠ থেকে তৈরি হয় মন্দিরের দরজা। এই জনশ্রুতি গ্রামে প্রচলিত।

শিবনাথশাস্ত্রী আত্মচরিতে মজিলপুর প্রসঙ্গে লিখেছেন : "কলিকাতা শহরের প্রায়

ত্রিশ মাইল দক্ষিণে পূর্বকোণে সুন্দরবনের উত্তরপ্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। ইহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরই অধিক বাস। ভদ্রলোকদিগের বাসস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্শ্বে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি প্রভৃতির বাস আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় অধিক নয়। গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের কার্য নির্বাহের উপযুক্ত। গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না, অনুমান করি এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোর্তুগিজরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কিনা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদের যাত্রা বিবরণে 'ময়দা' নামক একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়, এই মজিলপুরের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে 'ময়দা' নামে এক গ্রাম এখনো বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পোর্তুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্নজাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেকদ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত"। (আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ১১)।

গ্রামটি বেশি পুরানো নয়। ষোল শতের শতক থেকে লোকবসতি শুরু। প্রথম আসে সাবর্ণ চৌধুরী, যশোর রাজের কর্মচারী এবং তারও বেশ কিছু পরে কোম্পানির কর্মচারীরা। ততদিনে গঙ্গা গর্ভে পলি জমতে শুরু করেছে। একদিন নদীপথ গেল বদলে। সুতরাং গঙ্গার সেই মজা গর্ভ থেকে ভাঙা জাহাজের অংশ পাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

দক্ষিণ বারাসাত

গ্রামটি মুসলমান আমলের আগেও জনবসতিপূর্ণ ছিল। এখন একটি শহর। একটি রেলস্টেশন থাকলেও, কুলপী রোড দিয়ে বাসে যাতায়াত করা যায়। স্কুল, কলেজ, থানা, ডাকঘর, বাজার হাট সবই আছে। গ্রামের চৌধুরী ও বসুপরিবার বহু প্রাচীন বাসিন্দা।

দক্ষিণ বারাসাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বামী অচলানন্দের নাম। এখানে তাঁর সমাধি মন্দির আছে। সমাধি মন্দিরের স্থানটি একসময় ছিল শ্মশান। এই শ্মশানে বসে তিনি সাধনা করতেন ছত্রভোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের অরণ্যময় স্থানে বসে সাধনায় দেবীকে জাগ্রত করেন এবং দেবী মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। অচলানন্দ দেহরক্ষা করেন কালীঘাটে। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে এখানে এনে সমাধি দেওয়া হয়। আগে সমাধি মন্দিরে পূজার্চনা হত, মেলা বসত। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে।

দক্ষিণ বারাসাত রেলস্টেশন থেকে যাওয়া যায় গোবিন্দপুর গ্রাম। গ্রামের জমিদার মিত্রদের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের নাম থেকে গ্রামটির নামকরণ। একটি মসজিদ আছে। আর রয়েছে পঞ্চানন, বিবিনিব, স্তসব রায় ও রাসনম নাথ। দোল ও চড়ক উৎসব হয়। আর ১ বৈশাখ হয় গোষ্ঠ উৎসব। একটি মেলা বসে দুদিনের জন্যে।

দক্ষিণ বারাসাতের আদ্যমহেশ শিব মন্দির ও বিনোদিনী কালীমন্দির বিখ্যাত। শিবমন্দির পূর্বমুখী। আটচালা। বাজারের কাজে আছে বিনোদিনী কালীমন্দির। দক্ষিণমুখী মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডির ওপর একটি পাথরের স্তম্ভে সোনার চোখ, রুপার ভ্রূ, জিহ্বা ও নাসিকা আছে। ইনিই বিনোদিনী কালী। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, নারায়ণ শিলা ও শনিঠাকুরের মৃন্ময় মূর্তি রয়েছে। কিম্বদন্তী জনৈক দয়াল চৌধুরী স্বপ্নাদেশ দিয়ে মন্দিরের কাছে 'কালী কুণ্ড' থেকে ঐ প্রস্তর খণ্ড উদ্ধার ও স্থাপন করেন। খড়ের ছাউনির ঘরে দেবী ছিলেন। বর্তমান মন্দির নির্মাণ করান জয়নগরের বনমালী দাস। বিভিন্ন তিথিতে পূজানুষ্ঠানে বহুভক্তের আগমন ঘটে। নিত্যপূজা হয়।

সতের শতকে কৃষ্ণরামের কাব্যে বারাসাতের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তখন স্থানটির দৈবমহিমা প্রচারিত হয়েছে। যে কারণে আদিগঙ্গা দিয়ে যাতায়াতকারী সওদাগররা তাদের বাণিজ্যতরী থামিয়ে পূজা দিতেন। গ্রামটিতে বসতি ছিল তার আগেই। তবে বর্তমান মন্দিরটি দেড়শ বছরের বেশি পুরানো নয়।

তিনটি আটচালা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বসুপরিবার তাদের বসতবাড়ির সামনে। তিনটি মন্দিরের দুটি তৈরি হয়েছিল ১২০৭ ও ১২১৫ বঙ্গাব্দে। দুটি মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ আছে। মন্দির পাশের দোল মঞ্চে দোলের সময় রাধাকান্তজীউ বিগ্রহস্থাপন ও উৎসব হয়। এই বিগ্রহ আছে বসুবাড়ির ভিতরে কৃষ্ণ মণ্ডপে। তাদের বাড়িতে দুর্গা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা হয় এখনও।

বিনোদিনী কালীমন্দিরের পশ্চিম দিকে মাটির মঞ্চ বানিয়ে ফাল্গুন মাসে 'সাতসতীনের দোল' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাতটি গৃহস্থবাড়িতে পূজিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আনা হয় এই মঞ্চে। একটি মেলা বসে।

বাজারের কাছে বিবিমার পূজাস্থানে মাটির ঢিপি ও শালন মূর্তি আছে। জগন্নাথদেবের মন্দির, শিবদাস আচার্য বিদ্যালয়ের কাছে ধর্মরাজের মৃন্ময় মূর্তি মাসটিকারী গ্রামের পঞ্চাননের থান ও শীতলামন্দির, বেলিয়াডাঙায় দক্ষিণরায় বা বাবাঠাকুরের শলনমূর্তি ও পঞ্চাননের মৃন্ময় মূর্তি, রামকৃষ্ণ সারদামন্দির রয়েছে। দাসপাড়ার শতর্ষা গাজীর সমাধি আছে জঙ্গলের মধ্যে। ১ মাঘ উৎসব ছাড়াও শনি মঙ্গলবারে অনেকে পূজা দেন। বাঁশটিকরী ও পথেরহাট গ্রামে আছে দুটি মসজিদ।

মাঝেরহাট

এখানে ছিল আলিপুর অ্যারোড্রাম। খিদিরপুর ডক থেকে নামানো দ্রব্যাদি এখান দিয়ে রেলপথে যায়।

সুভাষগ্রাম / চাংড়িপোতা

পুরানো নাম চংড়িপোতা। দুজন মানুষের স্মৃতি নিয়ে স্থানটির গৌরব অম্লান রয়েছে। সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন এই গ্রামের মানুষ। তাঁর জন্মস্থান এখানে। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি বাঙলা দেশের বিদগ্ধ সমাজে সে সময়ের ছিল সমাদৃত। দ্বারকানাথের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার স্পষ্ট পরিচয় সোমপ্রকাশের প্রতিটি পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে। সম্পাদনায়ও ছিল স্বতন্ত্র শিক্ষিতরুচির পরিচয়। তিনি কয়েকখানি বইও লিখেছিলেন। দ্বারকানাথ মারা যান ১৮৮৬ সালে। তাঁর ভাগিনের শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম মামাবাড়িতেই। দ্বারকানাথ কলকাতা থেকে প্রেস উঠিয়ে নিজের গ্রামে নিয়ে যায়। শিক্ষাপ্রসারের জন্য নিজ গ্রামে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন।

কুলতলী

মথুরাপুর রোড স্টেশনে নেমে যেতে হয়। নলগোড়া ও সোনাটিক্রি গ্রামদুটি উল্লেখযোগ্য।

নলগোড়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে মাটি খুড়ে নারায়ণ শিলা, শিলালিপি ও অন্যান্য ধরনের দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। জঙ্গল পরিষ্কার করে ইটের ঘর ও প্রাচীন দীঘি পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান স্থানটি ছিল প্রতাপাদিত্য রাজ্যভুক্ত। গ্রামের শ্রীমৎ কপিলানন্দ স্বামীপ্রতিষ্ঠিত 'কপিল কুটীর সাংখ্যযোগাশ্রমে' আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসে ৭ বৈশাখ যজ্ঞোৎসব হয়। শিবমন্দির, কালী মন্দির, সত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ, ব্যাঘ্রবাহিনী নারায়ণী মূর্তি এবং পঞ্চানন্দ, আটেশ্বর, নারায়ণী, মনসা ও শীতলার থান আছে। চড়ক উৎসবটি সব থেকে জনপ্রিয়। রাস, শিবচতুর্দশী, অন্নপূর্ণাপুজা· গোষ্ঠউৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

লাট এলাকাভুক্ত সোনাটিক্রি গ্রাম কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। দোল উৎসব, গাজন, গঙ্গাপুজা, গোষ্ঠ উৎসব, দোল উৎসবে সারা বছর মেতে থাকে গ্রামটি। এখানে একটি গির্জা ও একটি শিবমন্দির আছে। গ্রামের শ্মশানঘাটে পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাপুজা ও মেলা হয়। আরও কয়েকটি মেলার মধ্যে আছে দোলের মেলা, গোষ্ঠ উৎসবের মেলা ও গাজনের মেলা।

বাসন্তী

ক্যানিং থেকে নৌকায় বা মোটর লঞ্চে যাওয়া যায়। বাসন্তী থানার ভরতগড় স্থানটি প্রাচীন। জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামটির সৃষ্টি। সে সময়ে গভীর জঙ্গলে দ্বাদশটি শিবমন্দির এবং একটি দীঘির পাড় আবিষ্কৃত হয়। কোন একসময় প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে স্থানটি পরিত্যক্ত হয়। গ্রামে একটি শীতলামন্দিরে ফাল্গুণ মাসের দোলপূর্ণিমায় বাৎসরিক পূজা ও মেলা বসে। ভরতগড়ের উত্তর দিকে মহেশপুর হাটখোলায় বনবিবির থানে ১ মাঘ দুদিনব্যাপী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমঝাড়া গ্রামে পঞ্চানন্দ, দক্ষিণেশ্বর, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসার পূজা প্রচলিত। কয়েকবছর আগে শুরু হয়েছে দুর্গাপূজা। ১ বৈশাখ নববর্ষের মেলাটি বেশ জনপ্রিয়।

ক্যানিং

মাতলা নদীর তীরে ক্যানিং অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। সুন্দরবন অঞ্চলের ধান, চাউল, গরান কাঠ, গোলপাতা, মাছ, মধু প্রভৃতি দ্রব্য এখান দিয়েই সরবরাহ হয়। ক্যানিং শহর রক্ষার জন্য নদীতীর বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। নদীর দৃশ্যও রমণীয়।

ক্যানিং আগে ছিল মাতলা গ্রাম নামে পরিচিত। উনিশ শতকে ভাগীরথীর বুকে পলি জমতে থাকায় কলকাতা বন্দর সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই সময়ে পোর্ট ক্যানিং-এর সৃষ্টি। ১৮৫৩ সালের ঘটনা। লর্ড ডালহৌসি তখন গভর্ণর জেনারেল। চেম্বার অফ কমার্স প্রস্তাব দেয়, কলকাতা বন্দর নষ্ট হলে, নিদারুণ সঙ্কট সৃষ্টি হবে। মাতলার তীরে একটি বন্দর তৈরি করে, কলকাতার সঙ্গে তার রেলপথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নদীপথেও যোগাযোগ থাকবে।

বন্দর তৈরির জন্য ৫৪ নম্বর লাটের আট হাজার জমি কিনে নেওয়া হয়। তখন ছিল বেশির ভাগই জঙ্গলময়। চাষের পরিমাণ একেবারে অনুল্লেখ্য। পাশের মাঠটি সরকার নিয়ে নিলেন। বন্দরের বাড়িঘর তৈরির জন্য সাড়ে ছয়শত একর জমি রাখা হল। প্ল্যান তৈরির পর কাজ শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। ক্যানিং শহরে ১৮৬২ সালে গঠিত হয় মিউনিসিপ্যালিটি। সব জমি সরকার শর্ত সাপেক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলে দেন। শর্ত ছিল প্রয়োজনে সরকার জমি ফেরত নেবেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা কাজে নেমে পড়লেন। কুড়ি লাখ টাকার পরিকল্পনা তৈরি হল। এ টাকা খরচ হবে শহর উন্নয়নে—রাস্তা, ড্রেন ও বাঁধ তৈরিতে। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ফার্ডিনান্ড স্কীলার খুবই উৎসাহী হয়ে

কুড়ি লাখ টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়লেন। বিক্রি হল মাত্র আড়াই লাখ টাকার। এই স্কীলার ছিলেন বরদেইলে স্কীলার কোম্পানির মালিক। তাঁর স্বার্থ ছিল প্রবল। তিনি পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, রিক্লামেশন অ্যান্ড ডক কোম্পানি গঠন করলেন। প্রস্তাব দিলেন কোম্পানিকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিলে তারা আড়াই লাখ টাকার শেয়ার কিনবে। সরকার সম্মত হয়ে কোম্পানিকে মতিলাল গ্রামের একশত একর জমি দান করলেন। তাছাড়া এই কোম্পানি ট্রাম রাস্তা, জেটি নির্মাণ ও টোল সংগ্রহ করতে পারবে পঞ্চাশ বছর।

ষাট লাখ টাকা সংগ্রহ হল ১৮৬৬ সালের মধ্যে। এর আগেই ১৮৬২-৬৩ সালে কলকাতা-ক্যানিং রেলপথ চালু হয়ে যায়। এবার বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হল। ক্যানিং বন্দরের জন্য মাতলার ওপর পাঁচটি এবং বিদ্যাধরীর ওপর দুটি জেটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ডক তৈরি হল। ট্রামের লাইন পাতার কাজ চলল এগিয়ে। ১৮৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ছাব্বিশখানি জাহাজ এল নতুন বন্দরে। আর কেউ এল না। ঝড়ের দাপটে দুখানি জাহাজ ফিরে গেল। তাছাড়া ভাগীরথীর জলরেখা পূর্বাবস্থায় থেকে যাওয়ায় কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল চলছিল স্বাভাবিক ভাবে।

সুতরাং গোলযোগ দেখা দিল। কোম্পানির সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধল মামলা। সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে সব রকম সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। ১৮৭০ সালে সরকার মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি ক্রোক করেন। ১৮৭১ সালে বন্ধ হয়ে গেল নির্মাণের কাজ। সুন্দরবনের জমিদারী নিয়ে ব্যবসা করতে গড়ে উঠল নতুন সংস্থা পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু ১৯৫৩ সালে নতুন আইনে জমিদারী আর থাকল না। বন্দর ক্যানিং-এর উত্থান ও পতনের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ক্যানিং কিন্তু বর্তমানে একটি আধুনিক শহরের রূপ নিয়েছে। স্কুল কলেজ, হাটবাজার, ডাকঘর, থানা, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল, সবই আছে এখানে। মিউনিসি-প্যালিটিও আছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়। বাসে যাওয়া যায় ক্যানিং বারুইপুর রোড দিয়ে।

ক্যানিং শহরে ব্রহ্মপূজার মেলাটি উল্লেখের দাবি রাখে। প্রায় আশি বছর আগে স্থানীয় বাজারের দোকানপাট পুড়ে যায়। তারপর ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ব্রহ্মপূজার উৎপত্তি। পূজা হয় সাতদিন। বাজারের কাছের জমিতে বারদিন ধরে মেলা চলে। বর্তমানে উৎসব ও মেলাটি জনপ্রিয়। সম্প্রতিকালের সুন্দরবন মেলাটিও যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহুমানুষ আসে এই সময়। একটি বনবিবির থান আছে।

ক্যানিং স্টেশন থেকে যাওয়া যায় বাঘিনী গ্রামে। এই গ্রামে কালী বিশালাক্ষ্মী, বড় শীতলা, শ্রীচৈতন্য, পঞ্চানন্দ এবং মনসার মন্দির ও থান আছে। চড়ক উৎসবে তিন দিনের মেলা বসে। উৎসব শুরু হয় সংক্রান্তির সাতদিন আগে থেকে। তালদি গ্রামেও কালী, পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা, বনবিবি, বাবা ঠাকুর আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যান্য গ্রামের মত। কালীপূজা ও গোষ্ঠ উৎসবের মেলায় আশপাশের গ্রাম থেকে আসে নানান পণ্য। ক্রেতারও অভাব থাকে না। তালদিতে একটি স্টেশন আছে। তালদি স্টেশন থেকে যেতে হয় ডেভিস আবাদ গ্রামে। ডেভিস নামে জনৈক ইংরেজ গ্রামটির পত্তন করায় তার নামে ডেভিস আবাদ। কালী, শীতলা, পঞ্চানন, শিব, বাবাঠাকুরের বেশ কিছু থান আছে। প্রাচীন দোলযাত্রার মেলাটি বেশ জনপ্রিয়। শিয়ালদহ থেকে ৩২ কিঃ মিঃ। ক্যানিং থেকে ১৪ কিঃ মিঃ।

চকমাণিক

আমতলার কাছেই গ্রাম চকমাণিক। বারুইপুর-আমতলা-বাঘরাহাট-রায়পুর স্থান দিয়ে প্রবাহিত ছিল গঙ্গার ধারা ; সৃষ্টি হয়েছিল বদ্বীপ আমতলা হাটের প্রায় সাত মাইল পশ্চিমে চকমাণিক অঞ্চলে। তখন কোন নাম ছিল না অঞ্চলটির। কোম্পানি আমলে বাওয়ালী মণ্ডলদের একজন মাণিক মণ্ডলের নৌকাঘাট ছিল এখানে। এই ঘাটে তার সাতশ নৌকা থাকত। খড়ের ব্যবসা ছিল তার। ব্যবসা পড়তি হলে, মাণিক মণ্ডল তার সব নৌকা কোম্পানিকে দান করেন। কৃতজ্ঞ কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নৌকাঘাটার চকটি দান করে মাণিক মণ্ডলকে। সেই থেকে অঞ্চলটি চকমাণিক নামে পরিচিত হয়।

জনশ্রুতি, আলিবর্দির সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় লতিফপুর গ্রাম থেকে এখানে এসেছিলেন সস্ত্রীক কড়ুই পণ্ডিত। নিজের গ্রামে ফেলে এসেছিলেন তাঁর আরাধ্য ধর্মঠাকুর। নতুন জঙ্গলময় জায়গায় আম-জাম-বট-নিম-অশোক গাছের ছায়ায় প্রথমে কোন আশ্রয় তাঁর জোটে নি। দূর গ্রামে গিয়ে খাবার জুটলেও আশ্রয় ছিল অশোক গাছে। গাছের ওপর মাচা বেঁধে থাকতে হয়েছিল তাঁকে।

কড়ুই পণ্ডিত স্বপ্নাদেশ পেলেন, একা থাকতে না পেরে ধর্মঠাকুর চলে এসেছেন। চরে পদ্মগাছের নিচে আছেন। তাকে প্রতিষ্ঠা করে যেন পূজার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন রাত শেষ না হতেই ছুটে গেলেন কড়ুই পণ্ডিত। বালি খুঁড়ে পেলেন চতুষ্কোণ শিলাসনে খোদাই করা দুটি ধর্মঠাকুরের মূর্তি, শালগ্রাম আর আদ্যাশক্তি ও গনেশের দুটি শিলাখণ্ড। তুলে নিয়ে এলেন তাদের। অশোকগাছের নিচে

কুড়ুই পণ্ডিত নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামে গিয়ে চাষ করেন, ...র্মঠাকুরের গান।

...লিবর্দি'র জনৈক কর্মী নৌকাযোগে ঐপথে যাওয়ার সময় তাঁর নৌকাডু... ...চারীটি সাঁতরে রাতের অন্ধকারে উঠলেন ঐ চরে। কড়ুই পণ্ডিতের কুটীরে প্রজ্বলিত আলোক শিখা দেখে সেখানে এগিয়ে গেলেন। সেখানে আশ্রয় মিলল তাঁর। আর পেলেন খাদ্য। কিন্তু খাওয়ার জল ছিল না সেখানে। ছিল মাত্র দেবতার চরণামৃত। কড়ুইপণ্ডিত সেকথা জানালেন। কর্মচারীটি জানতে চাইল, ঐ চরণামৃত পানে কি উপকার হতে পারে। কড়ুই পণ্ডিত জানালেন—প্রার্থিত বস্তু লাভ হবে। কর্মচারীটি বলল—মারাঠাদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ চলছে। নবাব জয়ী হলে পণ্ডিত পুরস্কৃত হবেন। আর পরাস্ত হলে, দেবতার বিসর্জন তো হবেই, সেইসঙ্গে মিলবে চরম শাস্তি।

এই ঘটনার কিছু বাদে, ১৭৪৪ স্যালের ৩১ মার্চ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হলেন। বর্গীর হাঙ্গামা দূর হল। কর্মচারীটির মুখে নবাব আলিবর্দি চরণামৃতের কাহিনী শুনলেন। নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে বদ্বীপের পঞ্চাশ বিঘা জমি ও অর্থদান করলেন কড়ুই পণ্ডিতকে।

এবার ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে। নানান প্রার্থনা নিয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। কড়ুই পণ্ডিত নীলপূজা, বৈশাখী পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী ও মহাষ্টমীতে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করেন। কড়ুই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুর আছেন অশোক গাছের নিচে। চারটি উৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হয়। তার উত্তর পুরুষরা এখনও পূজা করে চলেছে। অশোক গাছের কাছেই বাঁধানো পুকুর। শোনা যায়, এই পুকুর কাটার সময় মাটির নিচে জীর্ণ নৌকা ও মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।

ঘুটিয়ারী শরীফ

এখানে আছে পীর মোবারক আলি গাজীর (বড়খাঁ গাজী) দরগাহ ও মসজিদ। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল ঘুটিয়ারী শরীফ। বর্তমানে মদমল পরগণাভুক্ত। গাজী সাহেব সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদের বশীভূত করে এখানে জনপদ গড়ে তোলেন। লোকশ্রুতি, গাজী সাহেব বাঘের পিঠে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এবং তাঁর ভাই কালু গাজীকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূজো দিয়ে থাকে।

প্রতি বছর আষাঢ় ও ভাদ্রমাসে গাজী সাহেব স্মরণে ঘুটিয়ারী শরীফে দুটি বড় মেলা হয়।

গাজী সাহেব সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচারিত। তার একটি হল বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের নিয়ে। জমিদার মদনমোহনকে খাজনা বাকি ফেলার অপরাধে নবাবের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। মদনমোহন গাজীর শরণাপন্ন হন। গাজীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে মুক্তি দেন। রায়চৌধুরীরা গাজীর দরগাহ তৈরি করিয়ে দেন এবং বিস্তর পীরোত্তর জমি দান করেন। গাজী সাহেবের সঙ্গে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতার সংঘাত এবং বনবিবির হস্তক্ষেপে তার অবসান নিয়েও ছড়িয়ে আছে নানান কাহিনী।

ঘুটিয়ারী শরীফে ৭ আষাঢ় থেকে শুরু হয় গাজীর তিরোধান উৎসব। সাতদিনের উৎসবের সঙ্গে থাকে মেলা। ১৭ শ্রাবণ থেকেও উৎসব এবং মেলা হয়। এখানে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয়। অম্বুবাচির সময় উৎসবে দরগাহে শিরণি দেয় অনেকে। প্রথম শিরণি নেওয়াহয় জমিদার রায়চৌধুরী বাড়ির। উৎসবে দূর দূরান্তের মানুষ যোগ দেয়। বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘুটিয়ারী শরীফের আকর্ষণীয় বিবরণে আছে ঃ "চিৎকার, চেঁচামেচি। হৈ-হট্টগোল। অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি, জোয়ান—সব একাকার। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। অনেকটা জায়গা জুড়ে হোগলার ছাপরা। তার মধ্যে অনেকগুলোতে খাবারের ও চায়ের দোকান। পূজোর সামগ্রি ও শিরনিরও ; কতকগুলো আবার ভক্ত-যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য। এর জন্য অবশ্য ভাড়া দিতে হয়, পঞ্চাশ পয়সা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তার মধ্যেই যাত্রীরা বিশ্রাম করছে, স্নানের পর মেয়ে-পুরুষেরা জামা-কাপড় বদলাচ্ছে। রাঁধছে, খাচছে। প্রয়োজনবোধে তারই একধারে বাচ্চাদের প্রস্রাব-পায়খানার ব্যাপারটাও সারিয়ে নিচ্ছে। আশে-পাশেও যে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়েছে, সেখানেই কাপড়-চাদর-মাদুর-কাঁথা যা হোক বিছিয়ে (এসবও এখানে ভাড়া পাওয়া যায়) বসে পড়েছে বিশ্রাম কিংবা আহার করতে। অনেকে বাড়ি থেকেই খাবার তৈরি করে আনে। কেউ কেউ এখানকার দোকান থেকেও কিনে নেয়। অনেকে রান্না করেও খায়।

চলার পথ জলে কাদায় প্যাঁচ প্যাঁচ করছে। তার মধ্যে দিয়েই চলেছে ছুটোছুটি, ব্যস্ততা। দোকানী, পূজারী থেকে তীর্থযাত্রী পর্যন্ত কারোরই যেন একটুকু বাড়তি সময় নেই হাতে নষ্ট করার মতো। সবাই খুব ব্যস্ত। গাজী সাহেবের দরগাহতে

প্রতিষ্ঠা করলেন বিগ্রহ। নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামে গিয়ে চাষ করেন, আর কৃষকদের শোনান ধর্মঠাকুরের গান।

এমন সময় নবাব আলিবর্দির জনৈক কর্মী নৌকাযোগে ঐপথে যাওয়ার সময় তাঁর নৌকাডুবি হয়। কর্মচারীটি সাঁতরে রাতের অন্ধকারে উঠলেন ঐ চরে। কড়ুই পণ্ডিতের কুটীরে প্রজ্বলিত আলোক শিখা দেখে সেখানে এগিয়ে গেলেন। সেখানে আশ্রয় মিলল তাঁর। আর পেলেন খাদ্য। কিন্তু খাওয়ার জল ছিল না সেখানে। ছিল মাত্র দেবতার চরণামৃত। কড়ুইপণ্ডিত সেকথা জানালেন। কর্মচারীটি জানতে চাইল, ঐ চরণামৃত পানে কি উপকার হতে পারে। কড়ুই পণ্ডিত জানালেন—প্রার্থিত বস্তু লাভ হবে। কর্মচারীটি বলল—মারাঠাদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ চলছে। নবাব জয়ী হলে পণ্ডিত পুরষ্কৃত হবেন। আর পরাস্ত হলে, দেবতার বিসর্জন তো হবেই, সেইসঙ্গে মিলবে চরম শাস্তি।

এই ঘটনার কিছু বাদে, ১৭৪৪ সালের ৩১ মার্চ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হলেন। বর্গীর হাঙ্গামা দূর হল। কর্মচারীটির মুখে নবাব আলিবর্দি চরণামৃতের কাহিনী শুনলেন। নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে বদ্বীপের পঞ্চাশ বিঘা জমি ও অর্থদান করলেন কড়ুই পণ্ডিতকে।

এবার ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে। নানান প্রার্থনা নিয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। কড়ুই পণ্ডিত নীলপুজো, বৈশাখী পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী ও মহাষ্টমীতে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করেন। কড়ুই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুর আছেন অশোক গাছের নিচে। চারটি উৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হয়। তার উত্তর পুরুষরা এখনও পুজা করে চলেছে। অশোক গাছের কাছেই বাঁধানো পুকুর। শোনা যায়, এই পুকুর কাটার সময় মাটির নিচে জীর্ণ নৌকা ও মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।

ঘুটিয়ারী শরীফ

এখানে আছে পীর মোবারক আলি গাজীর (বড়খাঁ গাজী) দরগাহ ও মসজিদ। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল ঘুটিয়ারী শরীফ। বর্তমানে মদমল পরগণাভুক্ত। গাজী সাহেব সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদের বশীভূত করে এখানে জনপদ গড়ে তোলেন। লোকশ্রুতি, গাজী সাহেব বাঘের পিঠে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এবং তাঁর ভাই কালু গাজীকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পুজো দিয়ে থাকে।

প্রতি বছর আষাঢ় ও ভাদ্রমাসে গাজী সাহেব স্মরণে ঘুটিয়ারী শরীফে দুটি বড় মেলা হয়।

গাজী সাহেব সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচারিত। তার একটি হল বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের নিয়ে। জমিদার মদনমোহনকে খাজনা বাকি ফেলার অপরাধে নবাবের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। মদনমোহন গাজীর শরণাপন্ন হন। গাজীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে মুক্তি দেন। রায়চৌধুরীরা গাজীর দরগাহ তৈরি করিয়ে দেন এবং বিস্তর পীরোত্তর জমি দান করেন। গাজী সাহেবের সঙ্গে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতার সংঘাত এবং বনবিবির হস্তক্ষেপে তার অবসান নিয়েও ছড়িয়ে আছে নানান কাহিনী।

ঘুটিয়ারী শরীফে ৭ আষাঢ় থেকে শুরু হয় গাজীর তিরোধান উৎসব। সাতদিনের উৎসবের সঙ্গে থাকে মেলা। ১৭ শ্রাবণ থেকেও উৎসব এবং মেলা হয়। এখানে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয়। অম্বুবাচির সময় উৎসবে দরগাহে শিরণি দেয় অনেকে। প্রথম শিরণি নেওয়াহয় জমিদার রায়চৌধুরী বাড়ির। উৎসবে দূর দূরান্তের মানুষ যোগ দেয়। বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘুটিয়ারী শরীফের আকর্ষণীয় বিবরণে আছে ঃ "চিৎকার, চেঁচামেচি। হৈ-হট্টগোল। অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি, জোয়ান—সব একাকার। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। অনেকটা জায়গা জুড়ে হোগলার ছাপরা। তার মধ্যে অনেকগুলোতে খাবারের ও চায়ের দোকান। পুজোর সামগ্রি ও শিরনিরও; কতকগুলো আবার ভক্ত-যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য। এর জন্য অবশ্য ভাড়া দিতে হয়, পঞ্চাশ পয়সা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই. তার মধ্যেই যাত্রীরা বিশ্রাম করছে, স্নানের পর মেয়ে-পুরুষেরা জামা-কাপড় বদলাচ্ছে। রাঁধছে, খাচছে। প্রয়োজনবোধে তারই একধারে বাচ্চাদের প্রস্রাব-পায়খানার ব্যাপারটাও সারিয়ে নিচ্ছে। আশে-পাশেও যে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়েছে, সেখানেই কাপড়-চাদর-মাদুর-কাঁথা যা হোক বিছিয়ে (এসবও এখানে ভাড়া পাওয়া যায়) বসে পড়েছে বিশ্রাম কিংবা আহার করতে। অনেকে বাড়ি থেকেই খাবার তৈরি করে আনে। কেউ কেউ এখানকার দোকান থেকেও কিনে নেয়। অনেকে রান্না করেও খায়।

চলার পথ জলে কাদায় প্যাঁচ প্যাঁচ করছে। তার মধ্যে দিয়েই চলেছে ছুটোছুটি, ব্যস্ততা। দোকানী, পুজারী থেকে তীর্থযাত্রী পর্যন্ত কারোরই যেন একটুকু বাড়তি সময় নেই হাতে নষ্ট করার মতো। সবাই খুব ব্যস্ত। গাজী সাহেবের দরগাহতে

যাচ্ছে পুজো চড়াতে। হিন্দুরা নৈবেদ্য দিচ্ছে মিষ্টি, মানত রাখছে ছাগল দিয়ে। মুসলমানরা দিচ্ছে মুরগী, মিঠাই। কাছারী পুকুরে যাচ্ছে শিরনি ভাসাতে, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে কি না জানতে।

এখানকার মেলায় আর পাঁচটা মেলার মতো জৌলুস নেই। নেই হরেকরকম রঙিন জিনিসের বিকিকিনির হাট, ম্যাজিক, সার্কাস, নাগরদোলা, চরকি ও স্টলের ভীড়। অসংখ্য মানুষের বিচিত্র এই মেলা ঘুটিয়ারী শরীফে। অবশ্য সামান্য কিছু প্লাস্টিকের ও মাটির খেলনা, ছোটখাটো তৈজসপত্র, রঙিন ফিতে, কাচের ও প্লাষ্টিকের চুড়ি, গহনাও পাওয়া যায়—মেলার সময় ছাড়াও যেমন থাকে এখানকার কোন কোন দোকানে। ক্রমে ক্রমে ছোটখাট গঞ্জ (বিশেষ করে চাউলের) হিসাবেও গড়ে উঠছে জায়গাটা। মেলা ও পীরগাজী মোবারক আলীর দরগাহ-তাতে সাহায্য করছে মাত্র। কি একটা বিশ্বাসের টানে, দীর্ঘদিন থেকে, হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে। সবার মনোবাসনা পূর্ণ হয় না, কারো কারো হয়। তবু তারা আসে। বারে বারে, বছরে বছরে। মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য। পূর্ণ হবার পর পুজো দিতে, মানত রক্ষা করতে। অনেকে আবার শুধু ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতেও আসে। তাদের বিশ্বাসের গায়ে মোটা আঁচড়ের দাগ পড়েনি আজও। ঘুটিয়ারী শরীফের মেলার প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ এটাই।

বহুকাল আগে পীর গাজী মোবারক আলী তাঁর দুই বিশ্বস্ত ও ভয়ঙ্কর পার্শ্বচর দুটি বাঘকে নিয়ে কাছের কোন এক গাছতলায় এসে আস্তানা করলেন। তখন এই বাঁসরা গ্রাম ছিল জনবসতিহীন, জঙ্গলে-ঘেরা। মানুষের আনাগোনাও প্রায় ছিল না বললেই চলে। রেলপথের কথা তখন কে ভেবেছে এখানে। গাজী সাহেব একদিন রোজের মতো তাঁর ছোট্ট মাটির হাঁড়িটায় করে ভাত ফুটিয়ে সবে নামিয়েছেন, এমন সময় একদল জনমজুর এসে হাজির। কাছে কোথাও হয়তো তারা মাটি কাটার কিংবা চাষের কাজ করছিল। তারা বলে, ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত দাও। মাটির হাঁড়িতে তিনটি প্রাণীর মতো সামান্য কটা ভাত, আর এই এতগুলো ক্ষুধার্ত জনমজুর! কিন্তু নির্বিকার গাজী বললেন, বেশ, বসে যাও। তারপরই ঘটলো সেই আশ্চর্য কাণ্ড! ঐ অতগুলো লোকও একসঙ্গে সেই ছোট্ট মাটির হাঁড়ীর ভাতগুলো খেয়ে শেষ করতে পারল না। দেখতে দেখতে কি করে যেন গাজীর এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গঞ্জে, দূর-দূরান্তে। ক্রমে বিপদতারণ মধুসূদন হয়ে উঠলেন তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে। তার খ্যাতি বিস্তৃত হল। শ্বাপদসংকুল সুন্দরবনের এই জঙ্গল রাজ্যে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত

হল। আর তখন থেকেই শুরু হল তার কাছে মানুষের আনাগোনা। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে গাজী সাহেব হয়ে উঠলেন মেদিনীমল্ল পরগণার এই জঙ্গলরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ; জঙ্গলের রাজ্যে মানুষের বিপদভঞ্জনের প্রধান ও একমাত্র সহায়···

গাজী সাহেবের দেহরক্ষা বিষয়ে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে। গাজী সাহেবের ভক্ত যেমন ছিল অসংখ্য তেমনি শত্রুও কম ছিল না। একদিন কয়েকজন লোক এল গাজী সাহেবের কাছে। তিনি বুঝলেন তারা তাকে হত্যা করতে এসেছে। তিনি তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে মসজিদের দরজা বন্ধ করে নমাজে বসলেন। অনেকক্ষণ পরেও তিনি বেরুচ্ছেন না। অধৈর্য হয়ে তারা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখলো গাজী সাহেবের চিরসমাধি-হয়ে গেছে।

অন্য কাহিনীটা এই রকম ঃ প্রচণ্ড খরায় সব জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির কোনই সম্ভাবনা নেই। ভক্ত ও শিষ্যরা তাঁকে ধরলো, একটা বিহিত করুন। তিনি মসজিদের ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে আল্লার সঙ্গে দরবারে বসলেন। তার আগে শিষ্যদের বললেন, আমি নিজে থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা দরজা খুলো না, আমাকে ডেকো না। তিনদিন হয়ে গেল, তিনি আর আসেন না। চিন্তিত হয়ে শিষ্যরা দরজা খুলে ফেললো। দেখলো গাজী সাহেব সমাধিস্থ। তারা সেখানেই তার দেহ কবর দিল। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামলো। সেই দিনটা ছিল হিন্দুদের অম্বুবাচির দিন। ঘুটিয়ারী শরীফে মোবারক গাজীর অম্বুবাচির মেলা এই কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অম্বুবাচির মেলা হয় সাতদিন ধরে। লোকসমাগম ঘটে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো। গরিব দিনমজুর, চাষী, ছাপোষা গৃহস্থ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাকুরে, ব্যবসায়ী, বেকার, গাঁয়ের শহরের নানা শ্রেণীর অবস্থার, বৃত্তির ও পেশার মানুষ আসে অনেক দূর দূর গ্রাম ও শহর থেকে ; তবে গ্রামের মানুষের সংখ্যাই বেশী। তাদের অধিকাংশই সাধারণতঃ ছাপোষা গৃহস্থ। বেশী আসে, যারা মামলা-মোকদ্দমায় পযুর্দস্ত, পারিবারিক ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত, অনেক করেও যারা দীর্ঘদিনের রোগ-ভোগ ও নানাবিধ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আর আসে আত্মজর কাকলী শোনার জন্যে যাদের হৃদয় ব্যাকুল, অথচ সন্তানের মুখ দেখতে পাচ্ছে না তারা, দরগাহতে পূজা চড়ায়। কাছারী পুকুরে শিরণি ভাসায়। ভাসানো শিরণি যদি ডুবে গিয়ে আবার ভেসে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে প্রার্থীর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তখন সে শিরণিটা খেয়ে নেয়। অবশ্য ডুবে গিয়ে ভেসে উঠছে, চোখে পড়ল না। প্রার্থীরা শিরণি ভাসিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেটা তুলে নিয়ে

খেয়ে ফেলছে। বলে, এতেও নাকি কাজ হয়। ভাসানো শিরণি খেয়ে অনেকেই নাকি পুত্র-সন্তান লাভ করেছেন। অনেকের অন্যান্য নানা রকম বিপদও কেটে গেছে। আর একটা মেলা হয় পাঁচ দিনের, আগস্ট মাসে। অম্বুবাচির মেলা যেমন প্রধানতঃ সাধারণ মানুষের, আগষ্টের মেলা তেমনি মুসলমান ফকির ও মোল্লাদের। ভারতের নানা জায়গা থেকে বহু ফকির ও মোল্লা আসেন মোবারক গাজীর দরগাতে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাতে। শোনা যায়, অম্বুবাচিতে তাঁকে কবর দেওয়ার কয়েকদিন পর, আগষ্ট মাসে তিনি পুনরায় শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওরে, আমি যে তখনো আল্লার সঙ্গে দরবার করছিলুম। তোরা ভাবলি, আমার সমাধি হয়ে গেছে। দূর বোকা সেই পুনরাবির্ভাব স্মরণেই আগস্টের এই মেলা। এছাড়া প্রতি (শুক্রবার বিশেষ) পূজা দরগাহতে বসে।

পীরের দরগাহে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ চিনি-বাতাসা ও শিরনি দেয়। ভক্তরা খাসী ও মুরগী জবাই করে।

বিনয়ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি'র তৃতীয় খণ্ডে পীর বড়খাঁ গাজীর ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা'র তৃতীয় খণ্ডে গাজীর মাহাত্ম্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আছে ঃ

"......সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন পল্লীতে মোবারক গাজীর বেদী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অঞ্চলের কাঠুরিয়ারা গাজীর বেদীতে প্রার্থনা না জানাইয়া সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যায় না। গাজীর বংশধর বা সাকরেদ পরিচয় দিয়া এক দল ফকির কাঠুরিয়াদের ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজাদি করিয়া থাকেন। প্রচলিত প্রথা এই যে, কাঠুরিয়ারা যে অঞ্চলে কাঠ কাটিবে বলিয়া স্থির করেন ফকিরদের কেহ তাহাদের সঙ্গে যাইয়া সেই স্থানে কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মন্ত্র পড়িয়া একটি গণ্ডী কাটিয়া দেন। সেই গণ্ডীর মধ্যে লতাপাতা দিয়া ছোট ছোট সাতটি কুটীর নির্মাণ করা হয়। উহার দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমটিতে জগন্বন্ধু (Friend of the world), দ্বিতীয়টিতে প্রলয় দেবতারূপে মহাদেব এবং তৃতীয়টিতে সর্পদেবতা মনসাদেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়। মনসা দেবীর কুটিরের পাশে রূপপরীর সম্মানার্থে একটি ছোট বেদী নির্মাণ করা হয়। রূপপরী জঙ্গলের অদৃশ্য আত্মা বলিয়া বিশ্বাস। পরের কুটিরটির মধ্যে দুইটি কোঠা থাকে, উহার একটিতে কালী এবং অপরটিতে কালীমাতার কন্যা কালিমায়া অধিষ্ঠান করেন। ইহার পাশেও রূপ পরীর জন্য একটি ছোট বেদী থাকে। ইহার পরের কুটিরটিও দুইভাগে বিভক্ত—একটি দেবী কামেশ্বরীর অন্যটি বুড়িঠাকুরাণীর। বুড়িঠাকুরাণীর গৃহের পাশে কান্ডে সিন্দুর

লিপ্ত একটি বৃক্ষ থাকে—উহা রক্ষাচণ্ডীর স্থান। অবশিষ্ট দুইটি কুটিরের একটিতে গাজীপীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালুপীরের এবং অন্যটিতে গাজী পীরের পুত্র ছাওয়াল পীরের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাম গাজীর। সর্বশেষে কলাপাতায় বাস্তুদেবতার নামে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। নৈবেদ্য খুবই সাধারণ—চাল, কলা, চিনি ইত্যাদি। তবে রক্ষাচণ্ডীর নিকট কোন নৈবেদ্য দেওয়া হয় না।

"দেবদেবীর এই সকল গৃহ নির্মাণ করিবার পর ফকির স্বয়ং স্নান করেন এবং কাঠুরিয়ারা নূতন বস্ত্র পরিধান এবং কপালে ও বাহুতে সিন্দুর লেপন করিয়া পূজা প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রার্থনা জানান। ইহার পর ফকির কাঠুরিয়াদের কনুই হইতে বিঘৎ মাপিয়া যদি হাতের যে কোন আঙ্গুলের সহিত বিঘতের অঙ্গুলি মিলিয়া না যায় তাহা হইলে আশপাশে কোথাও বাঘ আছে বলিয়া মনে করা হয়। ফকির তখন নিজেকে এবং কাঠুরিয়াদের রক্ষা করিবার জন্য পূজা ও নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করেন—"ধুলা, ধুলা, ধুলার গুড়াপড়ুক তোদের চক্ষে হে বাঘ-বাঘিনী" ইত্যাদি।

"বলা বাহুল্য মন্ত্র শক্তির দ্বারা কাঠুরিয়া এমন কি ফকির নিজেও যে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে জীবন্ত রক্ষা পায় না তাহার বহু প্রমাণও আছে। তথাপি বলা যায়, স্থানীয় কাঠুরিয়ারা বনে কাঠ কাটিতে যাইবার কালে এই সকল ফকিরদের উপরেই বেশী নির্ভর করে। কাঠুরিয়া যে হিন্দু অথবা মুসলমানই হউক গাজী পীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালুগাজীর নামে ভক্তিতে মাথা নত করে।" (পৃঃ ১৯৫-৯৬)

বিনয় ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি"তে (৩য়খণ্ড) গোরাচাঁদ এবং বড় খাঁ গাজী প্রসঙ্গ আলোচনায় আছেঃ "চব্বিশ পরগণার উত্তরে হাড়োয়ার গোরাচাঁদ এবং দক্ষিণে ঘুটিয়ারি শরীফের বড় খাঁ গাজী, এই দুই প্রসিদ্ধ পীরের মধ্যে কার মাহাত্ম্য ও প্রভাব বেশি, তা বলা মুশকিল। মনে হয় দক্ষিণে ঘুটিয়ারি শরীফের পীর মোবারক বড় খাঁ গাজী বেশি প্রভাবশালী। দক্ষিণে পীর গোরাচাঁদের নাম তেমন শোনা যায় না, সর্বত্রই দেখা যায় বড় খাঁ সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেক নামে বড় খাঁ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসমাজে পরিচিত। গাজীবাবা, বড়খাঁ গাজী, গাজীসাহেব, মোবারক শাহগাজী, বরখান গাজী ইত্যাদি। উত্তর-চব্বিশপরগণায় বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে বড় খাঁ গাজীর একাধিক দরগাহ—নজরগাহ আছে। কিন্তু দক্ষিণে গোরাচাঁদের সেরকম আছে বলে মনে হয় না। বারাসতে পাখরাগ্রামে, উলাগ্রামে, বসিরহাটের ফতেপুর গ্রামে পীর বড় খাঁ গাজীর যে নজরগাহগুলি আছে সেখানে হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের ভাল সমাবেশ হয়। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে বড় খাঁ গাজীর প্রভাবসীমা গোরাচাঁদের চেয়ে চব্বিশপরগণায় অনেক বেশি বিস্তৃত।" (পৃঃ ২৪৫)।

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা

মগরাহাট

মগরাহাট কৃষিপ্রধান এলাকা। জনশ্রুতি মগদের হাট বসত বলে, স্থানটি মগরাহাট নামে পরিচিত। গ্রামঘেরা জনপদে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের বাস। উত্তরকলস গ্রামটিতে মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের 'মাজাহার শরীফ' রয়েছে। প্রতি বছর ৭ চৈত্র পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে সাতদিন। ফাল্গুণ মাসে দোল উৎসবটিও জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরকুসুম গ্রামে আছে 'কারবালা' নামে একটি স্থান। সেখানে মহরমের উৎসব ও মেলা হয় প্রতিবছর। সংগ্রামপুর ও দেউলা রেলস্টেশনের মাঝখানে অবস্থিত এই গ্রাম।

একটি পুরনো রথযাত্রার মেলা বসে ইয়ারপুর গ্রামে। শালিকা গ্রামের চড়ক উৎসব ও মেলা এবং ধনিরাম চকের চৈত্রমাসে বিবিমার পুজা ও মেলাকে স্থানীয় অধিবাসিরা দুশবছরের পুরনো বলে দাবী করেন। বিবিমার পুজা হয় নির্দিষ্ট স্থানে। ঐ স্থানেই শিব দক্ষিণেশ্বর ও বাবাঠাকুরের পুজা হয়। বিবিমার পুজা করে মুসলমান সম্প্রদায় এবং অন্যদেবতাদের পুজা করে হিন্দুরা।

নাজরা গ্রামে একটি দেবালয়ে কালী, মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুরের মূর্তি আছে। আর একটি মন্দিরে শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা ও পঞ্চানন্দের মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া আছে গাজীসাহেব পীরের দরগা। এই দরগায় উৎসব হয় প্রতিবছর ১ মাঘ।

রঙ্গিলাবাদ গ্রামের দুশবছরের পুরনো চড়ক উৎসব এখনও পালন করা হয়। এই গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় শীতলা মন্দির আছে। মাঘী পূর্ণিমায় শীতলার বাৎসরিক পুজা, উৎসব হয়। এই উৎসবটি দুশবছরের পুরনো। শীতলা মন্দিরে বাবাঠাকুর, মনসা এবং দক্ষিণেশ্বরেরও পুজা হয়ে থাকে।

দুশবছরের পুরনো আর একটি মেলা হয় প্রতিবছর চৈত্র পূর্ণিমায় বিবিমার পুজা উপলক্ষে ধনিরামচক গ্রামে।

বোসপাড়ায় আছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত আটচালা শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ। এক সময় টেরাকোটার সুদৃশ্য অলংকরণ ছিল।

মিঞাপাড়ায় ব্যবসায়ী হাজী রমজান মিঞা দেড়শ বছর আগে পাঁচ গম্বুজ সমন্বিত একটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের অনেক শিল্প কাজ এখন নষ্ট হয়ে গেছে। মসজিদের পাশে একটি মাদ্রাসা আছে।

ডিহি কলসগ্রামে মহম্মদ একীরুদ্দিন বৈদ্য একটি মাঝারি ধরনের মসজিদ তৈরি করান। মসজিদের প্রবেশপথে অলংকরণ এখনও উজ্জ্বল। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

মন্দিরবাজার

মথুরাপুর রোড স্টেশনের পশ্চিম দিকে মন্দিরবাজার গ্রামে হাটের মাঝখানে আছে তিনশত বছরের পুরনো শ্রীকেশবেশ্বর মন্দির। মন্দির থেকেই গ্রামের নাম মন্দির বাজার। মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল যুক্ত কলস বসান ছিল। মন্দিরের তিনদিকে চওড়া বারান্দায় বসান শ্বেতপাথর এবং ভিতরের মেঝেও শ্বেতপাথরের। মন্দিরের গায়ে কারুকার্যখচিত ইট আছে। উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় ১৬৭০ শকে অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে রাজা কেশব এই মন্দির নির্মাণ করেন। সে সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে কেশব নামে কোন রাজা ছিল না। তবে, স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস মুড়াগাছার কেশবরায় চৌধুরী স্বপ্নাদেশ পেয়ে অরণ্য মধ্যে শিবলিঙ্গ পান এবং নিজের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৬৭০ শকাব্দে। "জনশ্রুতি রাজা কেশব এক স্বপ্নাদেশ অনুসারে কাশীধামের গঙ্গাগর্ভে শিবলিঙ্গ পাইয়া সেখান হইতে বায়ুপথে রাতারাতি উক্ত শিবলিঙ্গ আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। আরও বলা হয় যে, কেশবেশ্বরের এই সুবিশাল মন্দিরটি নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে জনৈক ময়রার গৃহে ভৃত্যরূপে পালিত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার প্রিয় পাত্র কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বাসুদেব নামে জনৈক মিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত এবং দৈবাদেশেই মন্দির অভিষেক উৎসবের পৌরহিত্য করেন বোলসিদ্ধি গ্রামের বাণেশ্বর ন্যায়রত্ন মহাশয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশের তৎকালীন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। এমন কি হালিশহরের মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ভাবশরীরে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন বলিয়াও জনশ্রুতি আছে।" (পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২০৯)

ফাল্গুণ মাসে শিবরাত্রি উৎসব, চৈত্রমাসে গাজন উৎসব ও মেলা, ১ বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যপূজার ব্যবস্থাও আছে। মন্দিরটি সংস্কার হয় ১৯৪৯ সালে।

মন্দিরবাজার থানার ঘাটেশ্বরার সায়েরের চারচালা মন্দিরে এক সময় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজা হত। অনেকেই মন্দিরটিকে বলে দোলমঞ্চ। মন্দিরের সামনে শীতলা পূজা হত বলে, অনেকে মন্দিরটিকে বলে শীতলা মন্দির। হাটের কাছে দোলমঞ্চটি নষ্ট

হয়ে গেছে। ঘাটেশ্বরায় দুটি পুরনো শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি তৈরি করেন স্থানীয় ঘোষ চৌধুরীরা। গ্রামের ধনী জমিদার ঘোষচৌধুরী এবং বসুদের বাড়িও ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘোষ চৌধুরীরা উত্তরপাড়া থেকে আসেন ঘাটেশ্বরার কাছে সিংহেশ্বরে। সেখানে বাঘের উৎপাতের জন্য চলে আসেন ঘাটেশ্বরায়।

জগদীশপুর গ্রামে হাউঁড়ি হাট ও দুটি ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির দেখা যায়। শোনা যায় প্রায় সাড়ে তিনশত বছর আগে স্থানীয় নস্করবংশের হাউঁড়ি নামে জনৈকা মহিলা এই হাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লাল রঙের হালকা ইটের তৈরি মন্দিরের মধ্যে পদ্মখোচিত কালো পাথরের ওপর আড়াই হাত উঁচু শিবলিঙ্গ অবস্থিত। দুটি মন্দিরের একটি ভেঙে পড়ে আছে। অপরটি এখনও দাঁড়িয়ে। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ৮ আশ্বিন পশ্চিম দিকের মন্দিরটি ভেঙে পড়ে।

হাউঁড়ির হাটের মন্দির দুটি যে খুবই প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকের মতে কলকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবার এই মন্দির নির্মাণ ও তাদের গুরুবংশ আহিরীটোলার ভট্টাচার্যদের নিত্য সেবার জন্য দান করেন। মদনমোহন দত্ত নিত্যসেবার জন্য দুশত বিঘা জমি দেবোত্তরও করেছিলেন। কিন্তু হাটটি একাধিকবার হস্তান্তর হয়েছে। মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। তবে বর্তমানে স্থানীয় নস্করদের অধিকারে আছে হাট ও মন্দির। নস্করদের আরাধ্য দেবতা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। রথযাত্রার উৎসব হত একসময় বড় আকারে। এখন তার আয়তন হ্রাস পেয়েছে। মন্দিরের কাছে একটি পুরনো পুকুরের নাম হল ভট্টাচার্য পুকুর। এখানে একটি স্কুল আছে। এই স্কুলের পিছনে একটি ঘরে বিবিমার ঢিবি, বড় খাঁ, গাজী ও বিবিমার শলন মূর্তি রয়েছে। কাছেই আর একটি ঘরে আছে কালী, মনসা ও পঞ্চাননের মূর্তি।

লক্ষ্মীকান্তপুর রেল স্টেশন থেকে যাওয়া যায় সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামে। গ্রামের দক্ষিণে একটি পাকারাস্তা চলে গেছে কুলপী থেকে বিষ্ণুপুর। গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরটি ভেঙে গেছে। ঐ মন্দিরে ছিল দেবী সিদ্ধেশ্বরীর বিগ্রহ। গ্রামের পুরকাইতরা ছিল একসময় ধনী গৃহস্থ। নানা পূজানুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে তাদের কেন্দ্র করে। পুরাকাইতদের ঠাকুরবাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে পূজাপার্বণ লেগেই আছে। ঠাকুর ঘরে আছে শালগ্রাম শিলা, শিব, লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি। গাজন উৎসব হয় চারপাঁচ দিন ধরে। একটি জীর্ণ শিবমন্দির আছে গ্রামে। তাছাড়া বিভিন্ন পাড়ায় শীতলা, মনসা, পাঁচ পীর, সাত বিবি, পঞ্চানন্দের একাধিক থান রয়েছে। গ্রামে গোষ্ঠযাত্রা উৎসবে মেলা বসে। বিদ্যাধরপুর গ্রামে হালদারদের গোপীনাথবল্লভ মন্দিরে জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বহু লৌকিক দেবদেবীর থান ছড়ানো গ্রামটিতে।

পূর্ব গোপালনগর গ্রামে ১বৈশাখে গোষ্ঠ উৎসব এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজো অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বিষ্ণুপুর গ্রামে দোলমন্দিরের দোল উৎসব শতাধিক বছরের পুরনো। এই গ্রামের পৌষপার্বণের মেলাও বেশ পুরনো। দুটি গ্রামেই আছেন শিব, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা ও মনসা। তাদের থানের সংখ্যাও কম নয়। মহেশপুর গ্রামে ছিল বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির। সেই মন্দির আর এখন নেই। তবে মন্দিরের কারুকার্যখচিত বিনষ্ট প্রায় দারুস্তম্ভগুলি লাগানো আছে ইটের ছাদ দেওয়া নতুন মন্দিরে। প্রায় শতফুট উঁচু স্তম্ভগুলির গায়ে লতাপাতা, ফুল জীব জন্তু, কৃষ্ণলীলা ও মহাভারতের উপাখ্যান অলংকৃত। "স্তম্ভগুলির উপরের দিকটা মোচার আকৃতি আর নিচের দিকটা চতুষ্কোণাকৃতি। স্তম্ভের মাঝামাঝি চতুষ্কোণ থেকে নিচের দিকে নেমেছে শেকলে ঝোলানো ঘণ্টা।...উত্তর দিকের বারান্দার বাঁ দিক থেকে প্রথম স্তম্ভের মাঝে চারটি প্যানেলের একটিতে আছে কূর্ম অবতার। অন্যগুলি বোঝা শক্ত।...পূর্বদিকের বারান্দায় প্রোথিত স্তম্ভগুলিতে যেসব খোদাই কাজ আছে—তার মধ্যে আছে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত মোটিফ, যেমন—যশোদা শিশু কৃষ্ণকে স্তন্যদান করছেন। একটি প্যানেলে দেখা যায় উপবিষ্ট অবস্থায় তার যন্ত্র বাদনরত নারদ। সূত্রধর শিল্পীরা পৌরাণিক বিষয়কেই গ্রহণ করেছেন।" (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকশিল্প —সত্যানন্দ মণ্ডল। পৃঃ ৩৪-৩৫)।

ফলতা

হুগলী বা ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে ফলতা ছিল একসময় বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। বর্তমান ফলতা বন্দরের বিপরীত দিকে দামোদর নদ এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ইংরেজদের আগে ফলতায় ছিল ওলন্দাজদের কুঠি ও পোতাশ্রয়। ফলতা বাজার থেকে সামান্য দক্ষিণে দামোদরের সঙ্গম স্থলের সামনে একটি পুরনো দুর্গ আছে। দুর্গের বাইরের দিকে মাটির দেওয়াল হলেও, ভিতরে ইটের গাঁথনি। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কলকাতা আক্রমণ ও অধিকারের সময় কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এই দুর্গে। তারপর তারা সৈন্য ও শক্তি সংগ্রহ করে কলকাতা পুনরুদ্ধার করে। গোলাকার দুর্গের চারপাশে ছিল পরিখা। পরিখার সঙ্গে গঙ্গার যোগ থাকায় গভীর জল জমে থাকত। পূর্বদিকের প্রবেশ দ্বার ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যেত। প্রবেশ পথের দ্বিতলে এক সময় ছিল ইনস্‌পেকশন বাঙলো। প্রাকারের কিছু অংশ এখনও অভগ্ন। কয়েকটি ঘরও আছে। দুর্গের মাঝখানে একটি উঁচু স্তম্ভের ওপর ছিল জাহাজের পথ নির্দেশক। বড়বড় দুটি কামানও ছিল।

ফলতায় গঙ্গার পাশে অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান ছিল জগদীশচন্দ্রবসুর 'মায়াপুরী উদ্যান। তিনি এই নির্জন কাননে উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে গবেষণা করতেন। দেশবিদেশের গাছপালা সংগ্রহ করে এনেছিলেন এই উদ্যানে।

ফলতায় গড়ে তোলা হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্যকেন্দ্র—পশ্চিমবাঙলার শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আকালমেঘ, উত্তর শিমুল-বেড়িয়া নৈনান গ্রামে জমি অধিগ্রহণ করে এই কেন্দ্রটির রূপায়ণ হচ্ছে। ৫০০ একর জমির ওপর গড়ে উঠছে এই বাণিজ্য কেন্দ্র ফলতা এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন। ২৮০একর জমিতে থাকবে শিল্পকেন্দ্র। এলাকাটিকে ৪টি সেকটরে ভাগ করা হয়েছে। শিল্প এলাকা হবে ১ ও ২ নম্বর সেক্টরে। এই শিল্প এলাকাতে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ইলেকট্রনিকস ও স্টাণ্ডার্ড ডিজাইন কারখানা কেন্দ্র থাকবে। তাছাড়া বাণিজ্যকেন্দ্রের মূল প্রশাসনিক ভবন, গুদাম, বৈদ্যুতিক-সাবস্টেশন, লেক ও পার্ক, রেস্তোরা ইত্যাদিও থাকবে এখানে। জেটি থাকবে ১ নম্বর সেকটর সংলগ্ন হুগলি নদীতে। ৩ নম্বর সেক্টর হবে মূল শিল্পগুলির সহযোগী শিল্পাঞ্চল। তাছাড়া এখানে থাকবে সরকারি আবাসন, শ্রমিক আবাসন, ট্রাক ও বাস টার্মিনাস, সিনেমা, হোটেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি হল, স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরী। তৈরি হবে একটি হেলিপ্যাড। উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও থাকবে শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রে। ভারতে এই ধরণের শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র আছে গুজরাটের কাণ্ডলা এবং বোম্বাইয়ের সিপসে। পশ্চিমবঙ্গের ফলতা, দিল্লির নয়দা, কোচিন ও মাদ্রাজে নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠছে। ফলতা মুক্ত বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ যুক্ত হয়েছে সপ্তম যোজনায়। সম্ভবত ১৯৯০ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবে।

১৮টি নামী সংস্থা এখানে লাইসেন্স পেয়েছে। তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ৩০ কোটি টাকা। এসব সংস্থার সঙ্গে আছে বিদেশী সহযোগীরা। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে-এরা ৪০০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। উৎপাদন শুরু করেই রপ্তানির পরিমাণ ১ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আশা করা হয়েছে ৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে রপ্তানি হবে ২৫ কোটি টাকার দ্রব্য।

ফলতা থানার হোগলা গ্রামে আছে প্রায় দুশবছরের প্রাচীন সুবৃহৎ একটি মসজিদ। অলঙকরণে সমৃদ্ধ এই মসজিদটি জনৈক ভেলু খাঁ নির্মিত—এ বিশ্বাস অনেকের। শিবানীপুরের নিতাই মিস্ত্রি ছিলেন শিল্পী। মসজিদের ছটি গম্বুজ। ভাগীরথীতীরে ফলতায় গঙ্গাপুজোর উৎসব আজও সমারোহের সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। পদ্মপুর ও দোস্তপুর দুটি গ্রামেই ১ মাঘ গঙ্গাপুজা উপলক্ষে মেলা বসে। প্রায় দুশ বছরের পুরনো মেলা। পদ্মপুরে ৭ দিন এবং দোস্তপুরে ৫ দিন মেলার

স্থায়িত্ব। ডায়মণ্ডহারবার নেমে পদ্মপুর এবং ফলতা থেকে বাসে দোস্তপুর যেতে হয়।

বৈশাখী পূর্ণিমায় মামুদপুরে ধর্মরাজের পূজা হয়। ধর্মরাজের কোন বিগ্রহ নেই; প্রস্তরখণ্ড দেবতারূপে কল্পিত। এই উপলক্ষে চারদিনের মেলা বসে। ১ বৈশাখ রসুলপুরে গোষ্ঠ যাত্রা উৎসব ও জেলায় বিপুল লোকসমাগম হয়। দুশ বছরের পুরনো এই উৎসব ও মেলা। শতাধিক বছরের পুরনো স্নান যাত্রা উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় জগন্নাথপুর গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই গ্রামের পঞ্চাননের থানটি বহু পুরনো। শনি মঙ্গলবার পূজা হয়।

দলুইপুরের রাসযাত্রার মেলা ৭ দিন, বেলাসিংহার রথযাত্রার মেলা ১ দিন সহরা গ্রামের চড়কের মেলা, রুখিয়া গ্রামের মহরমের উৎসব ও মেলা, কোদালিয়ার গোষ্ঠযাত্রার মেলা ৭ দিন, ফতেপুরের গোষ্ঠযাত্রার মেলা ৬ দিন ও রথযাত্রার মেলা, হাসিমনগরের গোষ্ঠযাত্রা ও গাজনের মেলা ৩ দিন উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের মানুষের সমাগমে ফলতা প্রায় সারা বছর সরব হয়ে থাকে।

হাসিমনগরে দুটি বিগ্রহ আছে পঞ্চানন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের। সহরায় একটি শিব মন্দির ও একটি কালীমন্দির এবং কোদালিয়ায় একটি কালীমন্দির আছে। ফলতার বিভিন্ন গ্রামে, পীর, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা, বিবিমা প্রভৃতির থান আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের একটি বিগ্রহ আছে সহরাগ্রামে। কোদালিয়া গ্রামে রাখালচণ্ডীর পূজা হয়। "রাখালচণ্ডী সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বহুকালপূর্বে একটি রাখাল বালক খেলার ছলে চণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া অপর একটি রাখাল বালকের স্কন্ধে তালপাতার খড়্গের দ্বারা আঘাত করিবামাত্র রাখাল বালকটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। পরে চন্ডীদেবীর কৃপায় বালকটি পুনর্জীবন লাভ করে। সেই সময় হইতেই গ্রামে রাখালচণ্ডীর পূজা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সময় আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা রাখাল চণ্ডীর নিকট মানসিক পূজা দিতে আসেন। বৎসরের যে-কোন সময় একবার বাৎসরিক পূজার আয়োজন করা হয়।" (পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—তৃতীয়খণ্ড পৃঃ ২১৬)।

ডায়মণ্ডহারবার

কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০ সালে। তার ছয় বছর বাদে পোর্ট কমিশনারের ভাইস চেয়ারম্যান ডবলু ডাফ ব্রুস বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার জন্য একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেন। তার মধ্যে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে ছিল

ক্যানিংয়ের আরও ছয় মাইল নিচে মাতলার ধারে একটি লক তৈরি করা, যা কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলে সহায়ক হবে। ব্রুসের পরিকল্পনায় কলকাতা থেকে বন্দর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় কোন প্রস্তাব ছিল না। ডায়মণ্ডহারবারে জাহাজ নোঙরের ব্যবস্থা কলকাতা বন্দরের অনুকূল হবে। সরকারীভাবে ডায়মণ্ডহারবার নিয়ে আর কোন পরিকল্পনা রচিত হল না। আবার ১৮৮১ সালে কলকাতা বন্দরে সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার প্রস্তাব ওঠে। কলকাতা বন্দরে ভারী জাহাজের চাপ বাড়তে থাকায় ডায়মণ্ডহারবার নিয়ে চিন্তা করা হয়। ডায়মণ্ডহারবারে ডীপ ওয়াটার ডক নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। "The government appointed a committee to enquire into the question. Towards the close of 1882-83, the report of this committee was published. The official members of the committee held the view that wet docks should be constructed and that they should be situated at Diamondharbour. The two representatives of the Merchantile Community recorded minutes of dissent and dwelt on the possible in conuenience and was to the trade of Calcutta expected from this distinct "auxiliary port' at some distance from the city." বাঙলার লেফটন্যানট গভর্ণর এই প্রস্তাব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। এসব পরিকল্পনা রূপায়ণে সাময়িক সুরাহা হলেও, দীর্ঘস্থায়ী ফলোদয় হবে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার পোর্ট কমিশনারকে অনুরোধ করে—বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যেন বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার বিষয়টি বিবেচনা ও পরিকল্পনা করা হয়। দীর্ঘ পাঁচ মাস ২৩টি মিটিং করার পর ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে রিপোর্ট পেশ করা হয় সরকারের কাছে। "The Committee had no doubt that the accommodation for the trade of the port required immediate extension both for imports and exports, particularly for exports. In its opinion, docks at Diamondharbour were not likely to be economical for the shipping nor convenient for the trade of the port." (The Port of Calcutta—N. Mukherjee p. 72-73)

কোম্পানি আমলে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়ার নদীপথে ঠগ ও দেশীয় দস্যুদের উৎপাত ছিল বেশি। যে কারণে সরকার নদীপথে গার্ডবোট বা চৌকি নৌকার ব্যবস্থা করে। ডাকাত বেরোত দল বেঁধে। দুর্দান্ত সাহসী এসব ডাকাত অনেক সময় নিজেদের

নৌকোয় কোম্পানির নিশানও বেঁধে রাখত। ১৭৮৮ সালে একটি সরকারী নির্দেশে ছিল ঃ "গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর, হিজলীর ম্যাজিস্ট্রেটকে হুকুম দিতেছেন যে—নিম্নলিখিত স্থানে চৌকী স্থাপিত হইল। (১) ফলতা—এই চৌকীতে ১ হইতে ২নং এর বোট থানাদারের অধীনে উলুবেড়িয়া হইতে কুকড়াহাটি পর্যন্ত চৌকী দিবে। (২) রাঙাফুলী—এই চৌকীতে ৩ ও ৪নং গার্ড বোট থাকিবে। এই বোট কুকড়াহাটি হইতে বড়তলা পর্যন্ত চৌকী দিবে। (৩) সন্দীয়া-গাঁড়িয়া। এই স্থান হলদী নদীর মুখে। বড়তলা হইতে তালপাতি পর্যন্ত স্থান—৫ ও ৬নং এর গার্ড বোট দ্বারা রক্ষিত হইবে। (৪) গেয়োখালি তালপাতি হইতে হিজলী বাঁধ পর্যন্ত ৭ ও ৮ নং এর বোট পাহারা দিবে। থানাদারদের বোট চিনিবার সংকেত এই, প্রত্যেক চৌকী নৌকায় একটি করিয়া লাল নিশান ও সেই নিশানের উপর সাদা অক্ষরে বাঙলা ভাষায় নৌকার নম্বর থাকিবে।"

ডায়মণ্ডহারবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু বিদেশীর স্মৃতি। সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে নানা ঘটনা। তার মধ্যে টিলম্যান হেংকেলের ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই টিলম্যান ছিলেন যশোহরের প্রথম কালেকটর। তারপর নিমকমহলের প্রধান হয়ে আসেন দক্ষিণ বাঙলায়। দেশীয়দের সঙ্গে তার মেলামেশায় কোন দূরত্ব ছিল না। বহু মলংগী কাজ করত তার অধীনে। টিলম্যান নিজের সন্তানের মতই ব্যবহার করতেন তাদের সঙ্গে। আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে দেশীয়দের সঙ্গে। এই বিদেশীকে বহুদিন স্থানীয় মানুষ ভোলেনি। তার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করত। ১৭৮৮ সালের ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবরটি ছাপা হয়েছিল।

ডায়মন্ডহারবারে একটি বৃহৎ আয়তনের ভেটকি মাছ ধরা পড়ে। ১৭৮৮ সালের ১০ মে সংবাদে ছাপা হয় মাছটির ওজন ছিল ৩ মণ ১০ সের। পিঠে নটি বড় বড় কাটা। চোয়াল থেকে লেজ ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি। দেহের পরিধি ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। আটজন লোক দুটি বাঁশে বেঁধে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে নিয়ে এসেছিল মাছটিকে।

অঞ্চলটির এক সময় নাম ছিল হাজীপুর। জাহাজ থেকে মাল নামাবার ও নোঙর করার সুবিধা থাকায় ইংরেজরা বলত ডায়মণ্ডহারবার। গঙ্গার বিস্তৃত রূপ এখানে এসে স্পষ্ট উপভোগ করা যায়। ধার দিয়ে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে অনেককাল আগে। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ গভীর। এককালে ছিল বাঘ ও সাপে গভীর জঙ্গল।

নদীর তীরে আছে নির্জন ও মনোরম ঝাউবীথি। স্থানটি খুবই স্বাস্থ্যকর এবং ভ্রমণোপযোগী। নদীর ধারে চিংড়িখালি গড় নামে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ আছে।

বাইরের শত্রুর হাত থেকে কলকাতা রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল দুর্গটি। ইংরেজদের কবরখানা ছিল এখানে। অনেকের বিশ্বাস নীলাচল যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্যদেব হাজীপুর এসেছিলেন। ডায়মণ্ডহারবারের কয়েক মাইল দক্ষিণে হরিনারায়ণপুরে মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা আমলের মাতৃকামূর্তি ও শীলমোহর পাওয়া গেছে।

কামারপোল গ্রামে আছে রাধাকান্তর একটি বৃহৎ আটচালা মন্দির। তাছাড়া লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শিবমন্দির, ঝুলনঘর ও বেশ কয়েকটি দোলমঞ্চ আছে এই গ্রামে। রাধাকান্ত মন্দিরের দেওয়ালে ছিল অলংকরণ। তার বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে।

মশাট, হরিণডাঙা, লালবাটী, দক্ষিণ সিমলা, কুলটিকারী, পারুলিয়া গ্রামগুলিতে সারা বছর ধরেই পালা-পার্বণ লেগে থাকে। বেশির ভাগ গ্রামবাসীর উপজীবিকা কৃষিকাজ। ধোপা, নাপিত, পোদ, মাহিষ্য, বাগদী, কাওরা, ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, যোগী, মুসলমান, বৈরাগী, বারুই নানা শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই জনপদ। পঞ্চাশটা বাবাঠাকুর, মনসা, শীতলা, বিশালাক্ষী, রক্ষাকালী পুজা হয় বিভিন্ন গ্রামে। লালবাটী গ্রামের মহিষমর্দিনী চণ্ডীর পুজা ও উৎসব হয় ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে। একটি বটগাছের নিচে আছে দেবীমূর্তি। দেবী চণ্ডীর দশটি হাত। অসুরের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে। কার্তিকের ঘাড়ের ওপর একটি মহিষ রয়েছে। জনশ্রুতি দুশবছর আগে একটি পুকুর খোঁড়ার সময় দেবীর প্রস্তর বিগ্রহ পাওয়া যায়। এই গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে। হরিণডাঙা গ্রামের রক্ষাকালীর পুজা ও মহোৎসবে বিপুল জনসমাগম হয়। জনশ্রুতি ১২৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে প্রবল বন্যায় গ্রামটি ভেসে যায়। মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রক্ষাকালীর পুজা হয়। সেই থেকে নিয়মিত বাৎসরিক পুজার আয়োজন করা হচ্ছে। কুলটিকরী গ্রামের বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর পুজায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেয়। মশাট গ্রামের মহরমের মেলা, হরিণডাঙা গ্রামে কালীপুজার মেলা, পারুলিয়া গ্রামের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মেলা, কুলটিকরী গ্রামের বারুণী স্নানের মেলা (৪ দিন) গ্রামীন জনজীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে কয়েকদিনের জন্য।

ডায়মণ্ডহারবার থানার কয়েকটি গ্রামে লোকদেবতা 'বেনাকি'র প্রভাব একসময় খুবই প্রবল ছিল। বাঙলার অন্য কোন জেলায় দেখা যায় না। অবশ্য ফলতা ও বাগদা থানায় কয়েকটি পরিবারে এই দেবতার পুজা এখনও প্রচলিত। ডায়মণ্ডহারবার থানার দীঘেশ্বর, পালা, বীরপালা, শঙ্কর পারুলিয়া, সেহালামপুর প্রভৃতি গ্রামে এই দেবতা পুজিত।

দেবতার উৎপত্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, গনেশের জন্মের পর অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শনিও নবজাত সন্তান দর্শনে আসেন। কিন্তু শনির দৃষ্টিপাত মাত্র গণেশের মাথা উড়ে যায় এবং হাতির মাথা জুড়ে গনেশকে বাঁচান হয়। কাটা হাতির দেহে গনেশের মুণ্ড জুড়ে সৃষ্টি হয় বেনাকি দেবতা। পুরোহিতরা বেনাকিকে পৌরাণিক দেবতা হিসাবে প্রচার করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে স্কন্দপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উল্লেখ করা হয় এবং সেখানে গনেশের মাথা উড়ে যাওয়ার উল্লেখ থাকলেও, বেনাকি সৃষ্টির কোন বিবরণ নেই।

বেনাকি হলেন শষ্যের দেবতা। ১ পৌষ তাঁর পুজার পর ধান কাটা শুরু হওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন তা হয় না। আগেই ধানকাটা শুরু হয়ে যায়। যে জমিতে বেনাকি পুজা হবে, সেই জমিতে কিছু ধান রেখে দেওয়া হয় না কেটে। পুজোর পর কাটা হয় সেই ধান। এই জমির মাটি দিয়েই জমির ওপর গড়া হয় বেনাকির মূর্তি। শাঁখ ও কাঁসর বাজে পুজায়। বেনাকি পুজার স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নেই। পুরোহিত নিজের ইচ্ছামত লক্ষ্মী ও গনেশের ধ্যান মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ করেন। পুজোর জায়গায় থাকে ধামা ও কাস্তে। পুজোর শেষে পুরোহিত এক আঁটি ধান কেটে ঐ ধামায় রাখেন। বেনাকির মূর্তি কল্পনায় পশু ও নরের সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। এক সময় অব্রাহ্মণরাই এই পুজো করতেন। পরে ব্রাহ্মণ সাহায্যে পুজার প্রচলন ঘটলেও, কোথাও কোথাও গৃহিনীরা এই পুজা করেন। তবে বেনাকি পুজা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

বাসুলডাঙা

বাসুলডাঙা স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে বোলসিদ্ধি গ্রামে উঁচু জমির ওপর একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। শিব মন্দিরের চারদিকে কয়েকটি পুরনো অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রয়েছে। মন্দিরটি কবে তৈরি তা জানা যায় নি। স্থানীয় জনগণ মন্দিরটিকে বলে অনাদিলিঙ্গ মন্দির। স্থানটির বোলসিদ্ধি নামকরণের কারণ, এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী শিবপুজা করতেন। তার ভবিষ্যৎবাণী মিলে যেত। সেই থেকে গ্রামের নাম হয়, বাক্‌সিদ্ধি বা বোলসিদ্ধি।

কুলপী

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ছয় মাইল দূরে ভাগীরথী তীরে কুলপী অবস্থিত। হুগলি নদীর কাছে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে বারো চালা স্মৃতিসৌধকে কেউ বলেন মন্নাবিবির

গোর, আবার কেউ বলেন মানুবিবির কবর। যাই হোক এটি ইংরেজ আমলে ইটের তৈরি একটা স্তম্ভ। আগে এর ওপর আলো জ্বলত রাতে নাবিকদের পথনির্দেশের জন্য। স্থানীয় অধিবাসীরা বলত কুলপীর প্যাগোডা। কুলপীতে জাহাজ নোঙরের ব্যবস্থা ছিল।

ডায়মণ্ডহারবার স্টেশন বা লক্ষীকান্তপুর স্টেশনে নেমে ডায়মণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ রোডে বাসে অথবা কাঁচা রাস্তায় যাতায়াত করা যায়। দোরিয়া গ্রামের রথযাত্রার মেলা ৮ দিন, শ্যামবসুর চকে চড়কের মেলা ১ দিন ও রথযাত্রার মেলা ১দিন, উদয়রামপুরে চড়কের মেলা, দুর্গানগরে চড়কের মেলা ৩ দিন খুবই বিখ্যাত। মেলাগুলি বহুকাল যাবৎ চলছে। রাজারামপুর, বাহাদুরপুর, রামরামপুর, মুকুন্দপুর, জামবেড়িয়া, রামকিশোরপুর, কানপুর, নারায়ণপুর, বড়বেড়িয়া, হাড়া, কুলপী, বকচর, মশামারি, রামকৃষ্ণপুর, ভগবানপুর প্রভৃতি আশপাশের গ্রামের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মেলায় যোগ দেয়। দোরিয়া গ্রামের তিনটি এবং দুর্গানগরে দুটি শিবমন্দির আছে। দুর্গানগরে অবস্থিত বিবিমার থানে বছরে একবার দুদিন ব্যাপী পুজা হয়। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর বিগ্রহ ও থান আছে গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে। তার মধ্যে পঞ্চানন্দের প্রভাব বেশি।

গোসাবা

স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সুন্দরবন অঞ্চলে চাষবাদ প্রবর্তনের জন্য একটি কৃষি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন গোসাবায়। ক্রমে তাঁরই চেষ্টায় এই প্রতিকূল পরিবেশ মনুষ্য বাস উপযোগী হয়ে ওঠে। সুন্দর রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস, পানীয় জল সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। এক সময় কেবলমাত্র এই এলাকায় ব্যবহারের জন্য 'গোসাবা নোট' নামক টাকার প্রচলন করেছিলেন হ্যামিলটন সাহেব।

ছোট ছোট ২০ টি দ্বীপের সমষ্টি গোসাবা। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ছিল সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত। ড্যানিয়েল হ্যামিলটন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, কৃষি ও মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

'দৈনিক যুগান্তর প্রকাশিত অজিত কুমার চক্রবর্তীর 'গোসাবা' সম্পর্কে একটি বিবরণে আছে ঃ

একেবারে হাত বাড়ালেই গোসাবা। প্রথমে ট্রেন, তারপর মোটর-লঞ্চ। সঙ্গে কাচ্চা-বাচ্চা থাকলে নিদারুণ খুশি হবে, কারণ এক যাত্রায় ডবল যাত্রাসুখ কদাচ ভাগ্যে ঘটে। সবচেয়ে বড় কথা পকেটে প্রায় হাতই পড়বে না। গোসাবা

থেকে কলকাতা যাতায়াত দশ টাকারও কম। বাড়তি সুবিধেঃ মাঝপথে ক্যানিং বন্দরটিকে চোখ ভরে দেখে নেওয়া যাবে। পায়ের চিহ্নও রাখতে হবে ঐ ক্যানিংয়ে। সকালের দিকে ক্যানিং-এর অনেকগুলো ট্রেন আছে পর পর ; সাড়ে পাঁচ, তারপর সাত তারপর এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রায়। যেটাতে খুশি উঠতে পারেন। তেমন ভিড় থাকে না। বসে যেতেই পারবেন। ভাড়া মাত্র এক টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা। বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে দেখবেন ট্রেন ছাড়তেই তাদের হৃদয় নাচতে সুরু করেছে। রেলগাড়ির ঝমাঝম শব্দ তাদের পাগল করবেই। ভাল হয় সকালে স্নান করে বড় ব্রেকফাস্ট কিংবা আগাম-লাঞ্চ খেয়ে আসা। ট্রেনে ভাল সবেদা পাবেন। কম দাম, খেতে ভাল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্যানিং। ইলেকট্রিক ট্রেন, কয়লা বালির ভয় নেই। এগারটার মধ্যে মোটর লঞ্চ ধরতে হবে। হাতে সময় থাকলে ক্যানিং শহরটা ঘুরে দেখতে পারেন। বাজার, বিশেষ করে, মাছের বাজারটা খুব বড়। বয়স্ক লোকেরা বাজার দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। হোটেল রেঁস্তোরার অভাব নেই। মাছ ভাত খেতে পারেন আবার মিষ্টি ওমলেট ইত্যাদিও. খাওয়া হয়ে গেলে মাতলা নদীর ধার দিয়ে হেঁটে লঞ্চ ঘাটে যেতে হবে। মিনিট দশেকের পথ—এটুকু আপনাকে হাঁটতেই হবে। তবে যদি চান, কুলি পাবেন। হাতে সময় না থাকলে আগে লঞ্চ ঘাটে চলে আসুন। এখানে একটা ভাল রেঁস্তোরা আছে। কোন খেলার রিলে থাকলে ওখানে বসে শুনতে পারেন। নইলে বিবিধ ভারতী মারফৎ ফিল্মি গান।

লঞ্চে উঠতেই মনটা ভরে যাবে। উপরে কেবিন আছে, নিচে সাধারণ ব্যবস্থা। উপরে ভাড়া কিছু বেশি ; নিচে একটাকা পঁচাত্তর, উপরে দু টাকা ষাট। কেবিনে যা জায়গা আছে জনা সাতেকের একটি দলের পক্ষে যথেষ্ট। পা ছড়িয়ে বসে যাওয়া চলে। যাঁরা চান, বসে বসে দাবা-তাস-পাশা খেলতে পারেন। বাচ্চারা ডেকে গিয়ে মাতলা নদীর দু দিকের দৃশ্য প্রাণ ভরে দেখতে পারে।

একটু পরেই সুরু হল সুন্দরবন। মাতলা নদীর দুধারে জঙ্গল অঞ্চল হেতাল বাইন প্রভৃতির অরণ্য। মাতলা বেশ বড় নদী। তাকালেই জেলেদের দেখা যাবে। তারা মাছ ধরছে তো ধরছেই। কপালে থাকলে দু-একটা কুমির কিংবা হরিণ চোখে পড়ে যেতে পারে। সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে গোসাবার পৌঁছে যাবেন।

গোসাবায় হ্যামিলটন এস্টেট আর সেচ দপ্তরের বাংলো আছে। ওঁদের লিখে আগে থেকে রিজারভেসন করে নিতে হবে। হ্যামিলটন এস্টেট বাংলোটা দিতে চান না।

অন্য কোথায়ও ওঁরা থাকার ব্যবস্থা করেন। যাঁরা চান, তঁদের জন্য খাবার ব্যবস্থাও। তবে হোটেল এবং রেস্তোঁরা অনেক আছে। দু-একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থাও আছে। তবে সে-ব্যবস্থায় অনেকেরই হয়তো মন ভরবে না। এস্টেটের আতিথ্য গ্রহণ করলে থাকার জন্য আড়াই টাকার মত পড়বে। খাবার ব্যবস্থা নিজেদের। হোটেলও আছে। এস্টেটের খাওয়া খেলে এক বেলার জন্য টাকা তিনেক।

বাজারে মুড়ি আর গুড় খুব সস্তা। কলকাতার তুলনায় সস্তা ডিমও। ভাল জিলিপি পাবেন বাজারে। চিড়েও সস্তা। বেগুন ভাজা আর জিলিপি দিয়ে ভাল জলযোগ বেশ সস্তাতেই হতে পারে। নিজেরা যদি রান্নার দায়িত্ব নেন, বাজারে সস্তায় ভাল মাছ আর মুরগি পাবেন, তরকারিও। কই, পার্শে, চিংড়ি, ভিটকি প্রভৃতি মাছই বেশি। যারা রকমারি খেতে ভালবাসেন, তাঁদের অসুবিধের কোন হেতু নেই। দুদিন মুখ বদলে যেতে পারেন।

গোসাবা একেবারে অন্য জগত। কলকাতার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। ইলেকট্রিসিটি নেই, বলতে গেলে রাস্তাও নেই। গাড়িঘোড়া—এমন কি সাইকেল কিংবা হাতেটানা রিক্‌শাও নয়। শ্রীচরণ সম্বল করে আসতে হবে।

তবে অজ পাড়াগাঁ ভাববেন না। বেশ ছিমছাম সুন্দর পরিকল্পিত পল্লী। সাজানো গোছানো। ইংরেজ ধনকুবের স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটন বর্তমান শতাব্দীর সুরু-তে এই এলাকাটির পত্তন নেন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা করেন, হ্যামিলটন সাহেব ঠিক সেই রকম করেই গোসাবা অঞ্চলকে গড়ে তোলেন। একটা গঞ্জে বিরাট ঝিল, তার দুপাশে গাছের সারি আর সুন্দর রাস্তা দেখলেই বোঝা যাবে গোসাবা সাধারণ গ্রাম নয়। হ্যামিলটন সাহেবের সাধনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবে। একজন ইংরেজ কিভাবে এদেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের গরিব আর অশিক্ষিত মানুষদের শিক্ষিত আর স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কি করেছিলেন তা নিজের চোখে দেখতে পারেন। শুনতে পাবেন, তাঁর সাধনার প্রায়-অপমৃত্যুতে স্বাধীন ভারতের সরকারের অবদানের কথা। সমবায় ব্যাংক খুলে স্থানীয় চাষীদের তিনি সুদখোরদের শোষণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সমবায় বিপণি খুলে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দেন নি। সমবায় চালের কল, গভীর নলকূপ, স্কুল, হাসপাতাল, কৃষিগবেষণা প্রভৃতি অনেক-কিছুই তিনি করেছিলেন। ইতিহাস শুনে বর্তমান অবস্থাটা মিলিয়ে নিতে পারবেন।

এস্টেট কর্তৃপক্ষ সামান্য ফী-তে আপনাকে মাছ ধরতে দেবেন। সামান্য অর্থে আপনি

সবান্ধবে নৌকো বিহারে যেতে পারেন। নারায়ণতলায় একটা বহু পুরাতন মন্দির আছে। প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা চিন্তার খোরাক পেয়ে যাবেন।

নৌকা কিংবা এস্টেটের ইঞ্জিনচালিত নৌকো করে সুন্দরবনের ভিতরে যাওয়া চলে। সজনেখালিতে কিংবা হলদিতে বাঘ হরিণ আর কুমির আর অনেক রকমারি পাখি দেখা যায়। তবে সুন্দরবনের ভিতরে গেলেই পারমিট নিতে হবে। সেজন্যই জনাপ্রতি পাঁচ টাকা যাবে। আগে ছিল এক টাকা, সরকার সম্প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

যাঁরা অত ঝামেলা পছন্দ করেন না তাঁরা সরকারী লঞ্চ 'মধুকর'-এ সুন্দরবন যেতে পারেন। ক্যানিং পেঁছোনোর পর মধুকর-এ উঠতে হবে। দক্ষিণা পঁয়তাল্লিশ টাকা। সে তো যাওয়া আর আসা। গোসাবাতে যদি দুটো দিন থাকতে চান, তাহলে হ্যামিলটন এস্টেটকে লিখুন। ওঁরাই সব ব্যবস্থা করে দেবেন;

সর্বাঙ্গ ঘিরে আধুনিকতা।

করঞ্জালি। কাঁটাবেনিয়া

ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ যাওয়ার পথে পড়ে করঞ্জালি ও কাঁটাবেনিয়া গ্রাম। এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটিতে চোখে পড়ে পুরনো বাড়ির ভগ্নস্তূপ। তার মাঝে নতুন বসতি। গ্রামীন জীবনের ছাপ সর্বত্র স্পষ্ট। গ্রাম দুটিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল একসময়। কাঁটাবেনিয়ায় আছে পার্শ্বনাথ। আর কুলপীর ঘণ্টেশ্বরী গ্রামে আছে আদিনাথ, যা জৈন প্রভাবকেই স্পষ্ট করে তোলে। সেন ও পাল আমলের বিষ্ণু, বাসুদেব ও গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। বাবাঠাকুর, শীতলা, পঞ্চানন, ওলাইচণ্ডী, বিবিমা, গাজীসাহেব, বিশালাক্ষী দেবী সর্বত্র পূজিত। করঞ্জালিতে গোষ্ঠযাত্রা হয় বৈশাখের ১ তারিখে। গ্রাম দুটি সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন: "করঞ্জালি-কাঁটাবেনিয়া অঞ্চলের চারিদিক থেকে যে-সব পাথরের দেবদেবীর মূর্তি, দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, করঞ্জালি ও কাঁটাবেনিয়া অঞ্চলের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। সাত-আট শত বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ সেন ও পালরাজাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেই ইতিহাসের জের টানা যায়। দেবদেবীর মূর্তির অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্তি, বাসুদেবমূর্তি, গনেশ মূর্তি। করঞ্জালির ঘোষদের বাড়িতে কয়েকটি মূর্তি এখনও আছে দেখলাম। করঞ্জালির পাশে দামোদরপুরে এইরকম কয়েকটি মূর্তি গ্রামের লোকেরা পূজা করেন। কাঁটাবেনিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তিকে বিশালাক্ষী দেবীর পাশের ঘরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা হয়। এত সুন্দর নিখুঁত পার্শ্বনাথের মূর্তি এই অঞ্চলে দেখিনি।

জৈন পার্শ্বনাথ ক্রমেই চব্বিশ পরগণার প্রধান গ্রামদেবতা পঞ্চানন ঠাকুরের শক্তি ও গুণের আধার হয়ে উঠেছেন। পুত্র-কামনায় তাঁর ঘরের দরজায় ও জানলার গরাদে খুট বাঁধা হয়। করঞ্জলি গ্রামের মধ্যেই ইতস্তত বড়-বড় কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভ পড়ে আছে দেখলাম। পাথরের গায়ে ছোট মূর্তিও খোদাই করা আছে। মনে হয় প্রাচীন কোনো মন্দিরের দ্বারফলক। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে বোঝা যায়, মুসলমান-পূর্ব হিন্দুযুগেও করঞ্জলি ও কাঁটাবেনিয়ার গ্রামাঞ্চল সভ্যতার বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। হয়ত প্রাচীন খাড়িমণ্ডল বা পূর্ব খাড়ির অন্তর্ভুক্ত ছিল করঞ্জলি-কাঁটাবেনিয়া দামোদরপুর।'' (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি ।। তৃতীয় খন্ড ।। পৃঃ ২৬৫-২৬৬)।

বড়াশী

কলকাতা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মথুরাপুর স্টেশন থেকে কিছু দূরে বড়াশী মাধবপুর গ্রামে বিখ্যাত চক্রতীর্থ এবং তার কাছেই ছত্রভোগে ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবীর মন্দির।

বড়াশী গ্রামের বদরিকানাথ শিবমন্দিরটি দেখতে তারকেশ্বরের মন্দিরের মত। মন্দিরের কাছের পুকুরটি পরিচিত শিবকুণ্ড নামে। সন্তান কামনায় বিবাহিতা নারীরা এখানে পূজা দেন। বদরিকানাথের প্রাচীন নাম অম্বুলিঙ্গ। কাছ দিয়ে প্রবাহিত ছিল গঙ্গা। অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির ছিল গঙ্গার ধারে। ঘাটটি ছিল অম্বুলিঙ্গ ঘাট নামে পরিচিত। চৈতন্যভাগবতে ছত্রভোগ ও অম্বুলিঙ্গ ঘাটের উল্লেখ আছে। শান্তিপুর থেকে পুরী গমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব অম্বুলিঙ্গ শিবদর্শন এবং অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করেন। ছত্রভোগের ফৌজদার রামচন্দ্র খাঁ এখান থেকে নৌকাযোগে তাঁকে পুরী যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

মন্দিরটি আটচালা ও দক্ষিণমুখী। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে গৌরীপট্ট সহ বদরিকানাথ শিবলিঙ্গ। শিবরাত্রি ও চড়কের উৎসবে বহু ভক্তের আগমন ঘটে। চড়ক মেলা বসে দুদিন। মন্দিরে নিত্য সেবার জন্য দেবোত্তর জমি দিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দী এবং জমিদার বরদাকান্ত রায়চৌধুরী। জনশ্রুতি, এই রায়চৌধুরী মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

গ্রামটির নাম বর্শাভঙ্গ। যা থেকে হয়েছে বড়াশী। কিন্তু এই বর্শাভঙ্গ নামকরণ নিয়ে প্রচারিত জনশ্রুতি হলঃ নবাব আলিবর্দী দেবমাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য একবার গাজন উৎসবে উপস্থিত হন। তিনি তীক্ষ্ম বর্শা মাটিতে পুঁতে দেন

এবং তার ওপর সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দিতে বলেন। স্বয়ং মহাদেব শঙ্খচিলের বেশ ধরে সন্ন্যাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। শঙ্খচিলের নির্দেশ পেয়েই সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দেন বর্শার ওপর। বর্শা ভেঙে যায়। যা থেকেই গ্রামের নাম হয় বর্শাভঙ্গ।

বদরিকানাথ মন্দিরের কাছেই ভাগীরথী গর্ভে নন্দা পুষ্করিণী বা চক্রতীর্থ বর্তমানে একটি সাধারণ পুকুরের রূপ পেয়েছে। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি বাঁধান ঘাট ও তীরে দুটি মন্দির আছে। "কথিত আছে, শিবের সহিত গঙ্গার মিলন কালে জলস্রোতের গর্জন স্তব্ধ হইলে অগ্রগামী ভগীরথ সংশয়াকুল চিত্তে পুনঃপুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন; তখন গঙ্গাদেবী স্বকরস্থিত জ্যোতির্ময় চক্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখান। শিবগঙ্গার মিলনস্থলে এই চক্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া ঐস্থান চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে নন্দা বলে। এই জন্য চক্রতীর্থের আর এক নাম নন্দা। ...ভারতের অন্যান্য স্থানেও "চক্রতীর্থ" এই নামের তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরী, কাশী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনেও এক একটি চক্রতীর্থ আছে। এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে পুরাণ বর্ণিত চক্রতীর্থ ছত্রভোগেই অবস্থিত। তাঁহারা বলেন যে গঙ্গা, সঙ্কেত-মাধব, অম্বুলিঙ্গ শিব ও ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি—এই চতুর্ব্যূহ মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্য প্রাচীন ছত্রভোগই প্রকৃত চক্রতীর্থ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য কর্মফলে অতি দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া মহাপাতকের ভাগী হন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিয়াও তাঁহার পাপক্ষয় হইল না। তখন শিবের নির্দেশমত চক্রতীর্থে স্নান করিয়া তিনি মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। কথিত আছে, শুক্রাচার্য যে দিন এইস্থানে স্নান করেন, সেদিন নন্দাতিথির সহিত শুক্রবারের সংযোগ ঘটিয়াছিল। এই বিশেষ যোগের নাম ভৃগুনন্দা। এখনও যদি চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি শুক্রবারে হয় তাহা হইলে এখানে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়।" (বাঙলায় ভ্রমণ। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ১৮৪-৮৫)। প্রতিবছর চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে নন্দাস্নান উপলক্ষে বড়াশী-মাধবপুরে বহু যাত্রী সমাগম হয় এবং মেলা বসে সাতদিন রায়দীঘি সড়কে। বদরিকানাথ মন্দিরের সামনে গোষ্ঠযাত্রা উৎসব আকর্ষণীয়। বৈশাখের ১০ তারিখে এই উৎসব হয়।

নন্দাপুকুরের সামান্য দূরে সিংহবাহিনী, ত্রিনেত্রা, দ্বিভুজা, পীতবর্ণা নারায়ণী দেবী মূর্তিও বিখ্যাত। নন্দাস্নানের যাত্রীরা এই দেবীমূর্তি দর্শন করেন।

নারায়ণী মন্দিরের কাছেই ধপধপির দক্ষিণরায়ের অনুরূপ যোদ্ধৃমূর্তির মতই একটি ছোট দক্ষিণরায়ের মন্দির আছে। মূর্তির হাতে আছে বন্দুক।

বড়াশী গ্রামের মধ্যেই মাধবপুর। জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে ছিল কষ্টিপাথরের রমণীয় চার হাত বিশিষ্ট বিষ্ণু মূর্তি সঙ্কেত মাধব বিগ্রহ। এখন সেই বিগ্রহ নেই, মন্দিরও নেই। তবে শ্মশানের কাছে একটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে। অনেকের বিশ্বাস এখানেই ছিল মাধব মন্দির। আর মন্দিরে ছিল সঙ্কেত মাধব বিগ্রহ। মাধববিগ্রহ জয়নগর মজিলপুরের দত্তরা কিনে নিয়ে যান। মন্দিরের ভগ্নস্তূপের কাছেই দুটি পুকুরের নাম হল 'চালধোয়া' পুকুর এবং 'ভোগধোয়া' পুকুর।

কাশীনগর

বড়াশীর কাছেই কাশীনগর গ্রামের পঞ্চাননের মন্দির ও মাইবিবির মন্দির বিখ্যাত। পঞ্চাননের মন্দির টিনের চালাযুক্ত। স্থানীয় দ্বারিকানাথ বাগ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাননের সিমেন্টে তৈরি মূর্তিটি বেশ বড়। হাঁটু মুড়ে সামনের মাটিতে ভর দিয়ে তিনি বসে আছেন। তাঁর বাহন প্যাঁচা। পঞ্চাননের বিগ্রহের পাশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মনসা, শীতলা ও জ্বরাসুরের বিগ্রহ আছে।

কাশীনগর বাজারের কাছে রায়দীঘি রোডে মাইবিবির মন্দির। বাজার প্রতিষ্ঠার আগেই এখানে ছিল মাইবিবির থান। এখানকার জমিদার বরদাকান্ত রায়চৌধুরী বাজার প্রতিষ্ঠা করার পর সেটি মাইবিবির বাজার নামে পরিচিত হয়। আগে দেবী ছিলেন চালা ঘরে। বর্তমান মন্দির ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেন মণিলাল নন্দী ও ভদ্রেশ্বর নন্দী। প্রতিদিন পূজা হয়। মাঙ্গণ পূজা হয় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে। দেবীর কাছে কলেরা ও বসন্ত রোগ প্রতিরোধে ধর্ণা দেওয়া হয়। দেবীর মূর্তি উপবিষ্টা আকারে—ডান পা ঝুলিয়ে রাখা, বাঁ পা মুড়ে রাখা হয়েছে ডানপায়ের হাঁটুর ওপর। দেবীর পাদুকাবৃত চরণ, মাথায় আছে মুকুট। দেবীর এই মূর্তি মাটির তৈরি। তাঁর কয়েকটি শালন মূর্তিও আছে।

মাইবিবি বাজারের কাছে খাড়ির ধারে একটি পুরনো শিবমন্দির আছে। মন্দিরের সামনে ঘাট। স্নান ঘরও আছে।

ছত্রভোগ

এককালে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। স্নানযাত্রার সময় ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড় হয়। অনেকের বিশ্বাস এটি শক্তিপীঠ। বড়াশী গ্রামের বদরিকানাথ

মহাদেব হলেন তাঁর ভৈরব। ছত্রভোগের উত্তরপূর্ব দিয়ে প্রবাহিত ছিল আদিগঙ্গা। সেই গঙ্গা ধানক্ষেতের রূপ নিয়ে আজও বর্তমান।

ত্রিপুরাসুন্দরী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা ও ত্রিনয়নী। বস্ত্রপরিহিতা ষোড়শী মূর্তির মাথায় শোলার মুকুট। মন্দিরের ভিতরে লাল কাপড়ে জড়ান দেবীযন্ত্র পুরোহিত ব্যতীত অন্য কেউ দর্শন করতে পারেন না। মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। একটি বৃহৎ মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহ ছিল। সেই মন্দির বিনষ্ট হওয়ার পর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন কাকদ্বীপের ঈশানচন্দ্র কর্মকার। দেবীর নিত্য পূজা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় হয় যাত উৎসব। পূর্ণিমার আট দিন আগে থেকেই শুরু হয় উৎসব। বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ি থেকে আসে নৈবেদ্য। মেলা বসে উৎসব উপলক্ষে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এই প্রাচীন সমৃদ্ধশালী জনপদ সম্পর্কে কালীদাস দত্ত লিখেছেন ঃ…"খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে সেখানে একরাত্রি কীর্তনানন্দে যাপন করেন। সেকারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকটও উহা একটি তীর্থক্ষেত্র বিশেষ।…চৈতন্য ভাগবতাদি পুরাতন বাংলা গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে উহা আয়তনে অনেক বড় ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং এখন উহার উত্তরে জলঘাটা ও দক্ষিণে কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কাটানদীঘি, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর প্রভৃতি যে সকল গ্রাম আছে সেগুলিকেও লোকে তখন ছত্রভোগ বলিত। অধুনা কাশীনগরের প্রায় তিন-চার ক্রোশ দক্ষিণে, ২২ নম্বর লাটের শেষ সীমায় ছুতরভোগ নামে একটি নদী আছে। পূর্বে উহারও নাম ছিল ছত্রভোগ নদী। উহা হইতে বোধ হয় প্রাচীনকালে দক্ষিণে ঐ নদী পর্যন্ত ভূভাগ ছত্রভোগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।… বিস্তীর্ণ ছত্রভোগ নগরের সমৃদ্ধির কারণ ছিল উহার উত্তর ও পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গা নদী। উহার শুষ্ক খাদ এখনও সেখানে মজাগঙ্গা বা গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বর্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কতকগুলি মনসার ভাসান ও চণ্ডীর গানের পুঁথি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর উপর ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধ বন্দর রূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লোকে তখন ভাগীরথী-পথে ঐ স্থান দিয়াই সমুদ্রে যাতায়াত করিত।

"ছত্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকারে আসিবার পূর্বেও যে সেখানে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল তাহা জানা যায় সেখানকার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত পাল ও সেন রাজগণের আমলের অনেকগুলি কালো প্রস্তরের

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং কয়েকটি কারুকার্যমণ্ডিত দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি হইতে। প্রাচীন ছত্রভোগ নগরের স্থান এখন জলঘাটা, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর ও বড়াশী প্রভৃতি নামে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম অধিকার করিয়া আছে। ঐ সমস্ত গ্রামেই ভূগর্ভ খননকালে কিছু কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক প্রাচীন গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং কয়েকটি দেবতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।…মুসলমান আমলের শেষ ভাগে কি জন্য ছত্রভোগের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং উহা একটি নগন্য পল্লীতে পর্যবসিত হয় তাহা অজ্ঞাত। প্রবাদঃ ভাগীরথী নদীর অন্তর্ধান ও ঠগ, পর্তুগীজদের অত্যাচারই উহার কারণ। পরে সেখানে নীলকরেরা ঘাঁটি স্থাপন করে। উহার নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি নীলপ্রস্তুত করিবার গৃহ ও চৌবাচ্চার ধ্বংসাবশেষ এখনও ছত্রভোগ ও কাটানদীঘিতে দেখিতে পাওয়া যায়।" (ছত্রভোগ—কালীদাস দত্ত। প্রবাসী। মাঘ। ১৩৫৯)।

খাড়ি

খাড়িগ্রাম যাওয়া যায় মথুরাপুর রোড স্টেশন থেকে অথবা কলকাতা থেকে বাসে। মথুরাপুর রায়দীঘি রোডের দক্ষিণে কাশীনগর মাইবিবির হাট, উত্তরে খাড়িগ্রাম। উনিশ শতকে লিখিত হাণ্টারের বিবরণে আছে—

Khari—area 10·96 square miles. A small fiscal Division, situated in the south-east corner of North Hatiagarh, and bordering on the Sunderbans. The principal village is Khari which contained a church and an English school in 1857."

মুসলমান রাজত্বের আগে সেন আমলে এই অঞ্চল ছিল খাড়ি মণ্ডলের অন্তর্গত। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ও মথুরাপুর থানার অন্তর্গত খাড়ির পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল গঙ্গা। তারই একটি শীর্ণ শাখা এখনও বর্তমান। অনেকের অনুমান গঙ্গার খাড়ি থাকার কারণে খাড়ি নামে পরিচিত। আবার কেউ কেউ বলেন বিপুল সংখ্যক খাড়াশীর বাস ছিল এখানে। তারা লবণ তৈরি করত। ঐ খাড়াশী থেকে খাড়ি শব্দের উদ্ভব। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের চৌষট্টি পীঠের একটি হিসাবে খাড়ির উল্লেখ আছে। ২২ নম্বর লাটের একটি পুকুর খননকালে লক্ষণ সেনের যে তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তাতে উল্লেখ আছে খাড়ি মণ্ডল ছিল পৌণ্ড্রবর্ধণভুক্তির অন্তর্গত। এই সব মণ্ডল ছিল ৩২০০ মাইল বিস্তৃত। সুতরাং সুন্দরবনের

পশ্চিমাংশের একটি বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে ছিল খাড়ি মণ্ডল। জঙ্গল হাসিলের সময় প্রাচীন গৃহের ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, দেবদেবীর ধাতব ও মৃন্ময় মূর্তি, বাসন কোসন, দুর্গের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন আকারের বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে।

খাড়ি গ্রামটি ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতজন একমত নন। কেউ বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ; আবার অনেকের অভিমত, গঙ্গার পথ পরিবর্তন। কারণ যাই হোক না কেন, খাড়িগ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুন্দরবনাঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে প্রাচীন ইতিহাসের বহু উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। খাড়িগ্রামে বড়খাঁ গাজির আস্তানা, নারায়ণী মন্দির, হরিমন্দির, রাধাবল্লভ জীউ মন্দির আছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি খুবই প্রাচীন।

বড়খাঁ গাজির মূর্তি কাঠের তৈরি। ঘোড়ার পিঠে তিনি উপবিষ্ট। যোদ্ধাবেশী গাজী সাহেবের মাথায় পাগড়ী, মুখে দাড়ি এবং পায়ে জুতো। একটি পুকুরের ধারে ইটের ঘরে গাজির অবস্থান। মূর্তিটি মানুষের সমান মাপের। ঘরের মধ্যে বিবিমার থান ছাড়াও আছে বড়খাঁ গাজী ও বিবিমার শালন মূর্তি। নিত্য পূজার ব্যবস্থা না থাকলেও, সুন্দরবন যাত্রী কাঠুরে ও মউলিরা প্রায়ই পূজা দিতে আসে। তাছাড়া চক্রতীর্থে আগত পুণ্যার্থীরা স্নান সেরে এখানেও পুজো দেন, মানত করেন। স্থানীয় জমিদার মিত্র পরিবার গাজির সেবার জন্য কিছু পরিমাণ জমি দান করেছিলেন। জমি তারা দিয়েছিলেন দেবী নারায়ণীকেও।

বড়খাঁ গাজির আস্তানা পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে এবং নারায়ণী মন্দির পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে। বস্ত্র ও অলঙ্কার সংযুক্তা দেবী নারায়ণী ত্রিনয়নী ও চতুর্ভুজা। তিনি সিংহবাহিনী। দেবীর বেদীর ওপর নারায়ণ শিলা ও বড়খাঁ গাজির মূর্তি আছে। মন্দির স্থানটি নারায়ণীতলা নামে পরিচিত। নারায়ণী মন্দিরের কাছে ছিল একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির। ধ্বংস হয়ে গেছে। বৈষ্ণবদের হরি-মন্দিরের অবস্থা একই।

হরিমন্দির ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন হরিপদ পাল। মন্দিরে পার্ষদসহ ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি আছে। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ওপর ১৯৫৬ সালে রাধাবল্লভজীউ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মাখনচন্দ্র নস্কর। কাঠের মঞ্চে কৃষ্ণপাথরের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্বেতপাথরের রাধা বিগ্রহ অবস্থিত। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর

কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে একজন অন্ধ বৈষ্ণব সাধকের মন্দির আছে। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁর অনুরাগী শিষ্য সংখ্যা কম ছিল না। তাঁর দেহরক্ষা হলে, ভক্তরা

গ্রামে সমাধিস্থ করে তাঁর মরদেহ। একটি চালাঘর তৈরি করে তার ভিতর অন্ধমুনির ব্যবহৃত খড়ম সযত্নে রেখে দেয়। নিত্যপূজার ব্যবস্থা হয়। দক্ষিণ বারাসাতের বিদ্যাসুন্দরী দেবী বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন ১৩৪৭ সালে। অন্ধমুনির সিমেণ্টের মূর্তি ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন বড়াশী গ্রামের দেবেন নাইয়া। চক্ষু রোগের নিরাময়ের জন্য প্রতিদিন বহু মানুষ এখানে আসে। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে নিয়মিত কীর্তন গান হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে উৎসব এবং মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে মহোৎসব হয়। মহোৎসবের সময় মেলা চলে তিন চারদিন।

মথুরাপুর থানার উত্তর গোবিন্দপুর ও গিলার ছাট দুটি সমৃদ্ধ গ্রাম। নানা শ্রেণীর হিন্দুর বাস এখানে। উত্তর গোবিন্দপুরে গোষ্ঠযাত্রা উৎসব, দক্ষিণ রায়ের বার্ষিক উৎসব (পৌষ) এবং বুড়াশিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে দক্ষিণ রায়, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, গাজী, সাতবিবি, মনসা, শীতলা, মহাদেব রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছে। গিলার ছাটে নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে (৫ দিন)।

খাড়ি ফৌজদার তলায় সর্ব মঙ্গলাদেবীর বার্ষিক পূজা হয় চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে। একটি মেলা বসে (৬।৭ দিন)।

লক্ষীকান্তপুর

সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলের অন্তর্গত লক্ষীকান্তপুর থেকে প্রচুর ধান ও বিচালী রপ্তানি হয়। এখান থেকে রাস্তা চলে গেছে কাকদ্বীপ পর্যন্ত। লক্ষীকান্তপুরের ছয় মাইল দূরে ভাগীরথী তীরে কুলপী গ্রাম।

পাথর প্রতিমা

চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে পাথর প্রতিমা মূলভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগবিহীন কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। চব্বিশ পরগণার অন্যান্য অংশের সঙ্গে এখানকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য চোখে পড়বার মত। অন্যতম কারণ, এখানে যারা বসতি করেছে, তাদের বেশির ভাগই মেদিনীপুর থেকে আগত। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা এখানে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। নৌকা হল মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার মাধ্যম। অঞ্চলটি একসময় সুন্দরবনের গাছপালাসহ ছিল জঙ্গলময়। বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ছিল। জঙ্গল হাসিলের সময় পুকুর খুঁড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ও পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া গেছে।

পাথর প্রতিমার বিখ্যাত চন্দনী মেলা অনুষ্ঠিত হয় কামদেবপুর গ্রামে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায়। মেলা চলে তিন চারদিন। শিব ও রাধাকৃষ্ণ এবং বিশালাক্ষী ও শীতলা মন্দির আছে। গোষ্ঠযাত্রা, রাসযাত্রা ও মনসা পূজা হয় সাড়ম্বরে। কামদেবপুরে একটি পুকুর কাটার সময় মাটির নিচে একটি ইট বাঁধানো মন্দির, মাটির পাত্র ও পুকুর ঘাট পাওয়া গেছে। জনশ্রুতি, মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন কামদেব প্রধান। তিনি জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলেন। স্থানীয় জনগণ তাকে ভোলে নি। তাকে স্মরণ করেই গ্রামটির নামকরণ ঘটে। এই গ্রামে কিছু সাঁওতালের বাস আছে।

লাটদার দিগম্বর নন্দীর নাম থেকে একটি গ্রামের নাম হয়েছে দিগম্বরপুর। মথুরাপুর স্টেশন থেকে বাসে রায়দীঘি হয়ে নৌকায় যেতে হয় এই গ্রামে। একটি নারায়ণী মন্দিরে আছে নারায়ণীর পিতলের মূর্তি। নারায়ণী পূজার সময় তিন দিন মেলা বসে। তাছাড়া এই গ্রামে রক্ষাকালীপূজা ও দোলযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীধরনগর গ্রামটিতে গঙ্গা পূজা, দোল উৎসব, বিশালাক্ষী পূজা, চন্দনমাতা পূজা, কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুন মাসে বিশালাক্ষী পূজায় মেলা বসে। চেতলার জমিদার রাখালদাস আঢ্য তাদের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউয়ের নামানুসারে এখানকার লাটে গ্রামপত্তন করেন। শ্রীধরজীউয়ের নাম থেকেই গ্রামটি হয়েছে শ্রীধরনগর।

জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ হাজরার নাম থেকে হয়েছে ইন্দ্রপুর গ্রাম। গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দিরে মাঘী পূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসবে আশপাশের বিপুল সংখ্যক মানুষ আসে। পূজা হয় তিন দিন। শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় গোষ্ঠযাত্রা। এই গ্রামে একটি ভদ্রকালী মন্দির রয়েছে।

কাকদ্বীপ

মূলত কৃষি প্রধান এলাকা হলেও, নাগরিক জীবনের প্রভাব অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু বেশি। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে জনবসতি। তার মধ্যে আছে কৃষক, গোয়ালা, নাপিত, তাঁতী, বৈরাগী, বাগদী, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, ছুতার, কাওরা, কুমার, নমঃশূদ্র, মুচি, ধোপা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি।

মন্মথপুর গ্রামে আটেশ্বর শিবপূজা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন অনুষ্ঠিত

হয়। এই গ্রামে নয়টি শীতলা ও পাঁচটি মনসার থান আছে। সীতারামপুর অঞ্চলের জমিদার ছিলেন কুলপী থানার বেলপুকুরের জয়নারায়ণ পাত্র। তাদের গৃহদেবতা সীতারামজীউয়ের নাম থেকেই গ্রামটি সীতারামপুর নামে পরিচিত। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ রোড। তিন মাইল পশ্চিমে হুগলি নদী। পাশের শম্ভুচন্দ্রপুর ঘাট থেকে নৌকায় যাতায়াত ও মালবহন চলে। এই গ্রামে মন্দির সংখ্যা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির তুলনায় অনেক বেশি। পঞ্চানন্দের দুটি, বিশালাক্ষীর তিনটি, একটি হরিমন্দির রয়েছে। সারা বছর পূজাপার্বণ লেগে থাকে। হরি মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব হয় ফাল্গুন মাসে।

মাধবনগর নাম হয়েছে স্থানীয় জমিদার মাধব দত্তর নাম থেকে। একটি জীর্ণপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির আছে এখানে। নির্দিষ্ট থানে অবস্থান করছেন গাজীসাহেব, পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসা। ১ বৈশাখ থেকে গোষ্ঠযাত্রার উৎসব শুরু হয়। সাতদিন ধরে উৎসব চলে।

মণিপুর গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গা পূজা ও উৎসব হয় সাত দিন। মেলাও চলে সাতদিন। গঙ্গা দেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করেন স্থানীয় জমিদার মনীন্দ্রনাথ মাইতি। তিনি ছিলেন কাঁথির কৃষ্ণনগরের মানুষ। গঙ্গা মন্দির নদীর ধারে অবস্থিত। গ্রামে গঙ্গাদেবীর আর একটি সাধারণ মন্দির আছে। এই গ্রামে লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কম নয়। মৃণালনগর গ্রামে একটি মাটির মন্দিরে আছেন বিশালাক্ষী, চণ্ডী ও শীতলা। পঞ্চানন্দ, মনসা ও শীতলার থান আছে।

জটার দেউল

সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কারকালে মণি নদীর তীরে ১১৬ নম্বর লাটে একটি মন্দির পাওয়া গেছে, যার গঠন পদ্ধতি উত্তর ভারতের নাগররীতি অনুসারী। পালযুগে নির্মিত এই মন্দিরকে স্থানীয় লোকেরা বলে জটার দেউল। এটি ছিল শিব মন্দির। শিবের আরেক নাম জটাধর থেকে জটার দেউল হয়েছে। প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় ৯৭৫ সালে মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা জয়ন্তচন্দ্র।

মন্দিরের গর্ভ গৃহে প্রাপ্ত বহু সংখ্যক কঙ্কালকে অনেকে বাঘের শিকার হিসাবেই অনুমান করেন। বর্তমান ভগ্ন মন্দিরটির উচ্চতা ৮০।৮৫ ফুট। এটি সম্ভবত শতাধিক ফুট উঁচু ছিল। চতুষ্কোণ মন্দিরটি প্রতিপার্শ্বে প্রস্থে ৩২ ফুট।

প্রবেশপথের উচ্চতা ১৬ ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ৯ ফুট। ইটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে গর্ভগৃহে নামতে হয়।

১১৬ নম্বর লাটের অন্যান্য অংশ খননকালে পাথর ও ধাতু নির্মিত মূর্তি পাওয়া গেছে। কাছাকাছি অন্যান্য লাটেও ইটের স্তূপ, গড় ও মন্দিরের ভগ্নাংশ রয়েছে। জটার দেউলের পশ্চিমপার্শ্বে ২৬ নম্বর লাটে কঙ্কণ দীঘি খননকালে ইটের তৈরি ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। জটার দেউলের ইট ও এই ধ্বংসস্তূপের ইট একই রকম। এখানে একটি পালযুগের পাথরের সূর্যমূর্তি এবং পাথর ও ধাতুর অন্যান্য মূর্তিও পাওয়া গেছে। অঞ্চলটি যে এক সময় সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। সম্ভবত, জলপ্লাবন, ভূকম্পন বা জলদস্যুদের অত্যাচারে জনপদটি ধ্বংস হয়।

জটার দেউল প্রসঙ্গে কালিদাস দত্তের একটি নিবন্ধে আছেঃ "ঐ মন্দিরের গঠন পদ্ধতি, পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, পালযুগের নগর রীতিতে নির্মিত মন্দিরসমূহের অনুরূপ। উহার গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইষ্টকের আকারও ঐ সময়ে ব্যবহৃত ইষ্টকের ন্যায়। সে কারণ অনেকে উহাকে পালযুগের স্থাপত্য নিদর্শন বলিয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উহার নির্মাণকাল সম্বন্ধে ঐ প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ "Very few temples belonging to the Pala period have survived in Bengal and the only known examples are the temple of Bahulara in the Bankura district and that of Ichai Ghose in the Burdwan district. The deserted temple in the Sundarbans called the Jatar Deul, must also belong the Pala period."

"উহা ব্যতীত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মন্দিরের সন্নিকটে ভূগর্ভ খননকালে প্রাপ্ত একখানি তাম্রপট্ট লিপি হইতেও জানা যায় যে জয়ন্তচন্দ্র নামে জনৈক নৃপতি ঐ যুগেই উক্ত মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ লিপির পাঠ বা কোন চিত্র কোথাও প্রকাশিত হয় নাই এবং এখন উহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত List of Ancient Monuments in Bengal নামক পুস্তকে উহার এইরূপ উল্লেখ আছেঃ "The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1875 that a copper plate, discovered in a place a little to the north of Jatar

Deul fixes the date of the erection of the temple be Raja Jayanta Chandra in the year 897 of the Bengali Saka era corresponding to A D. 975. The copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee Durgaprosad Choudhury. The inscription is in Sanskrit and the date as usual was given in an enigma with the name of the founder."

"উক্ত মন্দির যখন আবিষ্কৃত হয় তখন উহার চতুর্দিকে ইষ্টকের উপর বহুবিধ নক্শাযুক্ত কারুকার্য ও ঐ মন্দিরের অনেক ছোট ছোট replica ছিল। উহার প্রবেশ পথের উপরিভাগে ঐ সমস্ত replica-র দুই একটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আবিষ্কারের পর গৃহীত একটি আলোকচিত্রে ঐ মন্দিরের প্রতিকৃতি আছে। উহা দেখিলে পূর্বে ঐ মন্দিরটি কিরূপ সুষমামণ্ডিত ছিল তাহার ধারণা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্নমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানের দোষে এরূপ অবহেলার সহিত ইহা সংস্কৃত হইয়াছে যে উহার সেই প্রাচীন সৌন্দর্যের আর অস্তিত্ব নাই। দুর্গম স্থানে অবস্থিতির জন্য মন্দিরটি এখনও খুব অবহেলিত অবস্থায় আছে।...গর্ভগৃহের মেঝে ৪ ফিট নিম্নে অবস্থিত। উহা ইষ্টক দিয়া গাঁথা। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেখানে পেঁছান যায়। ঐ গৃহটির চারিকোণে ৭।৮ ফিট উর্ধ্বে, চারিটি ইষ্টক নির্মিত তাক (bracket) আছে। ঐ গুলির উপরে প্রদীপ থাকিত। প্রদীপ শিখার কালদাগ এখনও উহাদের উপরে দেখা যায়।...

"জটার দেউলের পশ্চিম পার্শ্বে ২৬ নম্বর লাটে কঙ্কণ দীঘিতে যে সমস্ত বহুসংখ্যক প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের ইষ্টকের আকারের সহিত জটার দেউলের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইষ্টকের যেরূপ সম্পূর্ণ মিল আছে তাহা দেখিলে কঙ্কণ দীঘির প্রাচীন মনুষ্যবাস জটার দেউলের সমকালীন বলিয়া বুঝা যায়। উক্ত ধ্বংসাবশেষ সমূহের মধ্যে দুইটি ইষ্টক স্তূপও আছে। তন্মধ্যে বড়টি 'পিলখানার বাটি' নামে অভিহিত। উহার সান্নিধ্যে কিছুদিন পূর্বে আমি একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কার করি। উহাও পাল যুগের। ঐমূর্তিটি ভিন্ন পাল যুগের আরও অনেক প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি প্রভৃতি পুরাবস্তু কঙ্কণ দীঘিতে পাওয়া গিয়াছে। "[সংস্কৃতি। ৩য় সংখ্যা। অক্টোবর' ৬৪]

জটার দেউল সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ...মণি নদীর মোহানার কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে 'জটার দেউল' বলে। বহু দূর হইতে এই

দেউল দেখা যায় ; উহার উচ্চতা ৬০।৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবত ইহা একটি বিজয়-স্তম্ভ। ইহার বয়স ৪।৫ শত বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং উহা প্রতাপাদিত্যের আমলের বিজয়স্তম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত আছে, ইহারই নিকটবর্তী বিদ্যাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা একটি নৌযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন। জটার দেউল একটি মৃত্তিকা স্তুপের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহিরের মাপ ৩০´-৯´´×৩০´-৯´´, ভিতর ১০´-৯´´×১০´-৯´´ এবং ভিত্তি ১০ ফুট। উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট। পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহা ৯´-৬´´ বিস্তৃত। দেউলটি পাতলা ইটের গাঁথুনি, আগাগোড়া সুন্দর কারুকার্য-মণ্ডিত, শুধু নিম্নের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিল্পকলা বিলুপ্ত হইয়াছে।" (যশোহর-খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ২০৬-০৭)

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম প্রাচীন মন্দির হল জটার দেউল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণি নদীর পূর্বতীরের বনভূমি পরিষ্কার করে বসতি পত্তনের সময় এই মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। তৎপূর্বে গভীর জঙ্গলে আবৃত এই মন্দিরের গর্ভগৃহে এবং প্রাঙ্গণে ছিল হিংস্রপ্রাণীর বাস। স্থানীয় অধিবাসীরা আজও বিশ্বাস করে যে, জটাযুক্ত একটি নরখাদক বাঘ এই পরিত্যক্ত মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেই কারণেই এই মন্দিরটি জটার দেউল নামে পরিচিত। জটার দেউলের নামকরণ নিয়ে আর একটি ধারণা এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। মন্দিরের আরাধ্য দেবতা ছিলেন জটাধারী শিব, তাই তাঁর নামানুসারেই হয়েছে মন্দিরের নামকরণ। জটার দেউলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পূর্বে কয়েকজন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের ধারণা ছিল যে, এই দেউল প্রকৃতপক্ষে প্রতাপাদিত্যের জয়স্তম্ভ এবং ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই জয়স্তম্ভটি নির্মিত হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং কাশীনাথ দীক্ষিতও মনে করেছিলেন যে, জটার দেউলের প্রতিষ্ঠা মুঘল যুগেই হয়েছে। অবশ্য শ্রীযুক্ত দীক্ষিত কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন যে, এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বর শৈলীর অন্তর্ভুক্ত এবং উড়িষ্যার মন্দিরগুলি নির্মিত হবার অব্যবহিত পরেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার।অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্লাকিস্টোন বলেন যে, মন্দিরটি তেমন পুরাতন নয় এবং সেই হিসাবে এর গুরুত্বও কম।..."

শ্রীমুখোপাধ্যায় মন্দিরটির নির্মাণকাল ও স্থাপত্যরীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা

করে, এটি যে হিন্দুযুগে নির্মিত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এই বিশালায়তন মন্দিরটি ছিল 'অপূর্ব লালিত্যমণ্ডিত' এবং 'বাহ্যিক আকৃতি ছিল বর্তুলাকার'। মন্দিরটি ছিল ত্রিরথধর্মী।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার কাজে হাত লাগাবার আগেই, স্থানীয় জমিদার সংস্কার কাজ শুরু করেন। সংস্কার করার সময় কিছু নিদর্শন মিস্ত্রিরা ভেঙে ফেলে। অবশ্য মন্দিরের ওপরে যে শিখরটি আছে সেটি ঐ জমিদার তৈরি করেন। সংস্কারের সময় বহু অলংকরণ সরিয়ে ফেলা হয়। ১৯০৮ সালে সংস্কারের জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ করে। পূর্ত বিভাগের কর্মীরা টাকা নিয়েও সংস্কার কাজ না করায় মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরেও অবশ্য একই অবস্থা থেকে যায়। বর্তমানেও যে মন্দিরটি ভালো অবস্থায় রয়েছে, তা বলা যায় না। মন্দিরটি সম্পর্কে যত লেখা হয়েছে সে হিসাবে সংরক্ষণে তেমন সরকারী গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

নামখানা/ফ্রেজারগঞ্জ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সর্বদক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। ডায়মন্ড হারবার থেকে লঞ্চে কাকদ্বীপ হয়ে, নৌকায় পৌঁছান যায় নামখানায়। নামখানার বড় রাস্তাটি ফ্রেজার সাহেবের তৈরি।

ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে নারায়ণতলী বা মেকলেনবার্গ দ্বীপ এখন ফ্রেজারগঞ্জ নামে পরিচিত। স্থানটি ভ্রমণবিলাসীদের আকৃষ্ট করে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য। দ্বীপে একটি মিষ্ট জলের ঝিল আছে। বাঙলার গভর্নর স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার দ্বীপটিকে সমুদ্র নিবাস করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্যের জন্য পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ফ্রেজারগঞ্জে রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় পুরানো অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

কলকাতার ইংরেজদের জন্য সমুদ্রনিবাস বা স্বাস্থ্যনিবাস গঠনের এই পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৯০৩ সালে। তখন স্থানটি ছিল জঙ্গলময় এবং বসতি ছিল না। ফ্রেজার স্থানটি পছন্দ করেছিলেন। ১৯০৪-০৫ সালে সরকারী অর্থসাহায্য করেন স্থানটির উন্নয়নে। তখন সুন্দরবনের কমিশনার ছিলেন সান্ডার। তিনি সুন্দরবনের শেষ কমিশনার। তাছাড়া স্বাস্থ্য নিবাস পরিকল্পনার তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। স্কীম অনুসারে জমি পরিষ্কার করে রায়তদের মধ্যে বিলিবন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। ছয়টি ব্লক গঠন করে কাজও শুরু হয়েছিল। নারায়ণতলীর উত্তর থেকে কাজ শুরু করে দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল স্কীমে। কিন্তু সান্ডার দক্ষিণ থেকে কাজ শুরু

করে উত্তরে এগোতে গিয়ে স্বাস্থ্যনিবাস পরিকল্পনার সর্বনাশ করলেন। সরকারের দেড় লাখ টাকা বছর না পেরোতেই শেষ। জমি উদ্ধার হল না তেমন। বাঁধ হল মাত্র চার মাইল। কাজ দ্রুত এগোল না। এ ভাবে চলল ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। খরচের বহর দেখে প্রেসিডেন্সি কমিশনার খেপে গেলেন। তিনি প্রস্তাব নিলেন পরিকল্পনা রূপায়ণের দরকার নেই, উদ্ধার করা জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হোক। ১৯০৯ সালে ভারত সরকার অনুমতি দিলেন। প্রথম জমি লীজ নেন কাশিমবাজারের মহারাজা। বার্ষিক রাজস্ব সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। সময় সীমা চল্লিশ বছর। ১৯১০ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে লীজ কার্যকরী হয়। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট অনুসারে নারায়ণতলীকে গ্রাম ঘোষণা করা হয় ১৯১১ সালের ২১ জানুয়ারি। তিনটি মৌজা নিয়ে গঠিত হল এলাকাটি। তার মধ্যে পড়ল, অমরাবতী, বিজয়বাটি ও লক্ষ্মীপুর আবাদ। লক্ষ্মীপুর আবাদ একেবারে সমুদ্রের ধারে। ফ্রেজারগঞ্জ নাম হয় অনেক পরে। ফ্রেজারগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত আটটি গ্রাম।

অমরাবতী ফ্রেজারগঞ্জের একটি গ্রাম। মকরস্নান উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তিতে তিনদিন মেলা বসে। বিশালাক্ষীদেবীর বার্ষিক পূজা হয় গ্রামে।

সাগরদ্বীপ

পশ্চিম সুন্দরবনের অংশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শেষ সীমান্তে বঙ্গোপসাগরতীরে সাগর দ্বীপ। প্রতি বছর মকরসংক্রান্তি যোগে সারা ভারতের মানুষ এখানে আসে স্নান ও শ্রদ্ধাতর্পণের উদ্দেশ্যে। গঙ্গাসাগর সঙ্গম হিন্দুদের পরম পবিত্রস্থান। এখানে আছে কপিলমুনির মন্দির। পুণ্যস্নান যোগে মন্দিরের পাশে বসে মেলা। এই সর্বভারতীয় মেলায় প্রায় চার লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। কেবল ভারতের বিভিন্ন রাজ্য নয়, ভারতের বাইরে থেকেও আসে মানুষ।

ডায়মন্ডহারবার থেকে সাগরদ্বীপের দূরত্ব চৌষট্টি কিলোমিটার। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নান উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু যাত্রী ও সাধু সমাগম হয়। আয়োজিত মেলায় স্থানীয় লোক-সংস্কৃতির নিদর্শন মাটি ও কাঠের পুতুল, জন্তু জানোয়ারের মূর্তি বিক্রি হয়ে থাকে। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে গঙ্গাসাগরের উল্লেখ আছে। গঙ্গাদেবী, কপিলমুনি, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্তি দর্শন করে যাত্রীরা। কপিল মুনির মন্দিরটি জেলার অন্যতম আকর্ষণ। সাগর দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এসময় যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আগে গঙ্গাসাগর যেতে হত নৌকায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংক্রামক ব্যাধিতে বহু যাত্রী মারা পড়ত। বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাতায়াত সহজসাধ্য হয়েছে। চিকিৎসা ও যাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক স্বাভাবিক হয়েছে।

মেলায় যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীরা এসে সমবেত হয় কলকাতায়। এখান থেকে ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার। লঞ্চ বা নৌকায় হুগলি নদীপথে যায় বহু যাত্রী। বাসে কলকাতা হাওড়া হয়ে কাকদ্বীপ। অথবা ডায়মন্ডহারবার থেকে বাসে কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় পৌঁছাতে হয় সাগরদ্বীপের উত্তরে কচুবেড়িয়ায়। কচুবেড়িয়া থেকে হাঁটাপথে সাগরদ্বীপের মেলা ক্ষেত্রে যাওয়া যায়। কলকাতার শিয়ালদা থেকে স্পেশাল ট্রেন ও বাস এবং হাওড়া থেকে স্পেশাল বাস এবং আউটট্রাম ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, ম্যান অফ ওয়ার জেটি থেকে স্পেশাল লঞ্চ চালু করা হয় প্রতি বছর। জলপথে যাতায়াত নিরাপদ নয় সব সময়, বহু মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও পুণ্যার্থীরা নৌকা ও স্টিমার যোগে সাগর সঙ্গমে যেতে আগ্রহী।

পুণ্যার্থীদের তুলনায় সাধু-সন্তদের আগমন কম ঘটলেও, তারাও এই স্নানযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ। সুদূর হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল থেকে আসেন বহু শত সাধক। বিপুল সংখ্যায় আসেন নাগা সন্ন্যাসী। বিশ্বাস, এই তীর্থে তিনদিন তিনরাত

কাটিয়ে দুদিন স্নান করলেই পুণ্য অর্জন ও সমস্ত পাপমুক্তি ঘটে। তাই সংক্রান্তির দুদিন আগেই সাগরদ্বীপ প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কয়েকদিনের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থাও থাকে পর্যাপ্ত। অস্থায়ী হোগলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে যাত্রীরা। দোকানপাট বসে। রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির জন্য থাকে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। সরকারী অফিস, ডাকঘর, হাসপাতাল, টেলিগ্রাম অফিস, থানা স্থাপন করা হয় অস্থায়িভাবে। সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিশাল বিশাল আচ্ছাদন গড়ে ওঠে। পানীয় জল ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকে যাত্রীদের জন্য। মেলা প্রাঙ্গণে ৪৮ ফুট একটি টাওয়ার হাউস রয়েছে। এখান থেকে সমস্ত মেলা প্রাঙ্গণের ওপর সব সময় নজর রাখা হয়।

কিংবদন্তী, সাংখ্য-দর্শন প্রবক্তা মহামুনি কপিলের আশ্রম ছিল সাগরদ্বীপে। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র কপিলমুনির অজান্তে সেই ঘোড়া চুরি করে বেঁধে রেখে যান তাঁর আশ্রমে। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ঘোড়া খুঁজতে এসে উপস্থিত হন আশ্রমে। মুনিকে তারা অপহরণকারী সাব্যস্ত করে। মুনির অভিশাপে ষাট হাজার সগর সন্তান ভস্মীভূত হয়ে যায়। সগর রাজবংশের উত্তরপুরুষ ভগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করে পতিতপাবনী গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। গঙ্গার ধারায় ভস্মীভূত সগর সন্তানরা পুনর্জীবন লাভ করে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। এই কারণেই স্থানটি হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসীদের কাছে পরম পবিত্র স্থান ও তীর্থ ক্ষেত্র। তাই প্রতি বছর পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন এখানে পুণ্যার্জনে এবং পিতৃপুরুষদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্পণ করেন।

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী পুরাণ ও বাল্মিকী রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে আছে, মহারাজা যুধিষ্ঠির এসেছিলেন তীর্থ করতে। কিন্তু কবে থেকে এই গঙ্গাসাগর মেলার উদ্ভব, সে বিষয়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে, শাস্ত্রকাররা নির্দেশ করেছেন, কপিলমুনির আশ্রমের আগে এখানে ছিল একটি বিশাল বিষ্ণু মন্দির। শ্বেতদ্বীপের রাজা মাধব বঙ্গোপসাগর তীরে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। বিষ্ণুমন্দিরটি সম্ভবত সাগরগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সুদূর অতীতে। তাছাড়া কপিলমুনির মন্দিরটি আগে যেখানে ছিল সেই স্থানটিও আর নেই, সাগর তাকে গ্রাস করেছে।

গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দির সম্পর্কে 'ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আছে ঃ "...a mere sand bank, about a mile in length and about a quarter

mile broad of a crescent form with the wide sea opening in front and the back covered by dense jungle. At one corner stands the solitary temple of the celebrated Sanyasi Cupil Muni…'

"The temple is the last remnant of what has evidently been a large monastic institution for devotees, the ruins of which may be walked over a low water. These ruins show that the building must have been very extensive as-well-as a massy…Temple itself was built of Concha stone brought from Orissa, but such is the encroachment at the sea that the last relic of this evidently once extensive building if not officially repaired will soon moulder away…"

গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির পূজা সম্পর্কে 'হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবরণে আছে ঃ "ঐস্থানে যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে, ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধর্ষি সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত্ত বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে অতি পূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দ নামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটি বন্দোবস্ত করতঃ মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তোক ও নির্মহী ও নির্বাণী ও মহানির্বাণী এবং নিরালম্বীতে এক এক শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা ।। ৩য় খণ্ড)।

মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যয় হত না। যে কারণে সাগরের আক্রমণ থেকে মন্দিরকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। একটি বেদির ওপর খড় ও চালা দিয়ে তৈরি হয় অস্থায়ী মন্দির। মন্দিরের সামনে একটি বটগাছ ছিল। রামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্তি ছিল বটগাছের নিচে। মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর ঐ গাছের ডালে ঢিল বেঁধে দিত। মন্দিরের দেওয়ালে নাম লিখে দিত। মন্দিরের পিছনের পুকুরটিকে বলা

হত সীতাকুণ্ড। পয়সার বিনিময়ে পুরোহিতরা এই জল দিতেন পুণ্যার্থীদের। পুকুরের জল শেষ হয়ে যেত সারাদিনে। পরদিন আবার পূর্ণ হয়ে উঠত। এই মন্দিরের কাছেই ছিল সাধুদের আশ্রম ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। পুকুর, মন্দির, আশ্রম, সেবাসদন সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এরপর আরও দুটি মন্দির তৈরি হয়। ১৯৬১ সালে শেষ মন্দিরটি জীর্ণ ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পুরানো মন্দিরের এক কিলোমিটার উত্তরে নতুন মন্দির নির্মিত হয়। সেই মন্দিরটিও সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হলে, বর্তমান মন্দিরটি ১৯৭৩ সালে নির্মাণ করেন অযোধ্যার হনুমানগাড়ি মঠের মোহন্ত রামদাসজী মহারাজ। মন্দিরে তিনটি স্বতন্ত্র শিলায় খোদিত তিনটি বিগ্রহ হল ঃ মকরবাহিনী চতুর্ভুজা গঙ্গামূর্তি, কপিলমুনি ও সগর রাজার মূর্তি। কপিলমুনি ও সগর রাজা বসে আছেন যোগাসনে। তিনটি বিগ্রহে বিন্দুমাত্র শিল্পরুচির ছাপ নেই।

গঙ্গাসাগরে তীর্থদর্শনে বৈতরণী পার হওয়ার ধুম পড়ে যায় পুণ্যলোভী নরনারীর মধ্যে। অধিকাংশই অবাঙালী। আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দু-মুসলমান তাদের পালিত গরু নিয়ে আসেন এখানে মেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে। সাগরের জলে গরুগুলিকে নামিয়ে তার লেজ ধরে বসে পুণ্যার্থীরা। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করেন। দক্ষিণাও পান। গরু সরবরাহকারীও গরু প্রতি বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এসময়। এক সময় সাগরে সন্তান বিসর্জনের রেওয়াজ ছিল। ইংরেজ সরকার আইন করে তা বন্ধ করেন।

গঙ্গাসাগর মেলায় অবস্থিত মন্দিরের মালিকানা উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরের হনুমানগাড়ি মঠের রামানন্দপন্থীদের। সাগরদ্বীপে মন্দির কয়েক শতাব্দী আগে প্রতিষ্ঠা করেন রামানন্দপন্থী সাধু। মন্দির পূজায় প্রাপ্ত যাবতীয় প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া হয় হনুমানগাড়ি মঠে। মন্দিরের পরিচালনা ও মালিকানা নিয়ে নানা সময়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬০ সালে বিবাদ চূড়ান্ত রূপ নেয়। সাগর মেলার সময় স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সীতারামজী ও দলবলের সংঘাত বাধে মন্দিরের প্রণামী সংগ্রহ নিয়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেন সংগৃহীত প্রণামী সিল করা ব্যাগে সার্কেল ইন্সপেকটরের হেপাজতে থাকবে। বিরোধীপক্ষ মন্দিরের স্বত্ব সম্পর্কে তাদের দাবি প্রমাণ করতে না পারায়, মন্দিরের স্বত্ব থেকে যায় হনুমানগাড়ি মহান্তদের। তিন থেকে চার লাখ টাকা সংগ্রহ হয় প্রতি বছর। ১৯৫৩ সালের গঙ্গাসাগর অ্যাক্ট অনুসারে মেলা পরিচালনা করে চব্বিশপরগণা জেলা বোর্ড। তিন দিনের মেলা সাত দিনের আগে শেষ হয় না।

আগে তীর্থকর আদায় হত, ১৯৬৪ সালের পর সেই কর নেওয়া বন্ধ হয়। তবে সাগরদ্বীপের বাইরে থেকে যেসব যাত্রী আসেন, তাদের মেলার উন্নতির জন্য কর দিতে হচ্ছে। এই ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে ১৯৭৪ সাল থেকে।

মেলা পরিচালনার জন্য সরকারী উদ্যোগের অনেক আগে থেকেই বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছিল এই দায়িত্ব পালনে। ১৯১২ সাল থেকে রামকৃষ্ণ মিশন নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ অন্যান্য সেবা কাজের সঙ্গে এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি স্থায়ী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া আছে বহু সংস্থা।

মেলা শেষের একটি স্মরণযোগ্য স্মৃতিচিত্র ঃ "মেলা শেষ হয়। সরকারী কর্মচারীরা একদিন মেলা ভেঙ্গে দেবার কথা ঘোষণা করেন। তার আগেই অবশ্য যাত্রীরা চলে যান যে-যার ঘরে। ব্যবসায়ীরা লাভ-লোকসানের হিসাব মিলিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসেন মহাজনী নৌকায়। সরকারী কর্মচারী যাঁরা সবার শেষে সাগরদ্বীপ ত্যাগ করেন, তাদের কাছে শোনা যায়। এই সময় নাকি অসংখ্য কুকুরের দল এসে হাজির হয় সাগরদ্বীপে মেলা প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে থাকা উচ্ছিষ্টাংশ ভোজনের লোভে। তারপর একদিন তারাও ফিরে যায় যে যার আস্তানায়। দূরে বহুদূরে দিগন্তে মিলিয়ে যায় সাগরদ্বীপ থেকে ছেড়ে যাওয়া শেষ মহাজনী নৌকাটি। জনকোলাহল থেমে যায়, নির্জনতা নেমে আসে সাগরদ্বীপে। কেবল ভাবলেশহীন বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকেন মহামুনি কপিল ; কিংবা হয়ত চক্ষু বুজিয়ে সারা বৎসরের জন্য আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যান। তাঁরই কল্যাণে যে মোহন্তের দল প্রায় লক্ষ টাকা ধনসম্পত্তি নিয়ে অযোধ্যার 'হনুমানগড়ি মঠে' গিয়ে ওঠেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ একজন রইল না নিয়মিতভাবে তাঁকে দু'টো ফুল-বেলপাতা ছুঁড়ে দিতে। সংসার নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, মহাজ্ঞানী মহামুনির তাতে কিছু আসে যায় না। এই অবহেলা তাঁর সুগভীর প্রশান্ত হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে না। জীবনে হয়তো এই নির্জনতা, এই নিঃসঙ্গতাই চেয়েছিলেন তিনি। তাই সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কোন্ সেই সুদূর অতীতকালে সুবিশাল ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের কূলে নির্জন সাগরদ্বীপকে। শান্ত, মহাশান্ত পরিব্যাপ্ত ; শান্তি, মহাশান্তি বিরাজিত। শুধু শোনা যায় নির্জন সাগর সৈকতে আছড়ে পড়া বিরামহীন জলোচ্ছ্বাসের একটানা গর্জন। বর্ষ চক্র ঘুরে চলে।" (পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২৭১)।

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত সাগরদ্বীপ ৫টি দ্বীপের সমষ্টি। পাঁচটি

দ্বীপ হল সাগর, ঘোড়ামারা, সুপারীডাঙা, আগুনমারী ও লোহাচড়া। আরও কয়েকটি দ্বীপ ছিল। কিন্তু সেগুলি কালক্রমে মিশে গেছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। হুগলি নদী যেখানে মিশেছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে, সেই সমুদ্র সৈকতে হুগলি নদীর পূর্বাংশে সাগরদ্বীপের অবস্থান। পশ্চিমে হুগলি নদী; পূর্ব দিকে বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা বা চ্যানেল ক্রীক; উত্তরে বারাতলা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

সাগর দ্বীপ ২০°৩৬´ থেকে ২১ ৫৬´ মিঃ উত্তর এবং ৮৮°২´ থেকে ৮৮″১১ মিঃ পূর্ব অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৩৫৮ বর্গ কিমি। গ্রামের সংখ্যা ৪৬। ১৯৭১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৯৯,৯৪০ জন। দৈর্ঘ্য ৪২ কিমি. (উত্তর-দক্ষিণে) এবং প্রস্থে গড়ে ১৩ কিমি (পূর্ব-পশ্চিমে)। এই আয়তন আগে ছিল অনেক বেশি। দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪৮ কিলোমিটারের মত। সমুদ্রের অবিশ্রাম আঘাতে ক্ষয় হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়েছে। বর্তমান দ্বীপের আশেপাশে নতুন চড়ার সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে এগুলি দ্বীপের রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া ধবলাট ও গঙ্গাসাগরের কূল থেকে বঙ্গোপসাগরের বুকে বিস্তৃত চড়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর বুকেও জন্ম নেবে গাছপালা। জনবসতি গড়ে উঠবে। সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে একদা হারিয়ে যাওয়া ইস্‌পুর, রাধাকান্তপুর ও বিশালাক্ষীপুর।

সাগরদ্বীপের সৃষ্টি কবে, এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে গঙ্গা, কাঁসাই, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী-বাহিত পলি, বালি ও শিলাখণ্ড জমে এই দ্বীপমালার সৃষ্টি হয়েছে। হিমালয় পর্বত যে সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত। একদা বঙ্গোপসাগরের কূলে ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। সেই সমুদ্রও সরে গেল ধীরে ধীরে। তার বুকের ওপর জন্ম নিল মহিষাদল, হিজলী। সাগরদ্বীপের অস্তিত্ব পাওয়া যায় রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪-৭৬)। তার আগে জাও-দ্য-বারোস (১৫৫০) এবং ফ্রানডেন ব্রোকের (১৬৬০) মানচিত্রে সাগরদ্বীপের কোন উল্লেখ নেই।

সাগরদ্বীপে জনবসতি শুরু হয় কোন্ সময়ে তার যথাযথ তথ্য উদ্ধার হয়নি। তবে ৪৩০ সালে এখানে কপিল মুনির মন্দির তৈরি হয়েছিল বলে একজন ভৌগোলিক মন্তব্য করেছেন। সতীশচন্দ্র লিখেছেন ১৬৮৮ সালে এখানে ২ লক্ষ লোকের বাস ছিল। ১৭৬১ সালে জরিপের সময় সাগরদ্বীপে চাষের ক্ষেত ও গরু মহিষ দেখেছিলেন চব্বিশ পরগণার সার্ভেয়ার হিউজ ক্যামেরন। জনবসতির উল্লেখও আছে তাঁর বিবরণে।

সাগরদ্বীপ প্রসঙ্গে কালিদাস দত্তের একটি আলোচনায় আছেঃ "চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ বর্তমান সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা নামে পরিচিত এবং শাসন সৌকার্যার্থে ডায়মন্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অধীন সাগর, কাকদ্বীপ, কুলপী,

মথুরাপুর, জয়নগর, ক্যানিং, হাড়োয়া, হাসনাবাদ ও সন্দেশখালি এই নয়টি থানার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালে গঙ্গানদী ঐ প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত। বাল্মীকির রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, তজ্জন্য সুদূর অতীত যুগ হইতে উহা কপিলাশ্রম ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

"অধুনা গঙ্গা নদী সেখানে স্থানে স্থানে লুপ্ত হইলেও উহার শাখানদীগুলি এখনও ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পঞ্চশত নদী নামে সর্বপ্রথম উহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংখ্যায় অধিক থাকায় বোধ হয় মহাভারতকার ঐরূপে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার জন্যই সম্ভবত পরবর্তিকালে ও পুরাতন বাংলা সাহিত্যে শতমুখী গঙ্গা নামে উহাদের উল্লেখ আছে।......

"কৃত্তিবাস বর্ণিত এই কিংবদন্তী পাঠে জানিতে পারা যায়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিহরোদের ঘাট নামক স্থানের অনতিদূর হইতে গঙ্গার শাখানদীগুলি ২৪-পরগণার চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উক্ত বিহরোদের ঘাটের অবস্থান এখন অজ্ঞাত। কৃত্তিবাসের পরবর্তিকালে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, সেই সময় ইদানীন্তন ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ছত্রভোগ গ্রামের সান্নিধ্যে গঙ্গা ঐরূপে বিভক্ত ছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে গঙ্গাতীর দিয়া নীলাচল গমনকালে ছত্রভোগে আসিয়া গঙ্গার ঐসকল শাখা দর্শন করেন।

"ঐরূপ শতমুখী গঙ্গা অধ্যুষিত ভারত বিখ্যাত কপিলাশ্রম ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থের প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুরাবৃত্ত আজিও সংকলিত হয় নাই। ইউরোপীয় পর্যটক ও মুসলমান লেখকগণের খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সময় ঐ প্রদেশের অধিকাংশ স্থান বনময় হইয়া সুন্দরবন নামে ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদকুলের বাসভূমি ছিল এবং ঐ সকল নদীতেও পর্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাটি ছিল।

"ঐ সময় কি কারণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঐ প্রকার অবস্থা ঘটে তাহা অজ্ঞাত। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ হইতে ঐ অঞ্চলে বন ক্রমশ হাসিল হইয়া আবাদ হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিনেও উহা সম্পূর্ণরূপে আবাদে পরিণত হয় নাই এবং উহার পূর্বাংশে এখনও শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বন বিরাজ করিতেছে।

"পূর্বে ইউরোপীয়গণ সিদ্ধান্ত করেন যে, সৃষ্টিকাল অবধি ঐ প্রদেশ ঐ অবস্থায়

ছিল এবং বাংলাদেশ ইংরাজ অধিকারে আসিলে সেখানে সর্বপ্রথম আবাদ আরম্ভ হয়। ভূতত্ত্ববিদগণও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে বয়সে নবীন বলায় অনেকের ইহাও ধারণা হয় যে, খুব প্রাচীনকালে ঐ অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল না এবং বঙ্গোপসাগরে গঙ্গানদীর পলিতে দ্বীপসমূহ গঠিত হইয়া কিছুকাল পূর্বে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। কিছু বন হাসিলের পর সেখানে বনমধ্য হইতে যে সমস্ত ভগ্ন মন্দির, গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, গড়, মজাপুষ্করিণী এবং পুষ্করিণী ও খানা খননকালে ভূগর্ভের উচ্চস্তর হইতে এ নাগাৎ যে সকল তাম্রপট্টলিপি, মৃন্ময়, ধাতব ও প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্তি ও তৈজসাদি এবং রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুরাকীর্তি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তদসমুদয় হইতে জানা গিয়াছে যে, উপরিউক্তরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও লোকের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং অতীতযুগে সেখানে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগরাদি ছিল।

"কোন্ সময় কি প্রকারে ঐ সমস্ত লোকালয় ধ্বংস হইয়া ঐ প্রদেশ উল্লিখিতরূপ বনময় অবস্থায় পরিণত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না'। কেহ কেহ ভূমিকম্পকে উহার কারণ বলিয়াছেন। প্রাচীনকালে ঐরূপ নৈসর্গিক বিপ্লবে যে ঐ প্রদেশের ভূমি নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেখানকার বিভিন্ন স্থান খননকালে ভূপৃষ্ঠের নিম্নদেশে আবিষ্কৃত সুন্দরীবৃক্ষের প্রচুর শিকড়সহ মৃত্তিকাস্তর (peat-bed) হইতে। ঐ অঞ্চলের যে সকল নিম্নস্থান নদীর জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায় সুন্দরীবৃক্ষগুলি তাহারই উপরিভাগে জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং, সেখানে ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নাংশে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ মৃত্তিকাস্তরের আবিষ্কারে প্রতিপন্ন হয় যে ভূগর্ভে উক্ত বৃক্ষমূলের পতন কোন সময় ভূমিকম্পে সেখানকার ভূমি নিমজ্জনের কালেই সংঘটিত হইয়াছিল।"

সাগরদ্বীপের জনবসতি বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে। ১৬৮৪ এবং ১৬৮৮ সালের বন্যায় দ্বীপের প্রাণিজগৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার বসতি বেড়ে উঠতে থাকে। ১৬৮৮ সালে ৬০ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৭০৭ সালের ঘূর্ণিঝড়, ১৭৩৭ সালের ভূমিকম্প স্থানটিকে জনশূন্য করে। গোটা সুন্দরবনের জনবসতি বিনষ্ট হয়। ১৭৩৭ সালে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পায় প্রায় ৪০ ফুট। ৩০ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৮৩৩, ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে মানুষ কেবল প্রাণ হারাল না, যাবতীয় উন্নয়ন কাজও বিনষ্ট হয়। ১৮৯৫ সালে ভূমিকম্প আর একবার আঘাত হেনে যায়। এই শতকে ১৯৪২, ১৯৭১, ১৯৭৩ সালে প্রকৃতির খামখেয়ালী-

পনার শিকার হয় মানুষ। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালের ধ্বংসলীলা সকলকে হার মানিয়েছে। দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসই হল সাগরদ্বীপের বিপদ। এর হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার বেশ কিছু সংরক্ষিত পুকুর ও রক্ষাসদন নির্মাণ করে। পরবর্তী সময়ে যা কিছু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এই সব পুকুর ও রক্ষাসদনের কিছু ছাড়িয়ে আছে এখনও।

কোম্পানি আমলেই সাগরদ্বীপকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার চেষ্টার শুরু। ১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশিত একটি সংবাদে ছিলঃ "সাগরদ্বীপকে চাষবাসের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই দ্বীপে আবাদ করলে আরও নানাবিধ উপকার পাওয়া যাবে। সম্প্রতি শহরবাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা চলেছে এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থন হয়েছে। সাগরদ্বীপ উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয়, তবে তার থেকে আরও নানা ধরনের উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তিদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সরকারও এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য প্রথম সভা হয় টাউন হলে; দ্বিতীয় সভা হয় একচেঞ্জে। এই সভায় পরিকল্পনার অন্যান্য কার্যসূচী তৈরি করা হয়। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য ব্যয়ের হিসাব করে শেয়ার বিক্রি হয়। কার্পাস উৎপাদন এই পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায়। সকলের ধারণা সমুদ্রবায়ুর জন্য সাগর দ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলো তৈরি করা সম্ভব হবে। সাগর রোডের ওপর জাহাজে মাল চালান দেবার জন্য গুদাম তৈরি করা এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মাল গুদামের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের দোকানও খোলা হবে। এখন সাগর দ্বীপে উপযুক্ত খাদ্য খুঁজে পাওয়া এক সমস্যার বিষয়। রোগী ও অসুস্থদের জন্য স্বাস্থ্য নিবাস তৈরি করা এই পরিকল্পনার তৃতীয় উদ্দেশ্য। এই স্বাস্থ্য নিবাসে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে জাহাজে বেড়াবার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা ডাকঘর ও ছোট ছোট নৌকা রাখার ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। তাই আশা করা যায় যে একদিন এই সাগরদ্বীপ হয়ে উঠবে কলকাতার সবচেয়ে সুন্দর বন্দর। বড় বড় জাহাজ ঢুকবে সাগরদ্বীপের বন্দরে। মাল খালাস করবে সেখানে। কলকাতা থেকে সাগর অবধি কাটা হবে একটা টানা খাল। এই খালপথে সাগরদ্বীপ থেকে কলকাতায় মাল আসবে। পরিকল্পনার এই উদ্দেশ্য যদি সত্যি সফল হয় তবে আশা করা যায় অতি অল্পদিনে মৃত্যু, মহামারী ও বাঘের ক্রীড়া নিকেতন এই সাগরদ্বীপ হয়ে উঠবে

স্বাস্থ্য সম্পদ ও আনন্দের আবাস। এই দ্বীপে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা। অতি অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সাগর দ্বীপে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হবে।"

কোম্পানি আমলেই সাগরদ্বীপ উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। লবণ শিল্পই ছিল তাদের অন্যতম উদ্যোগ। ১৮১১ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে উত্তরে ৫টি ও দক্ষিণের ১টি ব্লকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। চাষাবাদ শুরু হয়ে যাওয়ায় ও লবণ শিল্প গড়ে ওঠায় লোকবসতি বাড়তে থাকে। ইংরেজ প্রথম জমিদারি নেয়। তাদের হাত থেকে উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখার্জির হাত ঘুরে যায় বড়বাজারের অদ্বৈত চরণ দত্তর অধিকারে। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ এসে বসতি শুরু করে। আরাকান থেকে এসেছিল মগ পরিবার। আর ময়ূরভঞ্জ থেকে কয়েক ঘর সাঁওতাল।

অশোক মিত্র লিখেছেন ঃ

"The reclamation of the island from jungle was started early in the nineteenth century. In 1811, a Mr. Beaumount applied for permission to hold a hundred acres of land in the island for the purpose of establishing a manufactory of buff leather, and asked that all tiger-skins brought to the Collector's office might be made over to him for this purpose. His application for land was granted by the Board of Revenue in November 1811 ; and in the following year, in consequence of a Government resolution offering favourable terms for the cultivation of Sagar Island, Mr. Beaumont applied for a grant of land on a cultivating tenure. This application was rejected on the ground that Government had decided not to grant leases to Europeans for cultivation. Leases of the island were offered to Indians only, and many proposals were received from them, but this scheme of colonisation was a complete failure. The island was subsequently leased to an association composed of Europeans as well as Indians, free of rent, for thirty years, and to pay only four annas per bigha even after. The undertaking was begun with vigour, but so many unforeseen difficulties occurred that up to the 1st September 1820 not more than four square miles

had been effectually cleared. Amongst other obstacles it was found that as the woods were cut down, the sea encroached, the sandy beach not having sufficient tenacity to resist its invasion. Twenty five families of Maghs from Arakan were settled at the confluence of two creeks, and a road constructed for the accommodation of pilgrims to the temple of Kapila.

"In 1819, Mr. Trower, collector of the 24 Parganas, originated a company, called the Saugor Island Society, for the systematic reclamation and development of the island ; he himself was a considerable share-holder, and the central part of the island was called Trowerland after him. The company obtained a grant of the whole island, subject to certain conditions (the breach of which entailed forfeiture of the grant) and carried on operations vigorously until 1833, when their work was destroyed by a cyclone and they abandoned the project. Their interest in the northern part of the island was then taken over by four European gentlemen, who combined the manufacture of salt with the cultivation of rice. The progress of the island was again interrupted by the cyclone of 1864, when 4,137 persons or three-fourths of the population perished, only 1,488 being left. Since then considerable progress has been made in reclaiming the waste, and the north of the island is under cultivation, but the south is still dense jungle." (District Handbook, 24 Parganas, P. cvii-cviii)

দেখা যাচ্ছে, সাগরদ্বীপের উন্নতির মূলে ছিল কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উদ্যোগ। সাগরের জমি দশ বছরের জন্য ১৮১১ সালে বন্দোবস্ত নেন বিউমন্ট নামে জনৈক ইংরেজ। তাঁকে কোন খাজনা দিতে হত না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চাষাবাদ। ১৮১৩ সালে চামড়া ব্যবসার জন্য একশ একর জমি নেন জোনস। ভারতীয় ও ইংরেজদের উদ্যোগে আড়াই লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গড়ে ওঠে ১৮১৮ সালে। কোম্পানির নাম হয় সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি। পরিচালনার জন্য ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয় ট্রাস্টি বোর্ড। সাগরদ্বীপকে জঙ্গলমুক্ত করে বসতি এলাকা গড়ে তোলা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। চব্বিশ পরগণার জেলা কালেকটর

ট্রাওয়ার ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। তাঁর নাম থেকেই সাগরদ্বীপের মাঝের কিছু অংশ ট্রাওয়ার আইল্যান্ড নামে পরিচিত হয়।

জেলা কালেকটর প্রথম ৩০ বছর বিনা খাজনায় এবং তারপর থেকে প্রতিবছর চার আনা খাজনায় জমি বন্দোবস্ত দেন। প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৮২০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪ বর্গমাইল জমি জঙ্গলমুক্ত হল। কেবল জঙ্গল পরিষ্কার নয়, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, পুকুর কাটা ও বসতি স্থাপন শুরু হয়ে যায়। বামনখালি, ট্রাওয়ার-ল্যান্ড (কোম্পানিচর), ধবলাট, শিকারপুর, মাডপয়েন্ট (ঘোড়ামারা) ও ফেরিনটোসে (মুড়িগঙ্গা) জনবসতি গড়ে ওঠে। একাজে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের। তার মধ্যে ১৮৩৩ সালের ঘূর্ণিঝড় তাদের সমস্ত প্রয়াসে ভয়ঙ্কর আঘাত হানে। সোসাইটির উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেল। শিকারপুর, ট্রাওয়ারল্যান্ড, মাডপয়েন্ট ও ফেরিনটোসে আবার কাজ শুরু হয় ১৮৩৪ সালে। এবার উদ্যোগী ছিলেন হান্টার, হেয়ার, ক্যাম্বেল ও ম্যাকফারসন। এরা লবণ তৈরির ব্যবসায় সফল হলেন। সাগরদ্বীপের ওপর মানুষের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। চাষাবাদ ও ব্যবসার কারণে লোকবসতি বাড়তে থাকে। ১৮৪২, ১৮৫২, সালের প্রাকৃতিক আঘাতে আবার উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়। লবণ তৈরির ব্যবসা বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার আদেশ জারী হয়। যার ফলে বেসরকারী উন্নয়ন কাজকর্মের গতি অনেক শ্লথ হয়ে পড়ে।

এই সময়ে সাগরদ্বীপ ছিল আজিমাবাদ মহকুমার দক্ষিণ সাগর পরগণা। ৩,১৬৪ বর্গমাইল বাসোপযোগী জমি, ১৫ টি মৌজা, একটি পাকা ঘর, ৪৮২টি কাঁচা বাড়ি, ৪৯২ জন মানুষ নিয়ে ছিল এই পরগণা। প্রধান গ্রাম ছিল মধুসূদনপুর।

ত্রিশ বছরের করমুক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১৮৬৩ সালে দ্বীপটি জরিপের পর ৬টি ব্লক সৃষ্টি হল : ১। ধবলাট, ২। শিকারপুর, ৩। বামনখালি, ৪। ট্রাওয়ারল্যান্ড, ৫। মাডপয়েন্ট, ৬। ফেরিংটোস। ৩১,১৯০ বিঘা জমি ছিল জঙ্গলমুক্ত। দক্ষিণ দিকে ছিল লাইটহাউস।

৩১,১৯০ বিঘা জমির বেশির ভাগই ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে নষ্ট হয়ে যায় লবণ জলে। ২,৭৫০ বিঘা মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

আবার জমি উদ্ধার ও বসতির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবার স্থানীয় জনগণের প্রাণরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল প্রথম। পানীয় জল ও বন্যার হাত থেকে সংরক্ষিত পুকুর নির্মাণ সাপেক্ষে ১৮৬৭ সালে জমি বন্দোবস্ত দিলেন চাপম্যান। ৬টি ব্লকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল এইভাবে :

১। ধবলাট—১৭,৭২৬ বিঘা। ২। শিকারপুর—৭,৪৮৬ বিঘা।
৩। বামনখালি—৩,৮২১ বিঘা। ৪। ট্রাওয়ারল্যান্ড—৭,৩৪৯ বিঘা;
৫। মাডপয়েন্ট—১১,৭৮৩ বিঘা। ৬। ফেরিংটোস—১০,২৫৮ বিঘা।

লবণ উৎপাদক পামার কোম্পানি সর্ব দক্ষিণের ধবলাট ব্লক এবং বাকি পাঁচটি ব্লক ম্যাকিন্টস অ্যান্ড হান্টার কোম্পানি বন্দোবস্ত নেয়। সবকটি ব্লক ছিল করমুক্ত। ধবলাট ব্লক ১৮৭৫ সালে স্থায়িভাবে বিনা করে বন্দোবস্ত পায় জোড়াসাঁকোর অদ্বৈতচরণ দত্তর দুই ছেলে প্রসাদদাস দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত। উত্তরাংশের ব্লকগুলি ১৮৮০ সালে উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখার্জিকে হস্তান্তর করে ম্যাকিন্টস ও হান্টার কোম্পানি।

সাগরদ্বীপের নতুন আইন পাস হয় ১৮৯৭ সালে। ১৮৯৮ সালে মোট ৭১ বর্গমাইল জমি নতুনভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হল জমিদারদের ৪০ বছরের মেয়াদে। এই জমির ৪ ভাগের ১ ভাগ ছিল উন্নয়ন কাজের কারণে সম্পূর্ণ করমুক্ত। বাকি তিন ভাগ ১৫ বছর করমুক্ত থাকবে। বিঘা প্রতি দু আনা খাজনা ধার্য থাকবে ১৬ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত। ২১ থেকে ৪০ বছর খাজনা ধার্য থাকবে বিঘা প্রতি চার আনা। এইসব বন্দোবস্তের সঙ্গে অন্যতম শর্ত ছিল প্রজা সাধারণের জীবনরক্ষার জন্য নদী বাঁধ, সংরক্ষিত পুকুর নির্মাণ, পথঘাট তৈরি, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি। নতুন ভাবে জমি বন্দোবস্তের পরিসংখ্যান :

১৮৯৮ সাল—সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ১০,৩৯৫ বিঘা।
চক-ফুলডুবি ৯,৫০০ বিঘা।
১৮৯৯ সাল—রামকরের পূর্ব পশ্চিম ও ট্রাওয়ারল্যান্ডের অবশিষ্ট।
১৯০০ সাল—শিকারপুর ২ ও ৩ খণ্ড এবং সাগরের ৩ খণ্ড।
১৯০১ সাল—গোয়ালিনীচক ১ ও ২ খণ্ড।
—চক মনসাদ্বীপ ১, ২ ও ৩ খণ্ড।
১৯১৮-১৯ সাল—সাগরদ্বীপ ১, ২ ও ৩ খণ্ড।

সরকারী নির্দেশমত উন্নয়ন কাজ না করায়, সরকারের আদেশে বন্দোবস্ত রদ করে নতুন বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বেশ কিছু সরকারের হাতেই থেকে যায়। গ্রামগুলি ছিল : মনসাদ্বীপ ২, খাসমহাল, খানসাহেবাবাদ, বেসুয়ালি, রামকরের চর ও কীর্তনখালি। সরকারী গ্রামগুলির পর্যাপ্ত উন্নতি ঘটে। জমিদারদের এলাকাগুলিরও উন্নয়ন করা হয়।

সাগরদ্বীপ গড়ে উঠেছে সমুদ্রের বুকের ওপর। এখানে আছে বহু নদনদী। তার মধ্যে অন্যতম হল চেমাগাড়ি, মরাগলি, হাতিপিঠিয়া, সাতবেঁকি, গঙ্গাসাগর, কয়লাপাড়া ও মুড়িগঙ্গা। দ্বীপের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত চেমাগাড়ি বা ফুলডুবি নদী। ফুলডুবি বাজারের কাছে সীমাফোর অফিস জেটিতে এসে ভিড়ত জাহাজ। জেটির কংক্রীটের থাম এখনও দাঁড়িয়ে আছে। চেমাগাড়ি নদীপথে মালবাহী জাহাজ যেত পূর্ব বাঙলায়। সাগরদ্বীপের পূর্বদিকে বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা। বারাতলা একসময় ছিল ক্ষীণকায়া, এখন তার রূপ ভয়ঙ্কর। নদী শিকারপুর, সুমতিনগর, মুড়িগঙ্গা, চেমাগাড়ি, কচুবেড়িয়া, দেবীমথুরাপুর, মৃত্যুঞ্জয়নগর, কয়লাপাড়া গ্রামগুলিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে।

কালীঘাটের পাশ দিয়ে আদিগঙ্গার ধারা এসে মিশেছিল সাগরদ্বীপের কাছেই সাগরে। এই পবিত্র স্থানটিই মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর। তখন বারাতলা নদী ছিল না। পরবর্তী সময়ে যার আত্মপ্রকাশে কাকদ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পাশেই কাকদ্বীপ ও নামখানা। তিনটি অঞ্চল ছিল অখণ্ড ভূভাগে। মূল ভূখণ্ডের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সাগরদ্বীপেও পাওয়া গেছে। সুতরাং একটি অখণ্ড ভূভাগ হিসাবে এর অবস্থান সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নদী পথের পরিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে স্বতন্ত্র দ্বীপমালার।

বামনখালি, মুড়িগঙ্গা, ঘোড়ামারা গ্রাম ছিল অখণ্ড ভূভাগ। ১৯০৩ সালে কসতলা ও কালীজঙ্গলের কাছে ভাঙন দেখা দেওয়ায় সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঘোড়ামারা। সাগরের পশ্চিম দিকে হুগলি নদী দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই নদীর জলপুষ্ট হয়ে এসে মিশেছে মোহনায়। এই স্রোতের আঘাতে বেলাভূমি বিনষ্ট হচ্ছে। এখানে জেটি কমিশনারের হাইফিকস ও সীমাফোর অফিস রক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে বিশাল পাঁচিল। নদীর গতিপথ পরিবর্তনে যার ভূমিকাও নগণ্য নয়।

সাগর থেকে কোথাও যাওয়ার একমাত্র উপায় হল নদী। নৌকাই হল প্রধান বাহন। বর্ষার সময় নদীগুলি হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। যার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাস আছে সামান্য। রিক্সা ভ্যানও চলে। লঞ্চ চলে নদীপথে। কচুবেড়িয়া ও চেমাগাড়িতে রয়েছে লঞ্চে ওঠানামার জেটি।

সাগরদ্বীপের ২৯ কিমি. দীর্ঘ একমাত্র জাতীয় সড়ক কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর মেলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। আরও কয়েকটি রাস্তা হল চেমাগাড়ি থেকে মনসাদ্বীপের ছয়ের ঘেরি, কমলপুর বাজার থেকে গোয়ালিনীচক, চেমাগাড়ি বাজার থেকে শুরু হয়ে শ্রীধাম গঙ্গাসাগরের নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে মিশেছে জাতীয় সড়কে এবং

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত। এগুলি সবই পাকারাস্তা। বাকি সব রাস্তা কাঁচা, বর্ষায় যা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে ওঠে।

সাগরদ্বীপের মুড়িগঙ্গায় প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় ১৯২১ সালে। মনসাদ্বীপে ডাকঘর স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। রুদ্রনগরে আছে সাবপোস্টঅফিস ও বেতার ভবন। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে। তারপর বেতার ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এখানে একটি আবহাওয়া অফিস চালু আছে।

সাগরদ্বীপের দক্ষিণে বেগুয়াখালি গ্রামে লাইট হাউস নির্মিত হয় ১৮০৮ সালে। প্রথমে পতাকার সাহায্যে এখান থেকে জাহাজকে পথ নির্দেশ করা হত। পরে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান লাইট হাউসটি নির্মিত হয় ১৯১১ সালে ১৩ একর জায়গায়। উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা। এখানে আছে রাডার ও রেডিও বিকন অফিস। এর কাছেই পোর্ট কমিশনার্সের হাইফিকস অফিস ও সীমাফোর কেন্দ্র। দুটি জাহাজ চলাচলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। পরে লাইটহাউসে কেরোসিন তেলের সাহায্যে বিশেষ ধরনে তৈরি কাঁচের ঘর থেকে আলো জ্বালানো হত। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা অনেক পরে। লাইট হাউসের ওপরে ওঠার সিঁড়ি সংখ্যা ৭৮।

সাগরদ্বীপে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৯৭৩ সালে। সাগরমেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রথম রুদ্রনগর ও ছয়েরঘেরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা হয়। সাগরদ্বীপের প্রায় সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবাহের ব্যবস্থা হয়েছে। সাগর উন্নয়ন ব্লকের উদ্যোগে চলছে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ। ৮০ বিঘা জমিতে আছে একটি কৃষি খামার। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহিলাকেন্দ্র, পাঠাগার, যুবকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সমাজশিক্ষা কেন্দ্র। সমবায় সমিতি পরিচালনা করে ব্লক উন্নয়ন সংস্থা।

সাগরের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিছু কিছু অন্যান্য উপজীবিকাও মানুষ গ্রহণ করেছে। ছোটখাট ব্যবসা ও দোকানপাট আছে। নানান জেলার মানুষ এসে বসতি করায় উচ্চারণে একটি মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও এটি বাঙলা ভাষী অঞ্চল। বেশকিছু সাঁওতাল এখানে আছে। জনসাধারণের বেশির ভাগই হিন্দু। কয়েকঘর মুসলমান আছে।

এঁটেল ও দোয়াঁশ মাটি প্রধান অঞ্চল হওয়ায় চাষাবাদের অনুকুল। তরিতরকারি, শাকসব্জি, ধান, লঙ্কা, তরমুজ উৎপন্ন হয়। দ্বীপ থেকে তরমুজ, লংকা, ধান, ডিম, মাছ, মাংস রপ্তানি হচ্ছে। গুড় উৎপন্নের পরিমাণ যথেষ্ট।

জনবসতি বাড়বার ফলে সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পাড়া ও গ্রামের উদ্ভব হয়। পাড়ার মোড়লরা ছোটখাট বিবাদ মীমাংসা

করলেও সব সময় তা সম্ভব হত না এখানে। স্বতন্ত্র থানা স্থাপনের গুরুত্ব বাড়ে। সাগরদ্বীপ আগে ছিল কুলপী থানার অধীন। ১৯০৪ সালে ঘোড়ামারায় থানা স্থাপিত হয়। ১৯১৮ সালে থানা সরিয়ে আনা হয় মুড়িগঙ্গায়। পঞ্চায়েত রয়েছে এখানে।

চাষাবাদ ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই কেবল বেঁচে থাকেনি এই দ্বীপের মানুষ। লেখাপড়ার চর্চা শুরু হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের ইষ্টানন্দজী মহারাজের (রাখাল মহারাজ) উদ্যোগে, মনসাদ্বীপ, বামনখালি ও ফুলবাড়িতে বিদ্যালয় চালু হয়। তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন নিকুঞ্জ বিহারী দাস, সেকেন্দার আলি খাঁ ও কৃষ্ণপ্রসাদ দাস প্রমুখ। ১৯২৮ সালের পর সাগরের প্রায় সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৪২ সালে এইসব বিদ্যালয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। পরে এইসব বিদ্যালয়ের কয়েকটি নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। কয়েকটি আবার উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মন্দিরতলায় স্থাপিত হয়েছে কলেজ। সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা, সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র ও পাঠাগার আছে বেশ কয়েকটি।

মনসাদ্বীপে আছে সরকারী ভূমিসংস্কার দপ্তরের প্রধান কার্যালয়। নদীর ধারে অবস্থিত কার্যালয়টি। স্টীমারে ওঠানামার একটি সুন্দর জেটি ছিল। সেটি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে। ভূমিসংস্কার কার্যালয়ের কাছেই মনসাদ্বীপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও খাসমহল প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সাগরদ্বীপের বড় আকর্ষণ গঙ্গাসাগর মেলা। কিন্তু বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির ও মেলা-অনুষ্ঠানও কম নয়। কপিলমুনির মন্দির ছাড়াও আছে শিবমন্দির, কালীমন্দির, বিশালাক্ষী মন্দির, মনসা মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির এবং কয়েকটি মসজিদ।

মুড়িগঙ্গার শিলপাড়া গ্রামে চারটি শীতলা ও মনসার থান আছে। প্রথমে গ্রামটির নাম-ছিল শিবপাড়া। জঙ্গল-পরিষ্কার করে এখানে বসতি স্থাপনের সময় স্বপ্নাদেশে একটি শিবমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি স্থাপন করে পূজার ব্যবস্থা হয়। সেই কারণে গ্রামটি শিবপাড়া নামে পরিচিত। পরে শিবপাড়া শিলপাড়ায় পরিবর্তিত হয়েছে। দেড়শ বছর ধরে চড়কের মেলা হচ্ছে।

সাগর থানার কয়েকটি গ্রামের মন্দিরও পূজাপার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঃ মৃত্যুঞ্জয়নগর নামকরণ হয়েছে রাখালরাজ গায়েনের পুত্রের নাম অনুসরণে। রাখালরাজ জমিবন্দোবস্ত নিয়ে এখানে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেন। ফাল্গুনমাসে চারদিন হয় শিবরাত্রির মেলা। মনসাপূজা, রামযাত্রা, দোলযাত্রার উৎসব হয়। গ্রামে মনসার থান আছে।

সুমতিনগরে দুর্গাপূজার মেলা হয় পাঁচদিন। মাটির দেওয়াল টিনের চালাযুক্ত দুর্গামণ্ডপে দুর্গাপূজা হয় আশ্বিন মাসে। চৈত্র মাসে হয় বাসন্তীপূজা।

মনসাদ্বীপের (২) লালকুর গ্রামে চারটি মেলা হয় বছরে। সেগুলি হল দুর্গাপূজার মেলা (৬ দিন)। কালীপূজার মেলা (২ দিন)। রাসযাত্রার মেলা (৮ দিন) এখানে জমি বন্দোবস্ত নেন কলকাতার শিবপ্রসাদ দত্ত। ছেলে লাল বিহারীর নামে লালপুর গ্রামের পত্তন করেন। আরও কয়েকটি গ্রাম পত্তন তিনি করেন। সেগুলি হল ঃ নিজের নামে শিবপুর, মেয়ের নামে সাবিকাপুর, পৌত্রের নামে গোলকপুর এবং ইষ্টদেবতা বিশালাক্ষী দেবীর নামে বিশালাক্ষীপুর।

মূল সাগরদ্বীপের মন্দিরগুলি হল ঃ বেগুয়াখালি গ্রামে একটি শিবমন্দির, তিনটি বিশালাক্ষীমন্দির, দুটি কালীমন্দির ও তিনটি শীতলামন্দির। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় ধর্মরাজের গাজন সব থেকে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এছাড়া শীতলা, কালী, মনসা, গোষ্ঠপূজা ও বিশালাক্ষীদেবীর পূজা হয়। ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে নেমে কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় যাওয়া যায় এই গ্রামে।

কোণারক ধরনের জোড়া শিবমন্দির আছে গঙ্গাসাগর জাতীয় সড়কের ধারে হরিণবাড়ির কাছেই নরহরিপুরে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে মূল মন্দিরটি নির্মিত হয় দ্বারকানাথ মহাপাত্রের দানে। মন্দিরের পাশেই ছোট মন্দিরটি পরে নির্মিত। দুটি মন্দিরই অলংকৃত। তার মধ্যে আছে, লতাপাতা, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, পাখি, হনুমান, গণেশ ও ছোট ছোট নানা ধরনের মূর্তি। মন্দিরের সামনে কাঠের তৈরি একটি ষাঁড়ের মূর্তি কাঠের মঞ্চের ওপর ছিল। চেমাগাড়ির শিবমন্দির ১৩৬৪ সালে হারাধন দাঁ নির্মিত। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। চন্দনেশ্বর মহাদেব ঠাকুরজীউ মন্দির নামে পরিচিত। নিত্যপূজা হয়। গাজন, চড়ক, চন্দনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, লক্ষ্মীপূজায় জাঁকজমক হয়। গোষ্ঠযাত্রায় সাতদিনের মেলা বড় আকর্ষণ। চাঁপাতলার শিবমন্দিরটি বিনষ্ট প্রায়। নন্দরাম প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে সুন্দর একটি শিবলিঙ্গ আছে। রুদ্রনগরের জাতীয় সড়কের ধারে এবং রুদ্রনগর বাজারের কাছে দুটি শিবমন্দির আছে। ঘসপাড়া কোম্পানিচরে সীতানাথ দাস যে শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন সেটিও নষ্ট হওয়ার পথে। শিবচতুর্দশীতে মেলা বসে সাত দিন।

গঙ্গাসাগরের শংকরাচার্য আশ্রমে আছে চিন্তাহরণেশ্বর শিবমন্দির। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন পঞ্চম গিরজী। কাশী থেকে শিবলিঙ্গ এনে বসানো হয়। এই বিগ্রহের কাছেই আছে নন্দী, পার্বতী, মহাবীর ও গণেশের বিগ্রহ। সব সময়ই এই আশ্রমে পর্যটক তীর্থযাত্রীরা আসেন। একসময় নাগা আশ্রম নামে পরিচিত ছিল।

ঘসপাড়ার একটি কালীমন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। একটি প্রস্তরখণ্ড পূজিত। আগে কোন মন্দির ছিল না। একটি বটগাছের নিচে প্রস্তরখণ্ডের পূজা হত।

ধবলাটের বিশালাক্ষী মন্দিরটি বর্তমান স্থানে ছিল না। জনশ্রুতি, বিশালাক্ষী বিগ্রহ সমুদ্র থেকে সংগৃহীত। জমিদার প্রসাদদাস দত্ত প্রথমে অস্থায়ী মন্দিরে, পরে বিশালাক্ষীপুরে একটি মন্দির স্থাপন করে দেবীপূজার ব্যবস্থা করেন। পরে সেই মন্দিরটি সমুদ্রে বিধ্বস্ত হলে জমিদার লালবিহারী দত্ত বর্তমান মন্দিরে বিগ্রহ স্থানান্তর করে। কৃষ্ণপাথরে খোদিত দেবীর বিস্ময়কর মাতৃমূর্তি অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি। মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তিটিও শিল্পনৈপুণ্যে অতুলনীয়। তাছাড়া মন্দিরে আছে প্রস্তর নির্মিত আটেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্বেত পাথরের বৌদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য প্রস্তর নির্মিত দেবদেবী। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ জমিদারদের কুল-দেবতা। কলকাতা থেকে এনে এই মন্দিরে স্থাপন ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা হয়। জনশ্রুতি, অন্যান্য পাথরের মূর্তি সমুদ্র থেকে পাওয়া।

ধবলাট শিবপুরের শীতলামন্দির অমূল্যকুমার দাস প্রতিষ্ঠিত। দেবী বিগ্রহ মাটির হলেও অপূর্ব সুন্দর। কার্তিকমাসের রাস পূর্ণিমায় সাতদিন মেলা হয়। মন্দিরের কাছেই মনসা বাজার। বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীরা আসে পূজা দিতে।

সুন্দরবন ॥ পর্তুগীজ কাহিনী

ষোড়শ শতকের শেষে বাঙলার শাসন ব্যবস্থা যখন শিথিল হয়ে পড়ে, সে সময়ে পর্তুগীজ দস্যু আর মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বাংলা জুড়ে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের বোম্বাই অঞ্চলে ছিল পর্তুগীজদের আস্তানা। অপরাধী পর্তুগীজরা গোয়া সরকারের শাস্তি এড়াবার জন্য নৌপথে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিত আরাকান ও চট্টগ্রাম উপকূলে। সেখান থেকে এইসব দুর্বৃত্ত শ্রেণীর মানুষ এসে ভিড়ত বাঙলার উপকূল অঞ্চলে। বোম্বাই থেকে আগত, এই কারণে, ওদের সাধারণ পরিচয় হয় বোম্বেটে নামে।

ষোড়শ শতকের প্রথমে বাঙলায় আগত বিদেশীদের অন্যতম হল পর্তুগীজ। তখন দেশের শাসনকর্তা ছিলেন হুসেন শাহ। তারা কেবল বাণিজ্যের জন্য আসেনি। এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাজ্যজয়, দস্যুতা আর অর্থোপার্জনের বিবিধ কারণ। মামুদ শাহের রাজত্বকালে (১৫৩৭-৩৮) মোগল সম্রাটের সনদ নিয়ে বাণিজ্যের জন্য তারা প্রথম কুঠি নির্মাণ করে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে। তাদের কাছে চট্টগ্রাম ছিল বড় বন্দর আর সপ্তগ্রাম ছিল ছোট বন্দর। বর্তমান হুগলির অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ছিল তাদের শুল্ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ঐ বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতের প্রধানপথ সরস্বতী পলি জমে স্থানে স্থানে উঁচু হয়ে যাওয়ায় ১৫৭৯ সালে বন্দর স্থানান্তরিত হয় হুগলিতে। হুগলি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন পেড্রো ট্যাভারিস। এই বন্দরটি সেই থেকে পরিচিত ব্যান্ডেল নামে। নৌবাহিনীর পক্ষে নিরাপদ বন্দর স্থানকে তারা ব্যান্ডেল বলত। বাঙলায় বেশকিছু ব্যান্ডেল ছিল পর্তুগীজদের। আজকের ব্যান্ডেল শহর সেই স্মৃতিই বহন করছে।

রালফ ফিচ ১৫৮৮ সালে যখন বাঙলায় এসেছিলেন তখন হুগলিতে ছিল পর্তুগীজ আধিপত্য। য়ুরোপীয় পর্যটক লিনসটেন ভারতে ছিলেন ১৫৮০ থেকে ১৫৮৯ সাল পর্যন্ত। তাঁর বিবরণে জানা যায়, এই সময়ের মধ্যে হুগলিতে পর্তুগীজদের কোন দুর্গ ছিল না। সেখানে পর্তুগীজরা তখন বাস করত বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কোন রকম শাসন তারা মানত না। নানারকম অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে একস্থানে তাদের পক্ষে দীর্ঘকাল বাস করা ছিল অসম্ভব। (বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট-১৯১৫ সাল)।

করেন আছে নন্দ তীর্থযাত্রীরা আ...

...পরে তারা হুগলিতে দুর্গ ও স্থায়ী ঘর বাড়ি তৈরি করে। ফলে ...র্তুগীজ উপনিবেশ। কিন্তু তাদের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

যে কারণে হুগলি ও আশপাশের জনপদে চলছিল নানারকম পীড়ন। হিন্দু মুসলমান শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে শুল্ক ও কর আদায়, জোর করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ, নারী অপহরণ, নরনারী ও শিশুকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

১৫৯০ সালে তারা চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। কর্ণফুলি নদীর মোহনার কাছে ডিয়াঙ্গায় ছিল ওদের শহর আর পাহাড়তলীতে ছিল একটি সুরক্ষিত দুর্গ। পর্তুগীজদের আর একটি ভাল শহর ছিল রামুতে। স্থানটি ছিল বর্তমান ককস্‌বাজারের পূর্বদিকে। ১৫৯৯ সালে চট্টগ্রামে একটি গির্জাও তারা বানায়।

উৎপীড়ন চলেছিল দীর্ঘকাল। ১৬৩২ সালে বাঙলার শাসনকর্তা ছিলেন কাসিম খাঁ। সম্রাট সাজাহানের নির্দেশে তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান। তিন মাস যুদ্ধের পর পর্তুগীজরা হুগলি ছাড়তে বাধ্য হয়। বহু পর্তুগীজ সৈন্য মারা পড়ে। কয়েক হাজার পর্তুগীজ নৌ সৈন্য বন্দী হয়। চারশত পর্তুগীজ নরনারীকে বন্দী করে পাঠান হয় দিল্লিতে। 'অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের পর্তুগীজ জাহাজ নষ্ট হয়ে যায়। মাত্র কয়েকখানি রণতরী সাগরদ্বীপে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। তার মধ্যে ছিল পাদরী ক্যাবরল এবং তিনহাজার পর্তুগীজ নরনারী। সেখানে মহামারী দেখা দিলে, হিজলীতে সরে যায় এবং সেখান থেকেই নদীপথে দস্যুবৃত্তি চালাত। (হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

এই ঘটনার বহু আগে থেকেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগরদ্বীপ, কুলপী ও তাড়দহ প্রভৃতি স্থানে বহু পর্তুগীজের আস্তানা ছিল। কাসিম খাঁ হয়ত হুগলি পর্তুগীজ শূন্য করেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পর্তুগীজরা যথারীতি বসবাস করছিল। অসংখ্য নদনদী ও দুর্গম অঞ্চলের জন্যই তাদের অবস্থান ছিল সুরক্ষিত। তাদের অনেকেই প্রতাপাদিত্যের জোত সংরক্ষণ, নৌবাহিনী ও সৈন্যবিভাগে কাজ করত। প্রতাপাদিত্যর জোত সংরক্ষণ, গোলন্দাজ সৈন্য ও নৌবাহিনী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন পর্তুগীজ ফ্রেডারিক ডুডলী, ফা নসিসকো রডডা ও আগস্টাস পেড্রো। (সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস। ২য় খণ্ড)।

সাগর দ্বীপে ছিল পর্তুগীজদের তত্ত্বাবধানে মহারাজা প্রতাপাদিত্যর দুর্গ ও নৌঘাঁটি। এখানে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত হত। রাজধানী ধুমঘাটে যাওয়ার জলপথে ছিল পাহারার ব্যবস্থা। এই জলপথ' 'ফিরিঙ্গী ফাঁড়ি' নামে পরিচিত ছিল। কারণ সাগরদ্বীপের কারখানায় ছিল বহু ফিরিঙ্গী কর্মচারী।

সতীশচন্দ্র মিত্রের বিবরণে আছে ঃ "ভাগীরথী হইতে পূর্বদিকে প্রধান মোহানা

জামিরা নদীর। সে নদী দিয়া শত্রু আসিয়া ঠাকুরাণী নদীতে পড়িলে, উহার শাখা মণিনদীর পার্শ্বে একটি দুর্গ ছিল। এইস্থান এক্ষণে ২৬ ও ১১৬ নং লাটের মধ্যে। এই দুর্গকে মণি দুর্গ বলিতে পারি ; কারণ ইহা মণিনদীর পার্শ্বে এবং স্থানটিকে এখনও মণির টাট বলে। এ দুর্গকে জয়নগর দুর্গও বলা যায়, কারণ ইহার পার্শ্বে ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০ এই সব লাটগুলি একত্রযোগে জয়নগর বলিয়া চিহ্নিত হয় এবং মণির টাটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি খালকে এখনও হাতীর গড় বলে। 'হাতী' কৈবর্ত্তদিগের একটি উপাধি। কৈবর্ত্তবংশীয় জয়রাম মণিদুর্গের অধ্যক্ষ থাকা বিচিত্র নহে এবং তাহার নাম হইতেই পার্শ্ববর্তী ভূভাগের নাম জয়নগর হইতে পারে। মণির টাটে মৃন্ময় প্রাচীরের চিহ্ন আছে এবং পার্শ্বস্থ রায়দীঘি ও কঙ্কণদীঘি নামক দুইটি বৃহৎ জলাশয় রায়গড় দুর্গপতির সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গের বাহিরে মণিনদীর মোহানার কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে জটার দেউল বলে। …উহা প্রতাপাদিত্যের আমলের বিজয়স্তম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত আছে, ইহারই নিকটবর্তী বিদ্যাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা একটি নৌযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন।…জামিরার পূর্বভাগে মাতলা নদী দিয়া শত্রু আসিলে, তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতলা বা হায়দর দুর্গে প্রতিরোধ করিত। এখান হইতে ধূমঘাট বা যশোহর যাইতে পূর্বোক্ত ফিরিঙ্গী ফাঁড়ি দিয়া সোজা পথ ছিল বলিয়া এ দুর্গ এত উত্তরদিকে সংস্থাপন করা হয়।" (যশোহর খুলনার ইতিহাস— সতীশচন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃঃ ২০৬-৭)।

প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজা হন ১৫৮৭ সালে। ১৬১০ সালে তাঁর পতন ঘটে। মহারাজা প্রতাপ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। মণিনদীর ধারের মতই বাঁশড়ার ঘুঁটিয়ারী শরীফের কাছেও প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। এটি ছিল 'মাতলা' দুর্গ নামে পরিচিত। দুর্গাধিপতি ছিলেন হায়দার মানক্কি। তার নাম থেকেই হায়দার আবাদ। ঘুঁটিয়ারী শরীফের উত্তরপূর্ব কোণে বিদ্যাধরী নদীর পশ্চিম তীরে উত্তর মাকালতলা নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের দমদমা নামক স্থানে ছড়িয়ে আছে অজস্র লোহালক্কড়। অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন, এখানে ছিল প্রতাপের অস্ত্রনির্মাণ কারখানা অথবা দুর্গ। বাঁশড়ায় আছে প্রতাপনগর গ্রাম। তাছাড়া আছে কুঠিবাড়ি, রাজার খাল ও বুরুজখানা। দমদমার কাছেই আছে ধোঘাট বা ধূমঘাট। এটি অবশ্য প্রতাপের রাজধানী ধূমঘাট নয়।

পর্তুগীজরা সে সময় পরিচিত ছিল ফিরিঙ্গি নামে। এসম্পর্কে ক্যাম্পস্-এর পর্তুগীজ অন বেঙ্গল গ্রন্থ থেকে জানা যায় ঃ **Frank is the parent word of Feringhi**

by which name the India-born Partuguese are still known, The Arabs and Persians called the French crusaders Frank, Ferang, a corruption of France when the Portuguese and other Europeans came to India, the Arabs applied to them the same name Ferong, and then Feringi."

প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন ১৬১০ সালে। অরক্ষিত সাগরদ্বীপের অধিকার চলে যায় ফিরিঙ্গিদের হাতে। তাদের অত্যাচারে স্থানীয় জনপদ ধ্বংস হতে থাকে। সাগরদ্বীপে আরাকান রাজের সহায়তায় ১৬৩২ সালে একটি দুর্গ বানায় পর্তুগীজ জলদস্যুরা।

একসময়ে ফিরিঙ্গিদের নৌবাহিনী অর্থাৎ আর্মাডা থাকত সাগরদ্বীপের পূর্বদিকে প্রবাহিত বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা নদীতে। নিম্নবঙ্গের নদী তীরবর্তী জনপদে এইসব নৌযানের সাহায্যে হামলা চালান হত। সেকারণে বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা নদী বহুকাল দুর্জনদের নদী নামে পরিচিত ছিল। (ও'মেলির বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ২৪ পরগণা)।

এসব কারণে কলকাতায় দক্ষিণ প্রদেশকেই এক সময় বলা হত ফিরিঙ্গির দেশ। ফিরিঙ্গিদের ভয়ে আদিগঙ্গা দিয়ে নৌপথে যাতায়াত ছিল না নির্ভয়। জলযানগুলি দ্রুততার সঙ্গে পথ পাড়ি দিত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যে আছে ঃ

দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর খানা।
কেরোয়ালে ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥
কানাহাট ধুলিগ্রাম পশ্চাতে করিয়া।
অঙ্গরপুরের চাট বামদিকে থুয়্যা ॥
ফিরিঙ্গির দেশখানা বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বেয়ে যায় হারমাদের ডরে ॥

এই হারমাদ শব্দটি হল পর্তুগীজ নৌবহরের আর্মাডা শব্দেরই অপভ্রংশ।

সাগরদ্বীপ ছাড়াও কুলপী ও তাড়দহে ছিল ফিরিঙ্গি ঘাঁটি। হুগলি নদীর ওপর সাগরদ্বীপের কিছুদূরে কুলপী হারবারের গ্রামে পঁয়তাল্লিশ ফিট উঁচু মর্মরের কবরের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জনৈকা পর্তুগীজ মহিলার এই স্মৃতিসৌধ থেকে হুগলি নদীতে যাতায়াতকারী জলযানগুলিকে আলো দেখানো হত। শিখরে লোহার মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। (মগ রেইডার্স অফ বেঙ্গল—যামিনী মোহন ঘোষ)। সুন্দরবনে 'ফিরিঙ্গি খালি', 'ফিরিঙ্গির দায়ানিয়া', 'ফিরিঙ্গির ফাঁড়ি

প্রভৃতি নামে কয়েকটি স্থান আছে। দক্ষিণ বাঙলার কয়েকটি অঞ্চলে এখনও মগ ও পর্তুগীজদের এদেশীয় স্ত্রীদের সন্তান সন্ততিদের উত্তর পুরুষরা বসবাস করছে।

বিদ্যাধরী নদীর ওপর তাড়দহ। কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠার একশত বছর আগে এখানে এসেছিল পর্তুগীজরা "The English were not the first European nation to settle in the District. The Portuguese are said to have occupied Tardaha on the Bidyadhari, at the spot where Tolly Nullah now joins that river, century before the foundation of Calcutta."

এই সব এলাকায় পর্তুগীজরা সৃষ্টি করেছিল ত্রাসের রাজত্ব। নিম্নবঙ্গের জনপদে হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে ধরে নিয়ে জাহাজে তুলত। তাদের দাক্ষিণাত্য ও অন্য দেশের বন্দরে নিয়ে গিয়ে দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। দামও পাওয়া যেত ভাল। তমলুক, বালেশ্বরে বিক্রি হত দাসদাসী। সেখানে বাজার ছিল। তমলুকের রাজার তখন ফিরিঙ্গি আতঙ্ক ছিল প্রবল। দেশীয়দের যোগ ছিল এ জাতীয় ব্যবসায়। মেয়ে চুরি হত বেশি। আর তাদের পাত্রী হিসাবে ব্যবহার করা হত। এদের বলা হত ভরার মেয়ে। মুসলমান মেয়েদের পরিচয় গোপন করে, হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত।

মানরিকের বিবরণে আছে, ১৬২৯-৩৫ সালের মধ্যে পর্তুগীজ ও মগদস্যুরা বাঙলাদেশ থেকে ১৮ হাজার মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে দিয়াঙ্গা ও আরাকানে বিক্রি করেছিল। গোয়ার বাজারে বাঙালী মেয়ে বিক্রি হতে দেখেছিলেন পর্তুগীজ পর্যটক পিরার্ডডালাভাল। পর্তুগীজদের এক সর্দার সেবাস্টিয়াও গঞ্জালেস চট্টগ্রামের কাছে সন্দীপ থেকে সদলে নির্যাতন চালাত আরাকান ও বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে। দলে ছিল হাজার খানেক অশ্বারোহী, দুহাজার দেশী পদাতিক ও শ-দুই অশ্বারোহী। অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বাঙলার নিম্নাঞ্চলকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। শিশু যুবক যুবতী বৃদ্ধ নরনারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা বিক্রি করত। এইভাবে ১৬২১ সাল থেকে ১৬২৪ সাল চার বছরে বাঙলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চট্টগামে ৪২,০০০ মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব জিনিস বহনযোগ্য ছিল না, তা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিত। ওদের হাত থেকে নিস্তারের পথ ছিল না কারো। হিন্দু বা মুসলমান যে জাতিরই লোক হোক না কেন, কেউ রেহাই পেত না। ধরে নিয়ে হাতের পাতায় ছেঁদা করত। তার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিত সরু বেত। জাহাজের নিচের তলায় ফেলে রাখত তাদের পশুর মত গাদা করে; সেই জাহাজ এসে পেঁছাত দক্ষিণ ভারতের বন্দরে। সেখানে বিক্রি হত এসব বন্দী।

বাঙলায় পর্তুগীজ দস্যু বা ফিরিঙ্গি আর আরাকানের মগরা অত্যাচার চালাত একসঙ্গে। ফিরিঙ্গিরা বন্দীদের বিক্রি করত দাস হিসাবে। আর মগরা তাদের লাগাত চাষের কাজে।

পর্তুগীজদের এই নির্মম অত্যাচারেই বঙ্গের সাগর তীরবর্তী জনবহুল সুন্দরবন, সাগরদ্বীপ, যশোহর, শালিমাবাদ, বাকলা এবং চব্বিশপরগনার দক্ষিণাংশের জনপদগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পরিণত হয় অরণ্যাঞ্চলে। বার্নিয়ের ও অন্যান্য বিদেশীদের বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বার্নিয়ের লিখেছেন ঃ "Their ordinary trade was robbery and piracy. With some small and light galleys they did nothing but coast about that sea, and entering into all rivers there about, and into the channels and arms of Ganges and between all these isles of the lower Bengal and often penetrating even as far as forty or fifty leagues up into the country, surprised and carried away whole towns, assemblies, markets, feasts and weddings of the Gentiles and others of that country, making women slaves great and small, with strange cruelty, and burning all they could not carry away. And thence it is that at present these are seen in the mouth of Ganges so many fine isles quite deserted which were formerly well-peopled, and where no other inhabitants are found but wild beasts, especially tigers." (F. Bernier, Travels in Mogul Empire).

রেনেলের মানচিত্র ১৭৮০ সালে তৈরি। ঐ মানচিত্রে সুন্দরবনের একটি অঞ্চলকে 'Country depopulated by the Muggs" বলে চিহ্নিত করেন। বার্নিয়েরের বিবরণে তার সমর্থন মেলে। ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ১৬৫৮/৫৯ সাল নাগাদ ভারতে আসেন। বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে তিনি বাঙলায়ও এসেছিলেন। তাঁর অসাধারণ ভ্রমণকাহিনীতে আছে মগ ও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ। বার্নিয়ের লিখেছেন ঃ "বাংলা দেশের সুবাদার হয়ে এসে সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন। কাজটি হল, বাংলাদেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। একাজের দায়িত্ব তাঁর পূর্বগামী শাসনকর্তা বিখ্যাত মীরজুমলা কেন গ্রহণ করেন নি, তা তিনিই জানেন। সায়েস্তা খাঁ যে কি বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন

তা বুঝতে হলে তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিত। এমন কোনো অপকর্ম ছিল না যা তারা করতে পারত না। তারা নামেই শুধু খ্রীস্টান ছিল, কিন্তু তাদের মতন জঘন্য পিশাচ প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেত না। খুনজখম, ধর্ষণ, লুঠতরাজ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে। মোগলদের ভয়ে সব সময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ আশঙ্কা করে এই ফিরিঙ্গি দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগদের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে রীতিমত যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করল। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুঠতরাজ ও অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল। এই সময় গঙ্গার অসংখ্য শাখা নদী দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে তারা লুঠতরাজ করতে আরম্ভ করল। হাট-বাজারের দিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের লোকদের তারা ক্রীতদাস করার জন্য বন্দী করে নিয়ে যেত। উৎসব পার্বণের দিনও তারা এইভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। নিম্নবঙ্গের কতশত গ্রাম এইভাবে যে তারা লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচার করে জনশূন্য করেছে, তার হিসেব নেই। এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয়শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছে।" (বাদশাহী আমল / বিনয় ঘোষ পৃঃ ৬৬-৬৭)।

বার্নিয়ের আরো উল্লেখ করেছেন ঃ সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক দ্বীপ এখন প্রায় জনবসতি শূন্য হয়ে গেছে। প্রধানত আরাকানের জলদস্যু ও বোম্বেটেদের অত্যাচারে এইসব দ্বীপ ছেড়ে লোকজন পালিয়ে গেছে। এখন এই দ্বীপগুলি দেখলে মনে হয় না যে এক কালে এখানে লোকালয় ছিল। ধু-ধু করছে জনমানবশূন্য গ্রামের পর গ্রাম। মানুষ নেই, বন্য জন্তুর উপদ্রব বেড়েছে তার বদলে। একসময় সেখানে মানুষের বসবাস ছিল, এখন সেখানে হরিণ শুয়োর আর বন্য কুক্কুট চরে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে। তারই আকর্ষণে বাঘেরও আনাগোনা আছে সেখানে। একদ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে অনেক সময় বাঘগুলো সাঁতার দিয়ে চলে যায়। গঙ্গার উপর সাধারণত ছোট ছোট নৌকায় করে চলে বেড়াতে হয়। এছাড়া নদীপথে চলাচলের আর অন্য কোনো যান নেই। নৌকা থেকে এইসব দ্বীপের যে-কোনো স্থানে অবতরণ করার বিপদ আছে অনেক। তার কারণ, স্থানগুলি নিরাপদ নয়। রাত্রিবেলা নৌকা

কোনো গাছের ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তীরে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে রাতের ঝোঁকে নৌকায় যে-কোনো আরোহীকে বাঘে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে। এরকম দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে। রাতে নৌকা নোঙর করে আরোহীরা যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, তখন বাঘ এলে সন্তর্পণে ঢোকে নৌকার ভিতর এবং শিকার ধরে নিয়ে চলে যায়। এ-অঞ্চলের মাঝিমল্লাদের মুখে এরকম কাহিনী অনেক শোনা যায়।

মুঘল সরকার ফিরিঙ্গিদের দমনের চেষ্টা করেন। এসব অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্য সমাবেশও করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষে হুগলি ও হিজলীতে নওয়ার মহল বা নৌঘাঁটি নির্মিত হয়েছিল। নবাব আলিবর্দি খাঁ আঠার শতকে কুলপীতে দেড়শত সিপাই রেখেছিলেন ফিরিঙ্গিদের দমন করতে। কিন্তু নিম্নবঙ্গের সাগর তীরবর্তী এলাকা তখন ছিল দুর্গম। ফলে কোন ব্যবস্থায় কার্যকরী ফলোদয় ঘটেনি।

পর্তুগীজদের মত মগরাও ব্যাপক লুঠতরাজ চালাত। তাদেরও ছিল বহু সংখ্যক যুদ্ধোপযোগী জলযান। এরা আরাকানের লোক হলেও, সেখান থেকে এসে যোগ দিত পর্তুগীজদের সঙ্গে। ভাগীরথীর শাখা নদীগুলির তীরবর্তী জনপদ, বিশেষ করে বরিশাল, খুলনা ও চব্বিশপরগণার দক্ষিণাংশ সম্মিলিত দুর্বৃত্ত হামলার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া সতের আঠার শতকে এসব অঞ্চলে আইনের শাসন বলতে কিছুই ছিল না। সর্বত্র ব্যাপক অরাজকতার ফলেই সৃষ্টি হয় মগের মুল্লুক কথাটি।

ফিরিঙ্গি ও মগদের দস্যুতা বহুকাল ধরেই চলেছিল। চৌর্যবৃত্তি ও দস্যুতাই ছিল ওদের ব্যবসা বলেছেন বার্নিয়ের। কেবল সমুদ্র উপকূল নয়। ছোট ছোট জলযানে করে ওরা নদীপথে দেশের ভিতরে ঢুকে পড়ত। বাজার, হাট, জনবসতিতে লুঠপাট চালাত। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। শক্তসমর্থ-পুরুষদের খ্রীষ্টান করত। আর তাদের সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করত দস্যুতার সময়। ওদের কোন জাত বিচার ছিল না। চট্টগ্রাম থেকে হুগলি পর্যন্ত কোন স্থানই নিরাপদ ছিল না মানুষের পক্ষে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদী তীরবর্তী জনপদে মানুষের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। এমন কি ওদের ভয়ে নদী তীরবর্তী কোন বাড়িতে রাতে আলো জ্বালান হত না। দেশীয় বণিকরা নদীপথে বাণিজ্য বন্ধ করেছিল বাধ্য হয়ে। বাঙলার দক্ষিণাংশের মনুষ্যশূন্য হওয়ার পিছনের কারণ যে ফিরিঙ্গি ও মগদের অত্যাচার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইংরেজ কোম্পানি যখন চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করছিল, তখনও কলকাতা ঐ সব দুর্বৃত্তদের সম্ভাব্য আক্রমণের কেন্দ্র ছিল। বিপদের আশঙ্কায়

কোম্পানি কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে শিবপুরের কাছে হুগলি নদীর ওপর একটি প্রকাশ্য লোহার শিকল ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া একটি বাঁধও তৈরি করে। দুটি বিবরণে আছে ঃ

"The sundarbans were infested by these corsairs and a chain had to be run across the Hoogly between Calcutta and Sibpur to prevent them extending their raid up the river." (O' Malley, Gazetter, 24 Parganas).

* * *

"In 1770, the Government has a fund thrown across the river near the site of Botanical Gardens to prevent them (mage) and the Partuguese pirates coming up".—Rev. J. Long, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1864.

এজন্য বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে নির্মিত দুর্গটি মগ বা মাকেয়া কেল্লা নামে পরিচিত ছিল। জনসাধারণের মধ্যে মগ ভীতি এত প্রবল ছিল যে, কেউ ঐ দুর্গের দক্ষিণে গিয়ে স্নান করত না। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত এই ভীতি যে প্রবল ছিল তা রেভারেন্ড লঙের বিবরণে জানা যায়। কিন্তু ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মগদের অত্যাচারও বন্ধ হয়ে যায়।

সুন্দরবন

বৈচিত্র্যময় অরণ্য সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে সুন্দরবন পূর্ব পশ্চিমে একশত মাইল এবং প্রস্থে কোথাও ষাট, কোথাও আশি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে মেঘনা নদী প্রবাহিত। দেশভাগের আগে সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চব্বিশপরগণার বিস্তৃত অঞ্চল। আয়তন ছিল ৩ হাজার ৮৯ বর্গমাইল। দেশভাগের পর চব্বিশপরগণার মাত্র ১৬৩০ বর্গমাইল বা ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত সুন্দরবনাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩৩ সালের পর থেকেই জঙ্গল হাসিল ও বসতি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল। আর ১৮৩১ সালে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডার্মাপিয়ার হগস রেখা টেনে সুন্দরবনের সীমানা নির্দেশ করে এইভাবে: উত্তর-পূর্বে বসিরহাট নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কুলপীর কাছে হুগলি নদী পর্যন্ত। আর পূর্ব দিকে ইছামতী, কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদী। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে হুগলি নদী। তারপর থেকেই পরিকল্পিতভাবে বসতিস্থাপন শুরু হয়ে যায়। বেশির ভাগ এলাকার জল লবণাক্ত হওয়ায় কৃষি ও পানের অযোগ্য।

সুন্দরবনে অনিবার্য ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও ঝঞ্ঝা। তার হাত থেকে রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে ৩,৫০০ কিলোমিটার বাঁধ। ৫৪টি দ্বীপের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা নদী প্রবাহিত। আর রয়েছে খাঁড়ি। রেলপথ আছে মাত্র ৪২ কিলোমিটার এলাকায়। পাকা রাস্তার পরিমাণ ২৫০ কিলোমিটার। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুসারে সুন্দরবন অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ। রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় ১০০০ টাকা হলেও, সুন্দরবন অঞ্চলে ৪৪৪ টাকা। অধিবাসীদের মধ্যে ৮৮.৫ শতাংশ কৃষি নির্ভর, সমগ্র রাজ্যে এই পরিমাণ হল ৫৭.৫ শতাংশ। তপসিল ভুক্ত সম্প্রদায় ও আদিবাসীর অনুপাত ৪২ শতাংশ; সমগ্র রাজ্যে মোট সংখ্যায় এই পরিমাণ হল ২৫.৬ শতাংশ। এই অঞ্চলে ৫০.২ জনই ভূমিহীন কৃষি মজুর; সমগ্র রাজ্যে এই পরিমাণ হল ৪৪.৮ শতাংশ। শতকরা ৪৪.৩ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। মূল ভূখণ্ড ছাড়াও এই এলাকায় ৫৪টি দ্বীপ। নদী, নালা ও খাঁড়ি দিয়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন জটিল, তেমনি এখানে জীবনধারণও কষ্টসাধ্য। বন কেটে বসতি ও চাষের জমি তৈরি হয়েছে। সমুদ্রের নোনা জলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সমগ্র সুন্দরবনে এই জাতীয় বাঁধের পরিমাণ বাইশ শত মাইলের মত। ভূমিক্ষয় খুবই প্রকট। সুন্দরবনের আয়তন ১৬৩০ বর্গমাইল হলেও, চারভাগের

একভাগ হল নদীনালা পূর্ণ। নদীবেষ্টিত স্থলভাগ দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত. জোয়ায়ের সময় ডুবে যায়, জোয়ারের জল নেমে গেলে আবার ভেসে ওঠে। দ্বীপগুলির মাঝখান নিচু ও জলাভূমি। বর্ষার সময় অবশ্য বেশির ভাগ দ্বীপই জলের নিচে :চলে যায়। আবার শীতে জেগে ওঠে। এসব দ্বীপের ওপরভাগ এঁটেল মাটি ও বালিপূর্ণ।

চন্দ্রবন বা সমুদ্রবন থেকে সুন্দরবন নামকরণ হয়েছে—এ অনুমান অনেকের। কিন্তু সুন্দরী বৃক্ষের কারণে সুন্দরবন এই অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

সমতট বা বগড়ী বা ব্যাঘ্রতটী নামে সমুদ্র উপকূলে যে রাজ্য ছিল, সুন্দরবন ছিল তার অন্তর্গত। এই রাজ্যর বহুস্থানে দিগম্বর জৈন, ত্রিশটি বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘরাম এবং শতাধিক হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্। এসবের চিহ্নমাত্র নেই। সম্ভবত এগুলি চলে গেছে মাটি গর্ভে। কারণ, এখানকার নরম মাটির বারবার অবনমন ঘটেছে। কিন্তু সাগরদ্বীপের কাছে এবং খুলনা জেলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন এখনও চোখে পড়ে। মুসলমান আমলে সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিচিত ছিল ভাটি প্রদেশ নামে।

সুন্দরবনের নানা স্থানে কয়েকটি নগরীর অবস্থান সম্পর্কে জানা গেলেও, তাদের ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে সাধারণত দুটি মত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে এইসব জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, সুন্দরবনের নরম মাটি অনেক সময় নিচে নেমে গিয়ে জনপদগুলিকে ধ্বংস করেছে, যে কারণে, সুন্দরবনের বহুস্থানে মাটি খুঁড়ে পুকুর, মন্দির ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবার কারো কারো অভিমত, সুন্দরবনে বৃহৎ কোন জনবসতি ছিল না। কিছু সাহসী ব্যক্তি বিক্ষিপ্তভাবে আবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল মাত্র।

চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চমের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে সুন্দরবন। এর মধ্যে পড়ছে আলিপুর সদরের জয়নগর ও ক্যানিং-এর কিছু অংশ, সন্দেশখালি, গোসাবা ও হাসনাবাদ পুলিশ স্টেশনের অংশ এবং ডায়মন্ড-হারবার মহকুমার মথুরাপুর ও সাগর পুলিশ স্টেশন। কিন্তু বিখ্যাত সুন্দরবন হল একেবারে সর্বদক্ষিণে সংরক্ষিত অঞ্চল। সুন্দরবনের বেশির ভাগ অংশের জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ হচ্ছে। আজকের যে কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত—আদিতে সুন্দরবন কী ছিল! সেই জঙ্গলে ভয়ে দিনের বেলায় মানুষ প্রবেশ করত না। সূর্যের আলো ঢোকারও পথ ছিল না, এমন জঙ্গলাবৃত। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াত

অসীম ক্ষমতাশালী বাঘের দল। নদীর ধারে অসহায়ভাবে শুয়ে থাকত নির্মম কুমীরের দল। রঙবেরঙের-হরিণের দল ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করত। জানা-অজানা পাখির কলরবে জঙ্গলের ঘুমও হারিয়ে গিয়েছিল।

চব্বিশ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকে (১৯৫১) সুন্দরবন সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যের কিছু কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল। যার মধ্যে পাওয়া যাবে অঞ্চলটির ভৌগোলিক ও ইতিহাসগত বিবরণ। "The Sunderban is the name commonly given to all the southern portion of the delta of the Ganges ; but in its stricter sense it means so much of that portion of the delta as was excluded from the permanent settlement. The Sunderbans stretch from the Hooghly on the west to the Meghna, the estuary of the Ganges and Brahamaputra on the east, and comprise, Khulna and Bhakarganj." (pp.CXXXIV)

"The extent of Sunderbans from west to east is 150 miles and its breadth from north to south is about fifty-eight miles. It is bounded on the north by the Zemindaree lands of the districts of 24-Pargans, Krishnanagar, Jessore and of Backhergunge, to the south is the Bay of Bengal, east, the mouths of the Ganges and of the Meghna and west, the Hooghly river." (pp. CXVII).

"Various derivations have been suggested for the word Sunderban but only two appear probable. One is *Sundari*, the *Sundri* tree, and *Ban*, forest, the whole word meaning *the Sundri forest*, and the other, *Samudra* (through its corrupted and vulgar form *Samudar*), the sea, and *ban* forest, the whole meaning *the forest near the sea*. There are two arguments in favour of the former derivation, first, that the Sundri tree is the commonest tree there and secondly, that the word sometimes locally pronounced the *Sunderban*. There is one argument in favour of the second derivation, the word *Samudravana*, occurs in Sanskrit authors as meaning large forest tracts near the sea. Another view is that the *Soondarbuns* take their name from two Hindu words, meaning the *Beautiful forest*." (pp. CXXXIV).

"The earliest picture of Sunderban area is depicted in the letter of Mr. Tilman Henckle, the Judge and Magistrate of Jessore and 'Superintendent of Soonderbans', addressed to Hon'ble Warren Hastings, Governor-General of India, dated 21st December, 1783 in which he also schemed to reclaim and populate this tract of forest.

That it is practicable to populate this wild and extensive forest, and not a mere speculative idea, we have only to recur to the times of the Mogul Government, and we shall find that prior to the invasion of the Mughs in Bengal, year 1128, these lands were in the finest state of cultivation, and the villages in general well populated. The number of mosques and other places of worship still remaining, fully demonstrate its former splender and magnificence'. (pp. CXVIII). আর একটি তথ্যে প্রকাশ ঃ

"The name Sunderbund hath also been derived from that of Sundery, with which the territory abounds ; and with more learned in genuity, from two Shanscrit words, *Soonder* beautiful, and *Ban*, woods or jungle. But we adhere to our own etymology rather, because the place was probably known and named before its growth of wood ; and when in its primitive state, the effect of the tides in forming sand banks at the several mouths of the Ganges might have been observed, as is reasonable to suppose, from its being always included under the local description of Bhatty, with all the neighbouring low lands overflowed by the tides ; also because however beautiful these woods might now appear to an ingenious poetical fancy, as they were rarely traversed, being for the most part an impenetrable thicket, or if sometimes partially explored in pilgrimages of cold and timid Brahimins, it must be under a sentiment of terror in meeting beasts of prey, which would suggest a different epithet to beautiful ; but above all, because the richest and greatest parts of the Sunderbunds, is still comprised in

the ancient zemindary pergonnah of chunder deep, or humau territory." (Firminger, Fifth Report, Vol. II p. 183)

বার শতক পর্যন্ত সুন্দরবনের একটি চিত্র এখানে সুস্পষ্ট। তারপর মগ অত্যাচারে সুন্দরবনের পূর্বাংশ সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সমগ্র অঞ্চলটি জঙ্গলাবৃত হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য অংশে মানুষের বসতি ষোল শতক (১৫০০) পর্যন্ত ছিল অক্ষুণ্ণ। তারপর দীর্ঘ দিন চলে পর্তুগীজদের অমানুষিক হামলা। যার ফলে এই অংশে মানুষের বসতি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চব্বিশ পরগণার জমিদারি লাভ করে। ১৭৬৫ সালে এই রাজ্য শাসনের ব্যবস্থাও তারা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সুন্দরবন অঞ্চলেও তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। কয়েকজন ইংরেজ শাসক এই জঙ্গলময় অনাবাদী জমি পরিষ্কার করার ওপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। এর পক্ষে পরিকল্পনাও পেশ করেন। তাদের মধ্যে চব্বিশপরগণার কালেকটর জেনারেল ক্লড রাসেল এবং টিলম্যান হেঙ্কেলের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যে কিছু জমি লিজও দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ক্লড রাসেল। এইসব জমি জমিদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। ১৭৮৩ সালে টিলম্যান হেঙ্কেল দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেন। ছোট ছোট প্লটে জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব দেন তিনি। জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাসের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ১৭৮৩ সালের ২১ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ

"A plan has suggested itself to me, which I am confident, if adopted, would not only eradicate these nest of marauders, but in course of a few years bring a great addition of revenue to Government, I mean that large tract of waste land, called the Sunderbans, appertaining to Jessore, situated between the Roymungul and Horinguttah rivers."

এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন লেফটন্যান্ট ডবলু ই মরিশন। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল বাদে সুন্দরবন এলাকা জরিপ করেন ১৮১১-১৮১৪ সালের মধ্যে। মরিশনের অসম্পূর্ণ কাজ সমাধা করেন তার ভাই ক্যাপ্টেন হিউজ মরিশন ১৮১৮ সালে। এই সময়ে সুন্দরবনের জন্য কালেকটরের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন কমিশনার নিয়োগ করে সরকার। ১৮২২-২৩ সালের মধ্যে যমুনা থেকে হুগলি নদী পর্যন্ত সুন্দরবনের গহীন অরণ্য পরিমাপ করেন প্রিন্সেপ। তিনি মরিশনের ম্যাপের সাহায্যে সমস্ত জঙ্গল এলাকাকে নদীসহ কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে, সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেন।

এভাবেই সুন্দরবনে লটের সৃষ্টি। ১৮৩১ সালে লেফটন্যান্ট হোজেসের ম্যাপে সুন্দরবনের ২,৬৬০ বর্গ মাইল বা ১,৭০২,৪২০ একর এলাকায় ২৩৬টি ব্লকের চিহ্নিত-করণ হয়। ১৮৩০ সালে সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা সাধারণের মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ১৮৩০-৩১ সালের মধ্যে ৯৮টি লট বিতরণ করা হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও বারটি লট বিতরিত হয়েছিল। মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৫১, ৫২০ একর। ১৮৫৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এইসব অনাবাদী ও জঙ্গল এলাকা বিতরণের জন্য নতুন আইন তৈরি হয়। নতুন আইন অনুসারে জমি দ্রুত পরিষ্কার হতে থাকে। ১৭৮টি লট বিতরিত জমির মধ্যে য়ুরোপীয় ৩০, আর্মেনিয়ান ১, দেশীয় খৃস্টান ২, মুসলমান ৩০ এবং হিন্দুরা ১০৫টি লট পেয়েছিল। ১৮৬৩ সালের ওয়েস্ট ল্যান্ড রুল জারী হওয়ার পর ১৮৬৫ থেকে ৬৬ সালের মধ্যে আরও ১৩টি লট বিতরণ করা হয়।

বাঁধ দিয়ে জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পুকুর কাটা ও কুঁড়েঘর তৈরি হতে থাকে। বহিরাগত জঙ্গল পরিষ্কারকারী শ্রমিকদের জন্য কুঠি, খাবার, পানীয় জল ও বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। লট গ্রহণকারী বা লাটদারদের সুন্দরবনের গাছপালা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। দ্রুত জঙ্গল পরিষ্কার করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। মূল্যবান গাছগুলি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ছোটনাগপুর থেকে আগত ও মগ শ্রমিকদের নিয়োগ করে লাটদাররা নির্বিচারে গাছ কেটে গেছে। যার ফলে অসংখ্য মূল্যবান গাছ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ছোটনাগপুর থেকে এই সময়ে বহু ওরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, ভূমিজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছিল।

চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলার অরণ্য অঞ্চল ১৮৭৩ সালে বন দপ্তরের অধীনে আসে। এই অরণ্য অঞ্চল সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়। সংরক্ষিত অঞ্চলের পাশ দিয়ে কাঠুরেদের কাঠ কাটার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন নদীমুখে টোল স্টেশন স্থাপিত হয় কাঠুরেদের উপর নজর রাখার জন্য। ১৯04 সালে বাঙলা সরকার ভারত সরকারের কাছে চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনাঞ্চলে রায়তদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ১৯১০ সালে এই ব্যবস্থা আর্থিক কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ১৯১৫ সালে। মধ্যবর্তী কয়েক বছর জঙ্গল হাসিল বা বসতি গড়ার কোন কাজ হয়নি। তারপর থেকে আবার পরিবর্তন ঘটে।

সুন্দরবন অসংখ্য নদীনালা সমাকীর্ণ। নদীগুলি সমান্তরালভাবে দক্ষিণে প্রবাহিত। আর অসংখ্য খাল পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে এইসব নদীকে যুক্ত করেছে। ফলে এক নদী থেকে অন্য নদীতে যাওয়া যায় সহজেই। সব নদীতেই জোয়ারভাটা খেলে। বর্ষার সময় দুই বিপরীতমুখী স্রোত বয়ে যায় নদীতে। সমুদ্রের স্রোত দক্ষিণ থেকে

উত্তরে, আর বর্ষার জলধারা প্রবাহিত হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে। সুন্দরবনের নদীতে গঙ্গার কোন প্রভাব নেই। সামুদ্রিক জলের আধিক্যের কারণে বেশির ভাগ নদীর জল লবণাক্ত। শীতকালে এই লবণের পরিমাণ বাড়ে। সুন্দরবনের পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা। বারাতলা, মাতলা, গোসাবা, হাড়োয়া গাঙ, হাড়িয়াডাঙা, রায়মঙ্গল, কুলটিগাঙ, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ বা জামীরা, বিদ্যা, কলাগাছিয়া,—এসব ছাড়াও আছে বেশ কিছু নদনদী। জোয়ারের জলে সুন্দরবনের নিম্নভূমি ডুবে যায় এবং পলিমাটি জমে বিস্তৃত এলাকা গড়ে উঠেছে।

সুন্দরবনের ঘনবনাঞ্চল পশ্চিমে সপ্তমুখীর মোহানা থেকে পূর্বে রায়মঙ্গল নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর সংকীর্ণ হয়ে শেষ হয়েছে সাহেবখালি গ্রামের কাছে। গাছপালার অভাব নেই। সুঁদরী, পাশুর, বাইন, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, কাঁকরা, গেঁয়ো, গর্জন, হেন্তাল, বলা, বনঝাউ, গাব এবং আরো কয়েকরকম গাছপালা আছে। পশ্চিম সুন্দরবনের ৬০৩০ বর্গমাইল এলাকা অরণ্য সমাকীর্ণ।

সুঁদরী গাছ সাধারণত ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুলের রঙ হলুদ। কাঠের রঙ লাল ও যথেষ্ট শক্ত। পাতা ছোট ছোট। উপরদিক মসৃণ এবং নিচের দিকের বর্ণ ধূসর। এই গাছের কাঠ থেকে মজবুত নৌকা তৈরি হয়। প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনীর জলযানগুলির বেশিরভাগ ছিল এই কাঠে তৈরি। চেয়ার টেবিলও তৈরি করা যায়।

সুঁদরী গাছের মতই আর একটি দীর্ঘ গাছ পাশুর। বেশ শক্ত কাঠ। কাঠের রঙ সাদা দেখতে হলেও, পরে লালচে হয়ে যায়। এক ধরনের আঠা পাওয়া যায় এই গাছ থেকে। পাশুর গাছের ফল থেকে একধরনের তেল তৈরি হয় যা রেড়ির তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। কাঠ দিয়ে খুঁটি বানানো হয়। ভাল তক্তা পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের বড় বড় নদীর ধারে বা চরে ৫০।৬০ ফুট লম্বা কেওড়া জাতীয় গাছ জন্মায়। কাঠ বেশ শক্ত ও মজবুত। আসবাবপত্র তৈরি করা যায়। গাছের পাতা বানর ও হরিণে খায়। কেওড়ার টক জাতীয় ফল স্থানীয় লোকে আহরণ করে খায়। এই ফল হরিণের প্রিয় খাদ্য। কেওড়া গাছের তলায় এসে হরিণ জমা হয় এবং শিকারীর হাতে ধরা পড়ে।

৩০।৫০ফুট লম্বা গেঁয়ো গাছের কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাঠের রঙ সাদা। কাঠ খুব পাতলা। বড় গেঁয়ো গাছের গুঁড়ি থেকে ঢোলক ও তবলা বানান হয়ে থাকে। ধোন্দল বা গাম্মুর গাছ প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হয়। পাশুর কাঠের মত শক্ত ও মজবুত। এই গাছের ফল চামড়া পরিষ্কারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফল হয় কুমড়ার মত এবং মিষ্টি।

গরাণ গাছ লম্বায় ১২ থেকে ২০ ফুট। কাঠ বেশ শক্ত। ঘরের খুঁটি বানাতে লাগে। কাঠ থেকে ভাল জাতের কাঠকয়লা তৈরি হয়। শক্ত লাল রঙের কাঠ। গাছের ছাল থেকে একজাতীয় লাল রঙ তৈরি হয়। তাছাড়া গাছের ছাল চামড়া পরিষ্কারেও লাগে। সমুদ্রের ধারে ৪০ ফুট লম্বা কাঁকড়া গাছ জন্মায়। ঘরের কড়িবরগা খুঁটি তৈরি হয়। এই গাছের ছালেও চামড়া পরিষ্কার হয়।

যেসব এলাকা প্রতিদিন জোয়ারের জলে ডুবে যায়, সেখানে বাণগাছ বা ম্যানগ্রোভ দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে।

সুন্দরবনের গোলপাতা ও হোগলা আজও দরিদ্র বাঙালীর গৃহ নির্মাণের অন্যতম উপকরণ। নদীর ধারে বা জলাভূমিতে হোগলা গাছ জন্মায় প্রচুর পরিমাণে। ফল বেশ মিষ্ট ও সুস্বাদু। পাতা ব্যবহৃত হয় ঘর ছাওয়ার কাজে। নরমপাতা দিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি হয়।

এক ধরনের গাছের নাম জেঙ্গুয়া। এই গাছের কাঠ থেকে দেশালাই বাক্স ও প্যাকিং বাক্স তৈরি হত। তাছাড়া গেওয়া গাছ নিউজপ্রিন্ট তৈয়ারির অন্যতম উপাদান।

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে গর্জন গাছ দেখা যায়। চারদিক শিকড় বেরিয়ে গাছটিকে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে। ছোট ছোট ফুল। সজিনার মত লম্বা খাঁড়া জন্মায় ফুল থেকে। পাতা বেশ পুরু। এই গাছের কাঠ তেমন মজবুত নয়। গর্জন তেল প্রতিমা বা মূর্তি রঙ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই তেলে কুষ্ঠরোগও নিরাময় হয়।

পাইন গাছও কাঠের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য। ভাল তক্তা পাওয়া যায়। বয়স্ক গাছের গুঁড়ি ২০।২৫ ফুট পরিধি বিশিষ্ট হতে দেখা যায়।

হেন্তাল গাছ লম্বায় ১৫ ফুটের বেশি হয় না। এক জায়গায় বেশ কিছু গাছ থাকে। গাছ থেকে লাঠি বানানো হয়। খুব বেশি মোটা নয় এই গাছ। হেন্তাল গাছের নিচে বাঘ থাকে বেশি। বলাসুন্দরী ও হে'দো গাছের বনও বাঘের প্রিয়।

অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে ওড়া, খলসী, করঞ্জ, হিঙ্গে, গড়িয়া, সিঙ্গুড়, খলসী, ভাঁড়ার প্রভৃতি। তাছাড়া আছে গাব, বনঝাউ, হরগোছা, ওড়াধান, কাশা, তুলাটেপারী গাছ। সুন্দরবনে বেত ও গিলেলতার বনও দেখা যায়।

সুন্দরবন থেকে বছরে প্রায় ৬ হাজার মণ মধু ও মোম সংগ্রহ করা যায়। খলসী ও সিঙড়া ফুলের মধু সব থেকে লোভনীয় স্বাদে ও গন্ধে। কিন্তু বেশি মধু পাওয়া যায় গরাণ গাছের ফুল থেকে। কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহের জন্য বনে প্রবেশের অনুমতি নিতে হয়। যেসব জায়গায় অনুমতি পত্র পাওয়া যায়—সাহেবখালি, রামপুর, বাসন্তী, মাতলা, কুলতলা, নলগোরা, নামখানা ও শিকারপুর।

হিংস্র জন্তু-জানোয়ার সমাকীর্ণ সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ ও নির্মম নৃশংস প্রাণী হলদে রঙের কালো ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা কেঁদো বাঘ। অসম্ভব শক্তিশালী এই জানোয়ার ৩।৪ ফুট উঁচু এবং লম্বায় ১০ থেকে ১২ ফুট। প্রতিবছর বহু কাঠুরে ও মধু সংগ্রাহক এদের হাতে মারা পড়ে। বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ শিকার আইন করে বন্ধ করা হয়েছে।

সুন্দরবনের আর একটি হিংস্র প্রাণী কুমীর। খাঁড়ি, নদী, নালা সর্বত্র কুমীর দেখা যেত। এদের হিংস্র স্বভাবের বহু কাহিনী প্রচারিত। কিন্তু শিকারীদের হাতে কুমীর প্রায় নিঃশেষিত হতে চলেছিল। বুনোশুয়োর আছে বিস্তর। এরাও যথেষ্ট হিংস্র। বন্য মহিষ বা বয়ারও কম হিংস্র নয়। বানর ও হরিণ আছে নানারকমের। চিতা হরিণ ও কুকুরে হরিণ সব থেকে বেশি দেখা যায়। সজারু ও বন বিড়ালও দেখা যায়।
সুন্দরবনের অজগর আকারে প্রকাণ্ড। একটি মানুষ বা হরিণ গিলে ফেলতে তাদের অসুবিধা হয় না। কেউটে, গোখরো, পাতরাজ, মণিরাজ, ধনীরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচূড়, মণিচূড়, নাগরচাঁদ, কানড়, শাঁখামুটি এবং আরো বহু রকমের সাপ দেখতে পাওয়া যায়।
সুন্দরবনের গণ্ডারও একসময় ছিল বিখ্যাত। বহুকাল হল তারা নিঃশেষিত।। অরণ্য প্রাণী শিকারীদের হাতে নিঃশেষিত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় সরকারকে আইন করে বন্য প্রাণী রক্ষা করতে হয়েছে। সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে একটি বিবরণে আছে ঃ"
We must still view it as a curious and anomalous tract, for here we see a surface soil composed of black liquid mud supporting the huge rhinoceros, the sharp-hoofed hog, the mud-hating tiger and the delicate and fastidiously clean spotted deer, and nourishing and upholding large timber trees; we see fishes climbing trees, tides running in two directions in the same creek and at the same moment."—An article on the *Gangetic Delta,* Calcutta Review, 1859).

সুন্দরবনে মাছের অভাব নেই। ভেটকী, গলদাচিংড়ি, পারশে, ভাঙন, খরশুল্যা, চিত্রা, রেখা, রুচা, দাঁতনে, ভোলা, জাবা বা পোয়া, ট্যাংরা, ফ্যাসা, গাঙখয়রা, সিলিন্দা, পাঙাস, আইড়, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি আছে এখানকার নদীনালায়। মানুষে মাছ খায়। আবার শিকার না মিললে, ভাটার সময় নদীতে নেমে বাঘে মাছ খায়। তাছাড়া আছে অসংখ্য মাছ খেকো পাখির উৎপাত। ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত দিনে ৩০০ মণ মাছ

চালান গেছে কলকাতায়। তাছাড়া এ অঞ্চলের প্রচুর হাঁসের ডিম পাঠান হত কলকাতার বাজারে। ডিমের বাজার এখন নষ্ট হয়ে গেছে। এক সময় হাঁস পালনের থেকেই এই ডিম পাওয়া যেত।

সুন্দরবনের নানা জাতের পাখির উল্লেখ করেছেন সতীশচন্দ্র মিত্র। তার কয়েকটি এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। তাঁর উল্লিখিত পাখিগুলির মধ্যে আছে কুল্যা, চিল, বক, কাক, মাছাল, মাছরাঙা, চাতক, মদনটাক, শামখোল, মাণিক, গয়াল, বালিহাঁস, বনমোরগ, ঘুঘু, দোয়েল, হলদে পাখি, ফিঙা, হটটিটি বাটাং, কুকড়ো বাটাং, চিড়ে বাটাং, বৈকুণ্ঠ, দুধরাজ, ভীমরাজ প্রভৃতি। কুল্যা পাখি আকারে সব থেকে বড়। সুন্দরবনের কাকের সঙ্গে আমাদের পরিচিত কাকের কোন সাদৃশ্য নেই।
বর্তমানে সুন্দরবনে তিনটি অভয়ারণ্য রয়েছে। সে তিনটি হল—লোথিয়াল দ্বীপ (১৪·৬৭ বর্গ মাইল), হ্যালিডে দ্বীপ (২·৩ বর্গ মাইল) এবং সজনেখালি (১৩৯·২৯ বর্গমাইল)। সব থেকে আকর্ষণীয় শীতের সজনেখালি। অসময়ে দেশবিদেশের নানারকম পাখি আসে এখানে।

পরীক্ষার পর সুন্দরবনে চার ধরনের মাটির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। (১) বালিয়াড়া বা দোসরা মাটি ঃ এই মাটি চাষের অনুপযোগী। রঙ লাল। বেশির ভাগ সময় ভিজে থাকে। (২) ঢপ বা চুরা ঃ এই মাটির রঙ সাদা। লবণের ভাগ বেশি। চাষের অনুপযুক্ত। বৃষ্টিতে লবণ ধুয়ে গেলে সামান্য ফলন হয়। (৩) ঢাল—এই মাটির রঙও লাল। নিচু এলাকায় এই ধরনের মাটি দেখা যায়। বর্ষার সময় ধান চাষ করা যায়। (৪) মাটিয়াল ঃ সাদা রঙের এই মাটিতে পাটনাই ধানের চাষ হয় সব থেকে ভাল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সুন্দরবনের বেশির ভাগ নদীর জল লবণাক্ত। তাছাড়া মাটি লবণাক্ত হওয়ায়, চাষবাসের অনুপযোগী। তবে সুন্দরবন উন্নয়নের বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বৃষ্টিজল সংরক্ষণ ও জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নদীবাহিত পলিমাটির ওপর বিস্তৃত ভূভাগ গড়ে ওঠায় চাষের উপযোগী। উর্বর মাটি হলেও, তাকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে, পর্যাপ্ত ফলনও পাওয়া যায় না। জমি উদ্ধারের জন্য প্রথম থেকেই সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁধ দেওয়া হতে থাকে। ২২০০ মাইলেরও বেশি বাঁধ দেওয়া হয় ১২০ বছরের মধ্যে। এর ফলে উপকার থেকে অপকারের মাত্রাই বেড়েছে। বাঁধগুলি বছরের পর বছর উচ্চতায়

বেড়েছে। যার ফলে নদী বাহিত পলি এসে পার্শ্ববর্তী জমির উর্বরতা বাড়ায়নি। নদী বক্ষে সেই পলি জমে, নদীবক্ষকেই উঁচু করে তুলেছে। বাঁধে বন্ধ জমি নোনা হাওয়ার প্রভাবে উর্বরতা শক্তি হারিয়েছে। এদিকে নদীবক্ষ কোথাও কোথাও পাশের জমি থেকে উঁচু হয়ে পড়ায়, তার গতিও হয়েছে মন্থর। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বাঁধের উচ্চতা। কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়ায়, ফলনও কমেছে ধীরে ধীরে। ১৯৪৪ সালের পর থেকে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালের আগে শহর কলকাতায় বালাম চাল আসত বরিশাল থেকে। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত এই চাল একাই সরবরাহ করে সুন্দরবন। তখন এখানে পাটনাই চাল উৎপন্ন হত প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু ১৯৪৭ ও ৪৮ সালে ধানের উৎপাদন কমে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩১ ও ৩১৪ হাজার টন। ১৯৫০ সালে একর প্রতি ধান উৎপাদন হত মাত্র ১৮ মণ। ১৯৭১ সালে হয় মাত্র ১২।১৩ মণ।

হাসানাবাদ, হাড়োয়া, ভাঙড় ও রাজারহাট অঞ্চল ৪০০ বর্গমাইল এক সময় সুন্দরবনেরই অংশ ছিল। টাকী থেকে সুন্দরবন চোখে পড়ে। প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বসতি গড়ে উঠেছে একশ বছরের আগে। অরণ্যময় সুন্দরবনের জায়গায় গ্রাম আর আবাদ অঞ্চল ছাড়িয়ে আছে। গোবরাখাল দিয়ে হাসানাবাদ অঞ্চলের নিম্ন ভূভাগের জল প্রবাহিত হয়। গোবরাখালের উৎপত্তি স্থল হল হাসানাবাদের কাছে যমুনা এবং দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সন্দেশখালির কাছে বিদ্যাধরীতে মিশেছে। হাড়োয়া অঞ্চলেও আছে অজস্র নদী। নদীগুলি পরস্পর সংযুক্ত। এই নদীর জল এক সময় গিয়ে পড়ত পায়না আবাদে। আবাদটি ছিল বেশ বড় ও বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত। কিন্তু বাঁধ ভেঙে গিয়ে আবাদ জলাকীর্ণ থাকত সারা বছর। কারণ বাঁধের সংস্কার হয়নি। এইভাবে সুন্দরবনের বহু আবাদ নষ্ট হয়েছে। চাষের জন্যে তৈরি জমি অবশেষে মাছ চাষের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গোয়াবারিয়া আবাদেরও একই পরিণতি হয়েছিল। ক্যানিং এর কাছে আমঝাড়া গ্রামের উৎকৃষ্ট চাষের জমি এভাবেই নষ্ট হয়। আর পুনরুদ্ধার হয়নি। ভাঙড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালগুলি একসময় নৌ চলাচলের উপযোগী ছিল। ভাঙড় কাটাখালের সঙ্গে হাড়োয়া গাঙকে যুক্ত করেছে বিদ্যাধরী খাল। এখানকার বিলগুলির সঙ্গে কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমির সংযোগ ছিল। সে সব অতীত দিনের কথা। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ কৃষি জমিতে প্রচুর আমন ধান উৎপন্ন হত। এখন চাল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। হাসনাবাদ, রাজারহাট ও হাড়োয়া অঞ্চলে ফলন হয় বেশি। শাকসব্জি ও তরিতরকারি চালান যায় শহর কলকাতায়। প্রচুর হোগলা ও গোলপাতা জন্মায়।

উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের ১৩৮৯ বর্গমাইল—সন্দেশখালি, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ ও সাগর সহ পশ্চিমে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ চাষ হচ্ছে। যোগাযোগের রাস্তা আছে। তাছাড়া নৌকা ও স্টিমারেও সব ঋতুতে চলাচল করা যায়। জল নিঃসরণের ব্যবস্থা থাকায় ও লবণাক্ত জল থেকে চাষের জমিকে বাঁধ দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রগুলি খুব বেশি নষ্ট হতে পারেনি। আমন ধান ও শাকসব্জি প্রচুর উৎপন্ন হয়। বাসন্তীতে আছে সব থেকে বড় আবাদ। কাকদ্বীপ প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

সুন্দরবনের উন্নয়নে সমগ্র পশ্চিমবাঙলা উপকৃত হবে। এখনও সুন্দরবনে বিঘা প্রতি আমন ধানের উৎপাদন পশ্চিম বাঙলার মধ্যে সব থেকে বেশি। মাছ, মধু ও জ্বালানি কাঠ আসে এখান থেকে। চীনাবাদাম, লঙ্কা ও তুলার চাষ ব্যাপক হতে পারে। মাছ চাষের সম্ভাবনা সব থেকে উজ্জ্বল। সুন্দরবনের মাটি অতিরিক্ত লবণযুক্ত হওয়ায় চাষবাসের অনুপযোগী। কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন জায়গার জঙ্গল কেটে বৃষ্টির জল সংরক্ষিত করে চাষবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। সুন্দরবনের একটি উন্নত জনপদ গোসাবা লোকবসতি বেশি নয়। কিন্তু কুটীরশিল্প, দুগ্ধ শিল্প, পশুপালন, মৎস্য চাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ায় অধিবাসীদের জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য।

শতকরা ৯৪৬১টি পরিবারই কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর বাকিমাত্র শতকরা ৫৩৯টি পরিবার মাছ, বন, হাতের কাজ ইত্যাদি অকৃষি ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করে। কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ৫৪·২১ ভাগ লোকের নিজস্ব জমি নেই।

সুন্দরবনে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। ১ লক্ষ টাকা নিয়ে পর্ষদের কাজ শুরু হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ টাকা। জেটি, সেতু, রাস্তা নির্মাণে প্রথম দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৪টি জেটি নির্মিত হয় এই সময়ে। তার মধ্যে ছিল ক্যানিং, পাথর প্রতিমা, ছোট মোল্লাখালি, ভাঙা তুতখালি,, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, চৈতাল, মালঞ্চ, কুয়েমুড়ি, নলগোড়া, হার্ডউড পয়েন্ট ও সন্দেশখালি। তারপর তৈরি হয় বাসন্তী ও ভাঙন খালিতে। খাল ও পুকুর সংস্কার, রিং ও ক্রস বাঁধ নির্মাণ, সেচের জল সংরক্ষণ, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার, কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার কাজ শুরু করে পর্ষদ। ২৬টি বিকাশকেন্দ্র গড়ে তোলা হয় দক্ষিণ বারাসাত, মাধবনগর, কুয়েমুড়ি, গণেশপুর, মথুরাপুর, রায়দীঘি, নামখানা, বামনখালি, মাধবপুর, বাসন্তী, ক্যানিং, কালীনগর, ছোটমোল্লাখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, দলদুলি, মুরারিশা,

ঘুঁটিয়ারী শরীফ, দেউলি,। নতুন হাট, যাদবপুর, মধ্য গুড়গুড়িয়া, দয়াপুর, ভাঙা, তুতখালি, পুরুষোত্তমপুর ও ডোবিয়ায়। স্থানীয় কৃষক, কারুশিল্পী, হাস মুরগী শুকর ও গোপালক ও মৎস্যজীবীরা এ সব বিকাশ কেন্দ্র থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে। পর্ষদ কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক দ্রব্য সরবরাহ করে। সহজ কিস্তিতে ও কম সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়।

সুন্দরবন উন্নয়নে বর্তমানে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। নানাধরনের পরিকল্পনাও রচিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানবকল্যাণে লাগাবার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে সুন্দরবন উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ টাকা। এই টাকার অংক বেড়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে হয়েছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই টাকা কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, সে সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়ঃ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, একফসলী জমিকে দুই বা তিনফসলী জমিতে রূপান্তর, কৃষি বিজ্ঞানের প্রসার, সামাজিক বনসম্পদ সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য চাষ, মজাখাল ও পুকুরের সংস্কার, নারকেল, পেঁপে, লেবু ও ফলের চাষ বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ, হাঁস-মুরগী-শুকর ও গোপালনে সাহায্য দান করা। ২৭টি বিশাল কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৫ শতাংশ। এ হার বাড়াবার জন্য শিক্ষা প্রসারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার করা হচ্ছে। স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের কাজ চলছে। সব থেকে বেশি উপকৃত হচ্ছেন ভূমিহীন চাষী, খেত মজুর, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী, তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষ।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের কার্যক্রম এক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আছে আইফাড অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতার গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল। আইফাড বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করছে। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইফাডের সাহায্যে যেসব কাজ এগিয়েছে, তার হিসাবে আছেঃ ইটের রাস্তা ২৩৪ কি. মি. ৬ জেটি নির্মাণ, ১৩০ সেতু ও কালভার্ট, ১০৩ এইচ. পি. স্লুইচ গেট, ৭০ কি. মি. মেইন ড্রেন, ১,১০০ হেক্টর ঘেরা বাঁধ। এসব কাজ সম্পূর্ণ। তাছাড়াও কাজ চলছে।

আইফাডের সাহায্যের বাইরে যেসব কাজ এগিয়েছে, তার মধ্যে আছেঃ ১০০ কি. মি. ইটের রাস্তা, ১৯ মজাখাল ও ৩৫৫ মজাপুকুর সংস্কার, ৫৬ কাঠের সেতু, ৩৪ কাঠের

জেটি, ২ ইট বাঁধানো জেটি, ৫ যাত্রী শেড, ১৫০ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সংস্কার হয়েছে ৫৫ স্লুইস গেটের। ক্রসবাঁধ নির্মিত হয়েছে ১০।

জয়নগর ২ ব্লকের নিমপীঠ এবং কাকদ্বীপের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় কেন্দ্র দুটি গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্যানিং ও নিমপীঠের বাজার উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ২৭টি বিকাশ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক উন্নয়নে অংশ নিচ্ছে। একফসলী জমিকে দোফসলী জমিতে রূপান্তরের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান দেওয়া হচ্ছে। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৭৭ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক অনুদান পেয়েছে। যার ফলে ১৩৩১২২ একর জমিতে শীতকালীন চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সাফল্যও ঘটেছে। এসব জমিতে তরমুজ, লঙ্কা, মুগ, সূর্যমুখী, গম, আলু, ঢ্যাঁড়স ইত্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে। বাড়তি উৎপাদনের আর্থিক মূল্য হয়েছে ১৬ কোটি টাকা। আর সরকারী অনুদানের পরিমাণ ৩৩১০৮৮৭০ টাকা। ২২৮৯৩৭ জন ভূমিহীন ক্ষেত মজুর ও কৃষক ২৬৭২২২ নারকেল চারা পেয়েছে। এজন্য খরচ হয়েছে ১১৩৯০০৪ টাকা। এইসব নারকেল গাছে চার বছরে মধ্যে ফল ধরবে। তাছাড়া দেওয়া হয়েছে লেবুচারা।

সামাজিক বনসম্পদ সৃষ্টির গুরুত্ব সুন্দরবনের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে ভূমিক্ষয় নিবারণ সম্ভব। এবং পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা পাবে। তাছাড়া পাওয়া যাবে জ্বালানি কাঠ, পশুর খাদ্য ও ফল। তিন রকম গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নদীর ধারে, ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হয়েছে। এর ফলে বাঁধগুলি রক্ষা পাবে। আর পাওয়া যাবে জ্বালানি কাঠ। ২,৫০০ কি. মি. এলাকায় এই বন সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা। তার মধ্যে প্রায় ২০০০ কি. মি. এলাকার কাজ শেষ।

নারকেল, সুপারি, সবেদা, কাজু, জাম, পেঁপে ইত্যাদির ১৩·৪ লক্ষ চারা ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের দেওয়া হয়েছে। স্কুল, কলেজ, সমবায় সংস্থা ও বেশ কিছু পরিবারও এই গাছ পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় আছে প্রায় ৬০০ হেক্টর এলাকা। তার মধ্যে ৩০০ হেক্টরে বনসৃজনের কাজ শেষ। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৬১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা।

সুন্দরবনের অন্যতম সম্পদ মাছ। পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ ও ধরার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার করে বাসন্তী থানার ঝাড়খালি দ্বীপে ৪০০ হেক্টর জমিতে গড়ে উঠেছে মৎস্য চাষ কেন্দ্র। ১২টি পুকুর ও ১৫০ হেক্টর এলাকায় আছে জলাধার।

এখানে নোনা জলের মাছ চাষের জন্য পরীক্ষা চালান হচ্ছে। তার মধ্যে আছে ভাঙান, ভেটকি ও বাগদা। কম খরচে উৎপাদন হল এই মৎস্য চাষ কেন্দ্রের লক্ষ্য। ঝড়খালির মাছ বাজারে সরবরাহের জন্য ক্যানিংয়ে একটি ১০ টন বরফ উৎপাদনক্ষম বরফ কল নির্মিত হচ্ছে। ঝড়খালির খামারটি মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি পরিচালনা করবে। সমবায়ভুক্ত প্রতিটি পরিবার ·০৫ হেক্টর জলক্ষেতের মালিকানা পাবে। এরকম আর একটি খামার তৈরি হচ্ছে নামখানা থানার মহিষাণি দ্বীপে। খামারটির আয়তন হবে ২০০ হেক্টর ; কাঁকড়ামারির মৌসানী দ্বীপে সংলগ্ন চরে নোনাজলে মাছ চাষ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। পানীয়জল সুন্দরবনের অধিবাসীদের সব থেকে বড় সমস্যা। কিন্তু লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে রূপান্তর সম্ভব। কাকদ্বীপে এরকম একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন পর্ষদ। সুন্দরবনে নলকূপ বসিয়ে সর্বত্র পানীয় জল সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, গোসাবার বিস্তৃত এলাকায় ১৫০০ ফুট ভূনিম্নেও জল পাওয়া যায়নি।

২৩৬টি পুরুষদের এবং ১১৯টি মহিলাদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়েছে।

সুন্দরবনের বড় আকর্ষণ ব্যাঘ্র প্রকল্প ও কুমীর প্রকল্প। পাথর প্রতিমা ব্লকে ভগবৎ পুরে কুমীর প্রকল্পটি প্রথম থেকেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে আসছে। শিকারীদের হামলায় সুন্দরবন থেকে অন্যতম সম্পদ কুমীর প্রায় নিঃশেষিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক ভাবে শুরু হওয়া এই প্রকল্প কল্যাণে কুমীরের বংশরক্ষা সম্ভব হয়েছে। বাঘের অবস্থাও হয়েছিল একই রকম। বর্তমানে সুন্দরবনের ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এসেছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায়। বাঘের জন্য মিষ্টি জলের ব্যবস্থা হয়েছে পুকুর কেটে। এসব পুকুরের ধারে আছে অবজারভেশন টাওয়ার। সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে ঃ কোর এরিয়া, বাফার জোন এবং প্রিমিটিভ এরিয়া। বাফার জোনে গাছকাটা, মধুসংগ্রহ, মাছ ধরা সব কাজই চলে। কোর এলাকায় কেবলমাত্র গবেষণা কাজ করা যায়। আর প্রিমিটিভ এলাকায় এ জাতীয় কাজকর্ম নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা করা যেতে পারে মাত্র। সুন্দরবনে যেমন সংখ্যায় বাড়ছে বাঘ, তেমন কুমীর।

গঙ্গে বন্দর

> "প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন সুন্দরবনের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রায়দীঘি গ্রামে পাথরের তৈরী সূর্যমূর্তি, বোড়ালগ্রামের ভূগর্ভ হইতে মৌর্য শুঙ্গ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাল, সেন আমলের অনেক পুরাকীর্তি, ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে হরিনারায়ণ পুরে আবিষ্কৃত মাতৃকামূর্তি ও সীলমোহর, দক্ষিণ-পূর্বদিকে বকুলতলা গ্রামে লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী, জয়নগর থানার কালীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি, রাক্ষসখালী দ্বীপে প্রাপ্ত জোম্মনপালের পট্টোলী, কালীঘাটে গুপ্তমুদ্রা আদি প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের সাক্ষ্য দিতেছে।"
>
> (বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়)।

চব্বিশ পরগণা এবং বাঙলাদেশের খুলনা ও বাখরগঞ্জ নিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্য সমাকীর্ণ সুন্দরবন একসময়ে ছিল জনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ অঞ্চল। ভূগর্ভ খননে বা পুকুর কাটার সময় ইটের স্তূপ, ভাঙা দুর্গ, মজে যাওয়া সুবিশাল পুষ্করিণী, তাম্রপট্টলিপি. প্রস্তর মূর্তি দেবদেবীর বিগ্রহ, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সুনিশ্চিত হয়েছেন। এই সভ্যতা হল মুসলমান পূর্ববর্তী যুগের। অর্থাৎ গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের। ইংরেজ আমলে জঙ্গল হাসিলের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে অতীত ঐশ্বর্যের এই সব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশেই সমৃদ্ধি ঘটেছিল সব থেকে বেশি। এই অঞ্চলেই অবস্থিত সাগরদ্বীপ, গঙ্গাসাগর সঙ্গম। রামায়ণ মহাভারতে এই সঙ্গমতীর্থের উল্লেখ আছে। এখানেই কপিলমুনির আশ্রম। পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে, এই তীর্থক্ষেত্রে ছিল চন্দ্রবংশীয় রাজা সুষেণের রাজ্যভুক্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় কালিদাস রঘুবংশম্ রচনা করেন। রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে এই অঞ্চলে পরাক্রমশালী ও নৌযুদ্ধে দক্ষ জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্ত যুগের অবসানের পর পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। নরপতি গোপালদেবের রাজ্য সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের কর্মীরা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পূর্ববঙ্গে শ্রীচন্দ্রদেবের যেসব তাম্রপট্টলিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় রাজ... বৃহৎবঙ্গে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করেন। জটার দেউলে প্রাপ্ত তাম্রপট্ট... থেকে জানা যায়, রাজা জয়চন্দ্র ৯৭৫ সালে এই মন্দির নির্মাণ করেন। সম্ভবত এই জয়চন্দ্র ছিলেন

চন্দ্রবংশীয় কোন নৃপতি। জটার দেউলের কাছে ২৬ নম্বর লাটে কঙ্কণদীঘিতে আবিষ্কৃত হয়েছে এক জনপদের ধ্বংসাবশেষ। জটার দেউলের ইটের সঙ্গে এই ধ্বংসাবশেষের ইটের রয়েছে সাদৃশ্য। পালরাজত্বের পর বিজয় সেন প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন তার পৌত্র লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের সময় সমগ্র খাড়িমণ্ডল ছিল তার রাজ্যভুক্ত। লক্ষ্মণসেনের দুটি তাম্রশাসন পাওয়া যায় সুন্দরবন ও গোবিন্দপুর গ্রামে (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, ডায়মন্ড হাবরার, কুলপী এবং ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চল ছিল খাড়িমণ্ডলের অন্তর্গত। সেন রাজত্বের পর মুসলমান আমলের সূচনা। কিন্তু মুসলমান নরপতিরা দীর্ঘদিন দক্ষিণ বাঙলায় অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। ঐ সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে সেন নরপতিরা নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ১৪৬৫ সাল নাগাদ সুলতান রুকনুদ্দীন বরাবকের সময় দক্ষিণবঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়। শুরু হয় পাঠান আমল। তারপর মোগল যুগ। মোগল রাজত্বের শেষ থেকে ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ পর্যন্ত দক্ষিণ বাঙলায় মগ ও ফিরিঙ্গী অত্যাচার বিভীষিকার সৃষ্টি করে। বিস্তৃত অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়। দীর্ঘকাল বসতিহীন হয়ে পড়ায় সুন্দরবনও আয়তনে বেড়ে যায়।

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে যেসব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সে বিষয়ে পরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত গবেষণার কাজ শুরু হয়নি। সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে এবং আদিগঙ্গার প্রবাহ তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। মথুরাপুর থানার ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণদীঘির পশ্চিম ও রায়দীঘি নদীর পশ্চিম-তীরে ভাটার সময় ইটের ভাঙা অংশ দেখা যায়। এই ইটের সঙ্গে মৌর্য যুগে নির্মিত ইটের সাদৃশ্য রয়েছে। নির্দশন সমৃদ্ধ অন্যান্য অঞ্চলগুলি হল মহিষমারী, গঙ্গারাইস মিল, ধবলাট, প্রসাদপুর, মন্দিরতলা, শিবপুর, হরিণবাড়ি, কচুবেড়িয়া, কীর্তনখালি, ধোড়ামারা, ঈশ্বরীপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, মুড়িগঙ্গা, সুমতিনগর, মনসাদ্বীপ, খানসাহেব আবাদ প্রভৃতি। পাওয়া গেছে পোড়ামাটির মূর্তি, ইটের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, কারুকাজ করা মৃৎপাত্র, বজরা, পাতকোয়া, শিলনোড়া জাতীয় নানাবিধ দ্রব্য। বেশির ভাগ পুরাকীর্তি নিদর্শনই পাল ও সেন রাজত্বের সমসাময়িক। এই অঞ্চলে ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তেমন সুবিস্তৃত ছিল না।

"মন্দিরতলার পশ্চিমাংশে হুগলী নদীর তীরে এক বিরাট আকারের ধ্বংসাবশেষ

বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানটির নদী ভাঙ্গনের ফলে ৫।৬ ফুট নীচে বিভিন্ন ধরণের পোড়া ইট, কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণখণ্ড, ক্ষুদ্রাকৃতি স্বর্ণ ইট, নানা ধরণের অলঙ্কার, পাথরের ও পিতলের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, শিলনোড়া, পাতকোয়া প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ ধ্বংসাবশেষের একটি বিরাট অংশ নদী ভাঙ্গনের ফলে নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঐ ধ্বংসাবশেষের উপর যে ভগ্ন অট্টালিকাটি রহিয়াছে ঐটি মন্দির, ইহা প্রাচীন ব্যক্তিদের অভিমত। ঐ মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ অতীতের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ঐ ধ্বংসস্তূপটি খনন করিলে অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" (গঙ্গাসাগর মহাতীর্থ-জগন্নাথ মাইতি। পৃঃ ৪৭-৪৮)।

সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চলের প্রাচীন অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান খাড়ি গ্রামে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করা না গেলেও, আশপাশের বহুস্থান থেকে পাওয়া গেছে নানাবিধ দ্রব্য। কয়েকটি স্থান হল রায়দীঘি, কঙ্কণদীঘি, ভরতগড়, বকুলতলা, নলগোড়া, গজমুড়ি, জটা, বাইশহাটা, রাক্ষসখালি, মণিরতট, মৈপীঠ, ছত্রভোগ, মাধবপুর, বাড়িভাঙা, জলঘাটা, দেলবাড়ি, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বোড়াল, শাসন, কাজিরডাঙা, কাশীপুর, সরিষাদহ, মালিপাড়া, আটঘরা, দক্ষিণ গোবিন্দপুর প্রভৃতি। পাকুড়তলা (কাকদ্বীপ), করঞ্জলি, কাঁটাবেনিয়া, ঘাটেশ্বরা, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা প্রভৃতি অঞ্চলেও উদ্ধার করা হয়েছে নানাবিধ প্রত্ন নিদর্শন। এইসব প্রত্ন নিদর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছিলেন ঃ

"...চন্দ্রকেতুগড়, গোপালপুর, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা ইত্যাদি স্থানের পুরাবস্তু সমূহ বিস্ময়করভাবে প্রমাণিত করে যে, আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও অনেক আগে চব্বিশ পরগণায় ছিল নানা সুরম্য নগরী ও নৌ-বন্দর যেখানে নিয়মিত আসত দেশ-বিদেশের বাণিজ্যতরণী। সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি-শোভিত এইসব জনপদের বিলাস-বাহুল্য ও মার্জিত সংস্কৃতি রূপকথার দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চব্বিশ পরগণায় আবিষ্কৃত শুঙ্গ-কুষাণকালের মৃন্ময় শিল্পে একদিকে যেমন দেখা যায় অতিমানবীয় গরিমামণ্ডিত রাজমূর্তি ও বর্মাবৃত হেলেনীয় অথবা রোমক সৈনিক, অপরদিকে তেমন রূপায়িত আছে অপ্সরাকল্প রূপসীদের অকুণ্ঠ পরিচয়-জ্ঞাপক ক্ষুদ্র ভাস্কর্য। কিন্তু এগুলি ত সব ঐতিহাসিক যুগের কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্তই আজ আমাদের বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে, কারণ তা আজ আমাদের কাছে অনেকাংশেই অজ্ঞাত। মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত

তাম্রলিপ্তের ধ্বংসাবশেষে ১৯৫৫ সালের এক খনন-কার্য্যে আবিষ্কৃত হ'য়েছে আনুমানিক প্রায় তিনহাজার বছর আগেকার মসৃণ পাথরের কুঠার এবং তাদের সঙ্গে একধরণের হাতে তৈরি ভঙ্গুর মৃৎপাত্রের অংশ।···এই সংস্কৃতি সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কারণ তার বিস্তৃতি দেখা যায় ডায়মণ্ড-হারবারের প্রায় ছয়মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে হরিনারায়ণপুরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। জোয়ারের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত নদীর ধার থেকে আবিষ্কৃত মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ এবং আরও প্রাচীনতর পুরাবস্তুর সঙ্গে এখানে পাওয়া গেছে একাধিক মসৃণ পাথরের কুঠার ও হাতুড়ি, যেগুলি নিঃসংশয়ে হরিনারায়ণপুরের বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক অথবা মৌর্য-পূর্ব স্তরের সাক্ষ্য বহন করে।···প্রাচীন রোমক কবি ভ্যালেরিয়াস ফ্লাকাস্ তাঁর রচিত "আর্গোনটিকা" কাব্যে "গঙ্গারিডির" সৈনিকদের শৌর্য্য বর্ণনা করেছেন। "গঙ্গারিডি' অথবা বাঙলার এই যোদ্ধারা নাকি পৌরাণিক বীর জ্যাসনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণসাগরের তীরে সমাবেশ করেছিল।···দুহাজার বছর আগে ভার্জিল রচিত জর্জিকস্"-এ বর্ণিত হয়েছে আবার সেই "গঙ্গারিডি"র বীরত্বের কথা। চব্বিশ পরগণার সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাবস্তুগুলি যেন প্রায়শঃই স্মরণ করিয়ে দেয় এই গৌরবময় যুগের কথা। যদিও এখানকার প্রাচীনতর পুরাকীর্ত্তি ও নিদর্শনগুলি হয়ত এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকের খনিত্রের জন্য অপেক্ষমাণ আছে। চন্দ্রকেতুগড়, গোপালপুর, হরিহরপুর, আটঘরা ও হরিনারায়ণপুরের শুঙ্গ-কুষাণ সভ্যতার পশ্চাতে যে আছে এক প্রাচীনতর সংস্কৃতির পটভূমিকা সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই।···কে জানে, এখানে হয়ত বা প্রতিফলিত হ'য়েছে কোন এক প্রাক্-বৈদিক উপনিবেশিকতার কাহিনী যার ইতিহাস আজ নীরব হ'য়ে আছে ২৪ পরগণার ভূগর্ভে এবং লবণাক্ত বারিধৌত বাঙালার সমুদ্রতটে ও তার প্রান্ত রেখার গহন অরণ্যে।

"চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ে···বিভিন্ন খনন কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত হ'য়েছে প্রাক্-মৌর্য্যকালের মৃৎপাত্র এবং পোড়ামাটির নাগ অথবা নাগিনীমূর্তি। এই মূর্তি একদিকে যেমন বিহারের অন্তর্গত শোনপুরের সমশ্রেণীর মৃন্ময় মূর্তির সঙ্গে তুলনীয় অপরদিকে তেমন এখানে আবিষ্কৃত একধরণের ক্ষুদ্র কীর্তিত নলবিশিষ্ট পেয়ালা অথবা পানপাত্র প্রাগৈতিহাসিক অজয়-উপত্যকা ও আনাতোলিয়ার বিভিন্ন ভাণ্ড ও ভৃঙ্গারের কর্তিত জল নালীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় চন্দ্রকেতুগড়ের কোন ইতিহাস-পূর্ব স্তর ও নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হতে পারে কোন বিশেষ ঢিবির গোড়ালীতে পরিচালিত সুগভীর খনন-কার্য্যের দ্বারা। নিম্নবঙ্গের সুপ্রাচীন স্থানগুলি আজ প্রায়শই বিপুল পলিমাটির স্তরে অবলুপ্ত। এছাড়া, লবণাক্ত জলে

সহজেই বিনষ্ট হয় মৃন্ময় বাসন, মূর্তি ও ধাতুনির্মিত (বিশেষভাবে লোহা এবং তামা) বস্তু।

"বাঙলার বিভিন্ন ব্রত ও আলপনায় যে সব ক্রিয়া আচার অথবা চিত্রণ দেখা যায়, সেখানেও প্রতিফলিত হয় সমুদ্রযাত্রার আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা। দূর-সমুদ্রে এই বিচরণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে তার ছাপ রেখে গেছে ২৪ পরগণা নিম্নবঙ্গের অন্যান্য স্থানে। ঐতিহাসিক যুগে "গ্রেকো-রোমান্" জগতের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্য সম্পর্কেরও অনেক আগে যে চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে দূর সমুদ্রপারের সংস্কৃতি ও পণ্য আহরিত হ'ত তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর "গ্রেকো-রোমান্" বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখন নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকায় "গাঙ্গে" নামে এক বিরাট বন্দর ছিল এবং এই অঞ্চলের বিপুল সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য ছিল বৈদেশিক নাবিকদের নিকট পরম আকর্ষণীয়। স্বভাবতঃই মনে করা যায়, এই সমৃদ্ধির পশ্চাতে ছিল এক প্রাচীনতর সংস্কৃতির অর্থনৈতিক প্রেরণা। এখানে একদিকে যেমন দেখা যায় চব্বিশপরগণা ও বাঙলার অপরাপর অঞ্চলের প্রাক্ মৌর্য্য মূর্তি তেমনি মনে পড়ে নির্বাসিত রাজপুত্র বিজয়সিংহের নৌবহরের কথা যা ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় হয়ত ভাগীরথীর মোহনা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিয়েছিল লঙ্কাজয়ের সম্ভাবনাকে সূচিত করে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, চব্বিশপরগণা একদা ছিল বাঙলার হারানো সভ্যতার বৈদেশিক বাণিজ্যের তোরণ-পথের উদ্যান।..." (প্রাগৈতিহাসিক চব্বিশ পরগণা-সংস্কৃতি। প্রথমবর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা)।

সতীশচন্দ্র মিত্র বিস্তৃতভাবে গঙ্গারিডি রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ...মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস তাঁহার রাজসভায় ছিলেন। তিনি স্বকীয় বিবরণীতে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই গঙ্গারিডি গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাঢ়ী শব্দের বিকৃতি মাত্র। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন, 'গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি সৈন্যের ভয়ে অন্য রাজগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না।' তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে," 'স্বয়ং সর্বজয়ী আলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারোঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া সেইখান হইতে প্রস্থান করেন।' সত্য মিথ্যা জানি না, তবে গঙ্গারিডি যে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; বঙ্গদেশ ইহার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং উপবঙ্গ বা যশোহর-খুলনা এই গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারিডি দেশেরই অংশ মাত্র। প্লিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, গঙ্গাসঙ্গমের পার্শ্বে একটি দ্বীপে মোদ্যগলিঙ্গী জাতি বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে

বড়ন, বাক্‌লা, সন্দ্বীপ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত এবং মোদ্যগলিঙ্গী শব্দ মোলঙ্গী শব্দের নামান্তর। এই লবণাক্ত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ হইতে পূর্বকালে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। ঐ লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য যে এক প্রকার ভাঁড় ব্যবহৃত হইত, তাহাকে মোলঙ্গা এবং যাঁহারা লবণ প্রস্তুত করিতেন তাঁহাদিগকে মালঙ্গী বলিত। এখন চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে বহু সংখ্যক মোলঙ্গীর বাস আছে, কিন্তু তাহারা এক্ষণে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকারে বঞ্চিত।

"পূর্বোক্ত গঙ্গারিডি রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল—গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া। ইহা সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় লিখিত পেরিপ্লাসেও গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশে যাইত বলিয়া উল্লিখিত আছে।···কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ প্রবাল দ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া এই প্রবাল দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গঙ্গারেজিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত নহে, প্রাচীন যশোহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্তী বারাসত হইতে হাসনাবাদ যাইবার রেলপথের পার্শ্বে দ্বিগঙ্গা নামক একটি স্থান আছে। ইহাকে কেহ দেগঙ্গা, কেহ দ্বিগঙ্গা বলে।···সম্ভবত উহা দেবগঙ্গা, দ্বীপগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা এইরূপ কোন শব্দের অপভ্রংশ। প্রকাণ্ড দীঘি এবং বহুদূর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপমালা এখনও এস্থানের প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে। ইহারই নিকটে দেউলিয়ায় চন্দ্রকেতু প্রভৃতি প্রাচীন রাজার কীর্তিস্থান। ইহারই দক্ষিণে প্রাচীন বালবল্লভী রাজ্যের রাজধানী বালাণ্ডা অবস্থিত। মুসলমান ধর্ম-প্রচারকগণ এই বিখ্যাত প্রাচীন স্থানে আসিয়া হিন্দুর উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। নিকটবর্তী হাড়োয়াতে সেই অত্যাচারী প্রচারকগণের অন্যতম গোরাই গাজীর সমাধি আছে। দ্বিগঙ্গা বীরধর্মী সেনবংশীয় কায়স্থগণের প্রথম নিবাস ছিল। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ; দ্বিগঙ্গা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। এই দীর্ঘগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গা ভাগীরথী তীরে ছিল বলিয়া 'বাসুকী কুলগাথায়' উল্লিখিত আছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর কূলবর্তী নহে বটে, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া যমুনার পদ্মা নাম্নী এক শাখা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীনকালে পদ্মা বা গঙ্গার নামের প্রভেদ লক্ষিত হইত না। মধুমতী নদীরও অপর নাম বড় গঙ্গা। উক্ত সেনবংশীয়গণ এক সময়ে প্রবল শক্তিশালী ছিলেন। সুন্দরবনের উত্থান পতনে দ্বিগঙ্গা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে, তাঁহারা

পূর্ববঙ্গে গিয়া বরিশাল ও খুলনা জেলায় রায়েরকাটি, বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে রাজ্য করেন। এখনও তাঁহারা 'দ্বিগঙ্গার সেন' বলিয়া বিশেষ সম্মানিত। এই দ্বিগঙ্গাই ছিল, 'গঙ্গারেজিয়া' বা গঙ্গাবন্দর—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।…

"বুদ্ধদেবের সমসময়ে গাঙ্গরাঢ় হইতে বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া সিংহলে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন…। সিংহল পুরুষানুক্রমে এই সিংহদিগের অধিকৃত ছিল। 'মহাবংশ' নামক সিংহল দেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই উপনিবেশ স্থাপনের বর্ণনা আছে। বাস্তবিকই ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি বাঙ্গালীর মত ঔপনিবেশিকতা দেখাইতে পারেন নাই।' উত্তরকালে সিংহলে যে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল, বাঙ্গালী বীর তাহার পথ দেখাইয়াছিলেন। ভগীরথের শঙ্খধ্বনিনাদের অনুবর্তী হইয়া যেমন গঙ্গাস্রোত বহিয়াছিল, বঙ্গবীরের বিজয় শঙ্খধ্বনিনাদে তেমনি বৌদ্ধধর্ম প্রবাহের পথ নির্দেশ করিয়াছিল। এইরূপে যাহারা ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং মধ্যে দ্বিগঙ্গা প্রভৃতি নগরী তাহাদের প্রধান বন্দর এবং সদর স্থান ছিল।… (যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃঃ ১৮২-৮৩)।

আলেকজান্ডার ভারত অভিযানে এসেছিলেন ৩২৭ খৃঃ পূঃ। ৩২৫ খৃঃ পূঃ পেঁছান বিপাশা নদী পর্যন্ত। সেখানেই তিনি প্রাসিয়ই ও গঙ্গারিডিয়া রাজ্যের সমাচার পেয়ে আর অগ্রসর হননি। ৩২২ খৃঃ পূঃ ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মারা যান ২৯০ খৃঃ পূঃ। তাঁর দরবারে এসেছিলেন গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে (২৯০-২৭৩ খৃঃ পূঃ) এসেছিলেন গ্রীকরাজা টলেমির দূত। ২৭৩ খৃঃ পূঃ সম্রাট অশোক বিন্দুসারের মৃত্যুর পর রাজা হন (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ)। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয় ১৭০ খৃঃ পূঃ।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গারিডি জাতির শৌর্যের বিবরণ আছে। তাদের রাজা ছিলেন জান্ড্রামিস। খৃষ্টিয় প্রথম শতকে প্লুটার্ক লেখেন, আলেকজান্ডারকে প্রতিরোধের জন্য প্রাসিয়ই ও গঙ্গারিডই-এর রাজারা ৮০ হাজার অশ্বারোহী, দুলক্ষ পদাতিক, ৮ হাজার রথ, ও ৬ হাজার হাতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কার্টিয়াস রুফাসও এই দুই রাজ্য বা জাতির উল্লেখ করেছেন। স্ট্রাবো (খৃঃ পূঃ ৫৪), আরিয়ান (১০০-১৩৮ খৃঃ) এবং প্লিনি (২৩ খৃঃ জন্ম) প্রাসিয়ই-এর রাজধানী পালিবোথরা অর্থাৎ পাটলিপুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এটি ছিল মগধ রাজ্য। কার্টিয়াস রুফাস এই রাজ্যের রাজার নাম বলেছেন আগারামিস। আগারামিস অর্থাৎ উগ্র সেন। নন্দবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা উগ্র সেন (মহাপদ্ম)। প্রাসিয়াই ও গঙ্গারিডি ছিল তার

রাজ্যভুক্ত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২২ খৃঃ পূঃ) নন্দবংশ ধ্বংস করেন। বাঙলার সমকালীন ইতিহাস এমন অ-তথ্য নির্ভর যে, যুক্তি-অগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। খৃষ্ট জন্মের তিন'শ বছর আগে থেকে পরের তিনশ বছর মোট ছয়শত বছরের অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ৪০০ বছর পরে লেখা পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে গঙ্গারিডি রাজ্য ও গঙ্গে বন্দরের বিবরণ পাওয়া যায়। গঙ্গারিডি রাজ্যটি এই সময়ে স্বাধীনভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। রাজধানী ছিল গঙ্গা বা গঙ্গে। প্রবাল, মসলিন, মিহি কাপড় রপ্তানি হত।

পেরিপ্লাসে আছে ঃ "···সমুদ্রকে ডানদিকে এবং উপকূলকে বামদিকে রেখে এগোলে সামনে পড়বে গঙ্গা। এবং তার বেশ পরে মহাদেশের শেষ জনপদ ক্রাইসি (মালয় উপদ্বীপ)। এ অঞ্চলেই ভারতের বৃহত্তম নদী গঙ্গা সমুদ্রে পড়েছে। নীল নদের মতো এর জলও বাড়ে কমে। নদীর ধারে ব্যবসা কেন্দ্রটির নাম গংগে। এখানে ব্যাপকভাবে কেনাকাটা চলে। পান, গাঙ্গেয় জটামাংসী, মুক্তো এবং সব থেকে উৎকৃষ্ট জাতের মসলিন—যার নাম গাঙ্গেয়। শোনা যায়, এখানে একটি সোনার খনি আছে। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম কালটিস। নদীটির সামনাসামনি সমুদ্রের মধ্যে আছে ক্রাইসি দ্বীপ (সুবর্ণ)। উদীয়মান সূর্যের সরাসরি নিচেই এর অবস্থান এবং পূর্ব দিকে পৃথিবীর শেষ জনপদ। এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট কচ্ছপ খোল ইরিত্রিয়ান সাগরের তীরবর্তী বাজার সমূহের সর্বত্র দেখা যায়।"

অজানা নাবিকের এই বিবরণ খৃষ্টজন্মের ৫০।৬০ বছরের মধ্যে লেখা। প্লিনি গঙ্গারিডি জাতির কথা বলেছেন। গ্রীক জ্যোতির্বিদ ও ভৌগোলিক টলেমির মানচিত্রে আদিগঙ্গা ও বিদ্যাধরীর মধ্যবর্তী এলাকাকে বলা হয়েছে গঙ্গারিডি রাজ্য। অর্থাৎ গঙ্গার মোহনায় ছিল রাজ্যটি। বর্তমানে সেটি হল গঙ্গার মোহনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। সে-সময়ে কলিঙ্গে ছিল বিখ্যাত গঙ্গে রাজবংশ। বাঙলার গঙ্গারিডিদের সঙ্গে ছিল তাদের সম্বন্ধ। বসিরহাটের বেড়াচাঁপাকে অনেকে বলেন গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী। আর গঙ্গে বন্দর হল বর্তমান দেগঙ্গা।

অপর মতে, গঙ্গে বন্দর হল বর্তমান সাগরদ্বীপ। পূর্বভারতের এই শ্রেষ্ঠ বন্দর নগরীর অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন ঃ "The location of the city of Ganga capital of the Gangians or Vanges, in the vicinity of the confluence of the Ganga and the Sagore suggests that it was no other the celebrated holy city of Gangasagore or

Gangasagore Sangama mentioned in the Indian Literature." (Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India).

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ "প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতে সুন্দরবনের আর এক নাম ছিল গঙ্গা রাষ্ট্র বা গঙ্গারিডি। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা প্রথম গঙ্গারিডি রাজ্যের নাম জানিতে পারি। গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী গঙ্গে বা গঙ্গেরেজিয়া। এই নগরী তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। টলেমি বলিয়াছেন, গঙ্গারিডি রাজ্য ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল।" (বাঙালীর ইতিহাস)।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় ভারতে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫ সাল)। তিনিও গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ করেছেন। এসময়ে বাঙলার রাজনৈতিক মানচিত্রে গঙ্গারিডি নামক স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, কজঙ্গল, ও সমতট এই কয়টি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা জানা যায়। কিন্তু গাঙ্গেয় দ্বীপ কোন্ রাজ্যভুক্ত ছিল তা নিয়েও আছে বিতর্ক। কারো মতে বঙ্গ ও সমতট ছিল দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য। রাজ্য দুটি ছিল পাশাপাশি অবস্থিত। বঙ্গ রাজ্যভুক্ত ছিল গাঙ্গেয় দ্বীপ। আবার কারো মতে, গাঙ্গেয় দ্বীপ ছিল সমতটভুক্ত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ "...মহাভারত রচনার যুগে—এমন কি তাহার পূর্ব হইতেই—বাংলা দেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনও কখনও কোন পরাক্রান্ত রাজা ইহার দুই তিনটি একত্র করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিতও বাংলার রাজগণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহাদের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি বাঙলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল।

"অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মিলিয়া একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—মহাভারতের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলা দেশে এইরূপ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায় ; গ্রীকগণ গঙ্গারিডাই অথবা গঙ্গারিডই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যে বঙ্গদেশের অধিবাসী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক গঙ্গানদীকে এই দেশের পূর্ব সীমা, এবং কেহ কেহ ইহাকে পশ্চিম সীমারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্লিনি বলেন, গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমুদয় উক্তি হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গঙ্গানদীর যে দুইটি স্রোত এখন

ভাগীরথী ও পদ্মা বলিয়া পরিচিত, এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে গঙ্গারিডই জাতির বাসস্থল ছিল।…অধিকাংশ প্রাচীন লেখকই বলিয়াছেন যে, এই দুইটি জাতি গঙ্গারিডই এর রাজার অধীনে ছিল, এবং তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীর হইতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্লুতর্ক একস্থলে এই দুই জাতিকে গঙ্গারিডই রাজার অধীন এবং আর একস্থলে দুই জাতির পৃথক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।

"অধিকাংশ গ্রীক লেখকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, ইনি পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে গিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্তিকালে বাঙালী পালরাজগণও তাহাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দ রাজবংশ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে। কারণ বাংলা দেশ বহুকাল পর্যন্ত আর্যসভ্যতার বহির্ভূত ছিল, এবং ইহার অধিবাসী আর্য ধর্মশাস্ত্র অনুসারে শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন, ইহাই খুব স্বাভাবিক। অবশ্য নন্দরাজা বাঙালী ছিলেন, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এই সময়ে যে বাংলার রাজাই সর্বাধিক শক্তিশালী ছিলেন, প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরেই শূদ্র নন্দরাজকে আর্যাবর্তের সার্বভৌম রাজারূপে দেখিতে পাই তখন তিনিই যে এই বাঙালী রাজা, এরূপ মত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।…" (বাংলা দেশের ইতিহাস ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃঃ ১৮-২০)।

গঙ্গারিডি রাজ্য ও গঙ্গে বন্দরের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেন নি, বা যুক্তিগ্রাহ্য কোন সিদ্ধান্তেই পেঁছাতে পারেন নি। এর অন্যতম কারণ, তথ্যের অভাব। পেরিপ্লাসে বর্ণিত বিবরণে গঙ্গে বন্দরের অবস্থান সম্পর্কে যে ক্ষীণ সূত্র পাওয়া যায়, তা থেকে বন্দরটি সমুদ্র তীরবর্তী ছিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। গঙ্গে বন্দর সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায় সেন আমলের আগেই। মৌর্য যুগ পর্যন্ত বন্দরটি যথাস্থানেই ছিল। তারপর বন্দর সরিয়ে নেওয়া হয় দেগঙ্গার স্থানে। ঐ স্থানে ব্যবসায়িক কাজকর্ম চলত আগে থেকেই। তাছাড়া নদী ছিল সুবিস্তৃত। জাহাজ চলাচলের উপযোগী। গঙ্গা নদী প্রবাহিত হত কি, হত না, তা নিয়ে বিতর্ক

সৃষ্টি করার কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না। তাম্রলিপ্তও সে সময়ে বৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দর।

এবিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়েছেন সাগর দ্বীপের নরোত্তম হালদার। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য পূর্ণ সচিত্র এই বইখানি প্রাচীন বঙ্গ সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করবে। শ্রীহালদার পুরাণ কাহিনী থেকে শুরু করে আধুনিক ইতিহাসকারদের তথ্য ও প্রত্ন নিদর্শনের সাহায্যে পশ্চিম সুন্দরবনাঞ্চলের জনবসতির উৎস সন্ধান করেছেন।

তাঁর বিবরণে আছে, কালীঘাটের দক্ষিণ থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত আদিগঙ্গার পশ্চিমের ভূভাগ ছিল একই ভূখণ্ডে। একটি প্রশস্ত পথ ছিল সাগরদ্বীপের তীর্থস্থানে পোঁছাবার। পরে নদীরেখা প্রশস্ত হয় এবং বহু নতুন নদীপথের সৃষ্টি হওয়ায় বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির উৎপত্তি ঘটে। সুসভ্য নগরজীবন ছিল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। তার প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি। হাতি ও বুনো হরিণের ফসিল পাওয়া গেছে দেউলপোতায় (ডায়মন্ড হারবার)। এখানে একটি বানর জাতীয় প্রাণীর প্রস্তরীভূত করোটীও পাওয়া গেছে। অঞ্চলটিতে প্রাগৈতিহাসিক মানব অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রীহালদার সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রথম দিকে স্থায়ী বসতি না হলেও হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা প্রভৃতি অঞ্চলে সাময়িক বসতি গড়ে উঠেছিল। "...প্রাকবৈদিক যুগে পুণ্ড্রনগরে বা পুণ্ড্রবর্ধনে পৌণ্ড্রগণের আগমনের পর থেকে এ অঞ্চলে স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠতে শুরু করে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত পুণ্ড্র জনগোষ্ঠীর একটি উপনিবেশ বঙ্গ ও মগধের সন্নিহিত অঞ্চলে ছিল বলে আমরা জানতে পারি বাল্মীকি রামায়ণে। পুণ্ড্র জনপদের দক্ষিণে রসাতল প্রদেশে অর্থাৎ এই নিম্নভূমি অঞ্চলে যখন কোন জনপদ গঠিত হয়নি, তখন সাগরদ্বীপের জনহীন অরণ্যে সাংখ্যদর্শন প্রবক্তা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ঋষি কপিলের সাধনাস্থল ছিল বলে উক্ত রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। তারপর সূর্যবংশীয় ভগীরথের আমলে মহাতীর্থ হিসাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুণ্যার্থী আগমন ও মনুষ্যবসতি শুরু হয়েছিল বোঝা যায়।" এই বসতি বিস্তৃত ছিল হাতিয়াগড় পরগণা বা বর্তমান কুলপী পর্যন্ত। বিস্তৃত বসতি এলাকা ধ্বংসের পর পরবর্তী সময়ে জঙ্গলাকীর্ণ হলেও সাগরদ্বীপ অঞ্চল তীর্থনগরীর কারণে অরণ্যাবৃত হতে পারে নি। ডায়মন্ড হারবার—কাকদ্বীপ রোডের পাশেই নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ দিয়ে গেছে সুন্দরবন সীমাবাঁধ (Sundarban Embankment)। সীমাবাঁধের দক্ষিণে সাগরদ্বীপ ও উত্তরে কুলপী থানা এলাকা ইংরেজ আমলে জঙ্গল হাসিলভুক্ত এলাকা ছিল না। "বিস্তীর্ণ সুন্দরবনের নিম্নভূমি এলাকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ

বাসোপযোগী, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান হিসাবে এই প্রাচীনতম সাগরদ্বীপ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলই যে গঙ্গারিডির মূল ভূখণ্ড ছিল এবং এখানকার তীর্থনগরই যে একদা 'গঙ্গে' বন্দর নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল, সংগৃহীত মৌর্য ও প্রাক্ মৌর্য যুগের প্রত্নসম্পদ ও ধ্বংসাবশেষগুলির প্রাচীনত্ব থেকে তার পরিচয় মেলে।"

সাগরদ্বীপ থেকে বেড়াচাঁপা এবং উত্তরে কুলপী থানা এই বিস্তৃত অঞ্চলে যে মৌর্য বা মৌর্য পূর্ববর্তী কালে একই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, সংগৃহীত প্রত্ন নিদর্শন তারই প্রমাণ। একই ধরনের তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে যার সঙ্গে পাটনা বা রাজগীর এলাকায় প্রাপ্ত তাম্রমুদ্রার সাদৃশ্য রয়েছে। আরও বিস্ময়কর ঘটনা, এই ধরনের মুদ্রার ছাঁচ পাওয়া গেছে পাকুড়তলায়। মুদ্রায় আছে হাতি, ক্রশ, নৌযান, চৈত্য ও বৃক্ষের চিহ্ন। অর্থাৎ গঙ্গারিডি আমলে পূর্বভারতের বণিকরা এই অঞ্চলে মুদ্রা প্রস্তুত করতেন, যা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত হয়। হাতি ছিল জাতীয় প্রতীক আর বিশ্বমৈত্রীর চিহ্ন ক্রশ। সীলমোহরেও আছে নৌযানের চিহ্ন।

ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার অন্যদের তুলনায়, যুক্তিসহ এই প্রাচীন জনপদটি সম্পর্কে বক্তব্য স্থাপন করেছেন। তার মতে, গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থে উল্লিখিত 'গঙ্গারিদ' জাতির বাস ছিল পূর্বভারতে গঙ্গা নদীর ধারে। গঙ্গা নদী থেকে উদ্ভূত এই শব্দটি; যার অর্থ গঙ্গাতীরবাসী অর্থাৎ গাঙ্গেয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি উল্লেখ করেন, গঙ্গানদী ছিল গঙ্গারিদদের দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। আনুমানিক ৮২ সালে পেরিপ্লাসের গ্রন্থকারও গঙ্গা নদী ও গঙ্গে বাণিজ্য স্থানের উল্লেখ করেছিলেন। ১৪৫ সালে টলেমিও গঙ্গার পঞ্চ মোহনায় গঙ্গারিদ জাতির বসবাসের কথা এবং তাদের রাজধানী গঙ্গারও উল্লেখ করেন। এই অঞ্চলটি ছিল গঙ্গার অসংখ্য শাখা প্রবাহিত বদ্বীপ এলাকা। গ্রীকদের এইসব তথ্যের স্বীকৃতি মেলে না কোন ভারতীয় সাহিত্যে। তবে গঙ্গারিদে জাতি যে অঞ্চলে বসবাস করত সেখানে বঙ্গ জাতির বসবাসের উল্লেখ করেছেন কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে। কালিদাসের আবির্ভাব চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজত্বে। দীনেশচন্দ্র ভারতীয়দের বঙ্গজাতি ও য়ুরোপীয়দের 'গঙ্গারিদ' জাতিকে একই রূপে মেনে নিয়েছেন। বঙ্গ বা বঙ্গকে গ্রীকরা ভুল করে গঙ্গা বলেছেন। এরকম উচ্চারণ ত্রুটি তাদের বিভিন্ন ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে ঘটেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে আলেকজাণ্ডার পূর্বদেশীয় শক্তিশালী রাজার ভয়ে বিপাশা নদী না পেরিয়ে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেন। এই রাজা ছিলেন নন্দবংশীয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের পর মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত তাকে উৎখাত

করেন। এই প্রাচ্যদেশীয় রাজা 'প্রাসিওই' বা 'গঙ্গারিদ' জাতির রাজা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। গঙ্গাতীরবর্তী প্রাসিওই জাতির রাজধানী ছিল পালিবোথরা বা পাটলিপুত্র আর গঙ্গারিদদের রাজধানী ছিল গঙ্গে উল্লেখ করেছেন টলেমি। দ্বিতীয় শতকে দুটি একই জনপদ নয়। চন্দ্রগুপ্ত পালিবোথরা দখল করেন নন্দরাজকে হত্যা করে। কিন্তু গঙ্গারিদৈ বা গঙ্গজাতি মৌর্যদের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। পরে এদের স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৃতীয় শতকে গেইয়াস জুলিয়াস সোলিনাস গঙ্গারিদ জাতির সেনাদলে এক হাজার অশ্ব, সাত শত হাতি ও ষাট হাজার পদাতিক সৈন্যের এবং পালিবোথরা রাজার ত্রিশহাজার অশ্বারোহী, আট হাজার হাতি ও ষাট হাজার পদাতিকের উল্লেখ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে পূর্ব ভারতে কুষাণ অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি অধ্যায়ের ওপর দীর্ঘকাল কোন আলোকপাত ঘটেনি। এতদিনে পাওয়া গেছে ক্ষীণ আলোকরেখা। এই রেখাকে প্রজ্বলিত করবেন ঐতিহাসিকরা। তারা তৎপর হলে সুপ্রাচীন বাঙালী সংস্কৃতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব হবে। বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় খনন কার্য সম্পূর্ণ হলে, সমগ্র দক্ষিণ বাঙলার ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজন হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনপদ

শহর ও গ্রাম ॥ পৌর ও অ-পৌর এলাকা

আলিপুর মহকুমা

গার্ডেনরীচ থানা

গার্ডেনরীচ পৌর সভা ওয়ার্ড-২৫। ব্লক-২২৩। আয়তন—১৩·০ বর্গ কি. মি.।

মেটিয়াবুরুজ থানা

পাঁচুড় অ-পৌর এলাকা-ব্লক ৫৯। আয়তন—৭·৯ বর্গ কি. মি.।

মহেশতলা থানা

১ কৃষ্ণগড় ২ তেঁতুল খুলি ৩ চন্দননগর ৪ জালকুরা ৫ মহেশতলা ৬ নোয়াপাড়া ৭ জগন্নাথনগর ৮ চকমীরা ৯ গোবিন্দপুর ১০ রামপুর ১১ শম্পামীর্জানগর, ১২ শম্পা রায়পুর ১৩ জ্ঞানীপুর ১৪ মহাদেবপুর ১৫ রায়পুর ১৬ মেমানপুর ১৭ জগতলা ১৮ চক কৃষ্ণনগর ১৯ দৌলতপুর ২০ রামেশ্বরপুর ২১ শিবহুগলি ২২ ছোটকালিকাপুর ২৩ চক ছাটা ২৪ চক কেঁড়ুয়া ২৫ চক জট শিবরামপুর ২৬ রামনগর ২৭ জগন্নাথপুর ২৮ জ্ঞানী গঙ্গাধরপুর, ২৯ আসুতি ৩০ শোনপুকুরিয়া ৩১ চণ্ডীগড় ৩২ খানবেড়িয়া ৩৩ কৃষ্ণরামপুর ৩৪ সোনামুখী ৩৫ নোয়াবাদ ৩৬ শাঁখারীপোতা ৩৭ দারি বাগপোতা ৩৮ সোনামুখী কৃষ্ণনগর ৩৯ বাগপোতা ৪০ কলাগাছিয়া ৪১ বঙ্গলা ৪২ মীরপুর, ৪৩ নঙ্গী ৪৪ চক চাঁড়ুল, ৪৫ হেতালখালি ৪৬ শ্যামপুর, ৪৭ সরঙ্গবাদ ৪৮ কিসমত নঙ্গী ৪৯ পাড়বাঙ্গলা ৫০ পুটখালি।

মোট=৫০। আয়তন—৫৩·১ বর্গ কি. মি.। শহরাঞ্চল—১২·৪ বর্গ কি. মি.। গ্রামাঞ্চল—৪০·৭ বর্গ কি. মি.।

কৃষ্ণগড় অ-পৌর এলাকা। ব্লক ৮ ॥ আয়তন—১·৩৫ বর্গ কি. মি.।

জগন্নাথগড় অ-পৌর এলাকা। ব্লক ১২ ॥ আয়তন—২·৯১ বর্গ কি. মি.।

বাটানগর অ-পৌর এলাকা। ব্লক ১২ ॥ আয়তন—১·২২ বর্গ কি. মি.।

নঙ্গী অ-পৌর এলাকা। ব্লক ৬৬ ॥ আয়তন—৬·৯১ বর্গ কি. মি.।

শ্যামপুর, সারঙ্গাবাদ, কিসমত নঙ্গী, পাড় বাঙ্গলা, পুটখালি, নঙ্গী চক চাঁড়ুল, হেতালখালি—নঙ্গী অ-পৌর এলাকা অন্তর্গত।

বাঙ্গলা—অংশত নঙ্গী ও অংশত বাটানগর অ-পৌর এলাকা অন্তর্গত। মীরপুর বাটানগর অ-পৌর এলাকা অন্তর্গত।

---

*১৯৭১ সালে প্রকাশিত আদমশুমারি ভিত্তিতে সংগৃহীত।

বেহালা থানা

১ গোপালপুর ২ বেহালা ৩ পারুই ৪ রামনারায়ণ তালুক ৫ গঙ্গারামপুর ৬ মণ্ডলপাড়া ৭ মামুদপুর ৮ সাহাপুর ৯ পূজা সাহাপুর ১০ ইটলঘাটা ১১ স্মৃতি ১২ সৈয়দপুর ১৩ মুরাদপুর ১৪ সরকেলাত ১৫ বাসুদেবপুর ১৬ দক্ষিণ বেহালা ১৭ সরসুনা ১৮ শিবরামপুর ১৯ পশ্চিমবড়িষা ২০ হাঁস পুকুরিয়া ২১ জোকা ২২ কালুয়া ২৩ পূর্ব বড়িষা ২৪ চক ঠাকুরানী ২৫ হরিদেবপুর ২৬ পশ্চিম পুঁটিয়ারি ২৭ রামকান্তপুর ২৮ কৃষ্ণনগর ২৯ জিয়াদারগট ৩০ চক রামনগর ৩১ রামচন্দ্রপুর, ৩২ গোপালনগর, ৩৩ সজনাবেড়িয়া ৩৪ রামজীবনপুর ৩৫ মাগুরখালি। মোট=৩৫। আয়তন ৫২.১ বর্গ কি. মি। শহরাঞ্চল—২১.৭ বর্গ কি. মি.। গ্রামাঞ্চল ৩০.৪ বর্গ কি. মি।

পারুই, রামনারায়ণ তালুক, গঙ্গারামপুর, মণ্ডলপাড়া, বেহালা, মামুদপুর, সাহাপুর, পূজা সাহাপুর, ইটলঘাটা, স্মৃতি, সৈয়দপুর, মুরাদপুর, সারকেলাত, বাসুদেবপুর, দক্ষিণ বেহালা, সরসুনা, শিবরামপুর, পশ্চিমবড়িষা, পশ্চিম পুঁটিয়ারি—সাউথ সাবারবান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। সাউথ সাবারবান মিউনিসিপ্যালিটি-ওয়ার্ড-২৫-ব্লক-২৫৮।

যাদবপুর থানা

১ নিমকপোকতান ২ ধাপা ৩ চৌবাগা ৪ বনচাতলা ৫ ট্যাংরা ৬ তপসিয়া ৭ পূর্ব তপসিয়া ৮ ধলেন্দা ৯ পশ্চিম চৌবাগা ১০ নোনাডাঙা ১১ লস্কর আট ১২ মাদুরদহ ১৩ কসবা ১৪ কুষ্ঠিয়া ১৫ তিলজলা ১৬ বণ্ডেল ১৭ গড়সা ১৮ ঢাকুরিয়া ১৯ গরফা ২০ কালিকাপুর ২১ বড়খোলা ২২ সন্তোষপুর ২৩ রাজাপুর ২৪ চক গনিয়াগাছি ২৫ নয়াবাদ ২৬ চক গড়িয়া ২৭ ব্রিজি ২৮ বৈষ্ণবঘাটা ২৯ পাটুলি ৩০ চক মাশর ৩১ বড়ে মাশর ৩২ নাকতলা ৩৩ রায়পুর ৩৪ বড়ে রায়পুর ৩৫ যাদবপুর ৩৬ ইব্রাহিমপুর ৩৭ সেলিমপুর ৩৮ গোবিন্দপুর ৩৯ আরকপুর ৪০ কাকলিয়া ৪১ চাঁদপুর ৪২ শিবপুর ৪৩ পূর্ব পুঁটিয়ারি ৪৪ চাকদহ ৪৫ বাঁশদ্রোণী ৪৬ খানপুর ৪৭ রায়নগর ৪৮ ব্রহ্মপুর ৪৯ কামডহরি।

মোট=৪৯। আয়তন—৪৯.২ বর্গ কিঃ মিঃ। শহরাঞ্চল—১৬.৪ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল—৩২.৮ বর্গ কিঃ

*যাদবপুর, বেহালা ও গার্ডেনরীচ বর্তমানে ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত।

পূর্ব পুঁটিয়ারি	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—১১।	আয়তন—০·৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ।
চাকদহ	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—১১।	আয়তন—০·৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ।
বাঁশদ্রোণী	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—৩৪।	আয়তন—২·৩৩ বর্গ কিঃ মিঃ।
কামডহরি	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—১৮।	আয়তন—১·২৪ বর্গ কিঃ মিঃ।
বড়েমাশর	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—১৯।	আয়তন—০ ৬৯ বর্গ কিঃ মিঃ।
রাজাপুর	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—২৩।	আয়তন—০·৫০ বর্গ কিঃ মিঃ।
সন্তোষপুর	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—৩১।	আয়তন—১ ৩২ বর্গ কিঃ মিঃ।
যাদবপুর	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—২৩।	আয়তন—০·৫৭ বর্গ কিঃ মিঃ।
গরফা	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—৪০।	আয়তন—১·৯৭ বর্গ কিঃ মিঃ।
কসবা	অ-পৌর এলাকা।	ব্লক—৪১।	আয়তন—৪·৯২ বর্গ কি মিঃ।

কুষ্ঠিয়া, তিলজলা, বণ্ডেল, গড়সা, ঢাকুরিয়া, নাকতলা, রায়পুর, ইব্রাহিমপুর, সেলিমপুর, গোবিন্দপুর, আরকপুর, কাকলিয়া, চাঁদপুর, শিবপুর, খানপুর—ক্যালকাটা আরবান এরিয়াভুক্ত।

তপসিয়া—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

ভাঙ্গড় থানা

১ ধাপা মানপুর ২ কোচপুকুর ৩ জোটভীম ৪ হাটগাছা ৫ হাড়িয়া ৬ ধর্মতলা পাঁচুরিয়া ৭ কুলবেড়িয়া ৮ চন্দ কাঁঠালবেড়িয়া ৯ হাতিশালা ১০ ভগবানপুর ১১ আবুয়া ১২ দক্ষিণ খয়েরপুর ১৩ তাড়াহাড়িয়া ১৪ স্বাত্যনগাছি ১৫ অনন্তপুর ১৬ উঁড়িয়াপাড়া ১৭ উত্তর গাজিপুর ১৮ টোনা ১৯ উত্তর স্বরূপনগর ২০ দক্ষিণ স্বরূপনগর ২১ শ্যামনগর ২২ জয়নগর ২৩ নোয়াবাদ ২৪ পিথাপুকুরিয়া ২৫ জিরানগাছি ২৬ ওয়াড়ি ২৭ বিয়োন্তা ২৮ পাইকান ২৯ চারিশ্বর ৩০ সুখপুকুরিয়া ৩১ করোল বাড়িয়া ৩২ কড়িয়াডাঙা ৩৩ বাটিপোতা ৩৪ খরমবা ৩৫ গঙ্গাপুর ৩৬ আন্দুলগাড়ি ৩৭ মৌশাল ৩৮ তারদহ কাপাষ্টি ৩৯ মারায়ণতলা ৪০ উসপাড়া ৪১ বৈরামপুর ৪২ বাগবাড়ি ৪৩ দক্ষিণ গাজিপুর ৪৪ ঘুনিমেঘি ৪৫ বামুনিয়া ৪৬ কচুয়া ৪৭ উত্তর নারকেলবেড়িয়া ৪৮ নাঙলবেকি ৪৯ সাদুলি ৫০ মাঝেরহাট ৫১ উত্তর কাশীপুর ৫২ চণ্ডীহাট ৫৩ গড়াগাছা ৫৪ সাতভাইয়া ৫৫ নাঙলা পালপুর ৫৬ ভোগালি ৫৭ জামিরগাছি ৫৮ রঘুরাথপুর ৫৯ বানিয়াড়া ৬০ চিলাতলা ৬১ বামকাচুয়া ৬২ কাঁটাডাঙা ৬৩ সোনপুর ৬৪ রামপুর ৬৫ নিনকুরিয়া ৬৬ দেয়াটি

৬৭ সনপুকুরিয়া ৬৮ উত্তর রাজাপুর ৬৯ চালতাবেড়িয়া ৭০ জপুর ৭১ চকমরিচা ৭২ মরিচা ৭৩ সেরপুর ৭৪ নারায়ণপুর ৭৫ মাধবপুর ৭৬ হোগলদাড়া ৭৭ তালদীঘি ৭৮ কাসিয়াডাঙা ৭৯ মহেশপুকুরিয়া ৮০ কাশীনগর ৮১ সুণ্ডিয়া ৮২ কামারহাটি ৮৩ দারি মাধবপুর ৮৪ অমরেশ্বর ৮৫ দারা ৮৬ পদ্মপুকুরিয়া ৮৭ মালঞ্চ ৮৮ চক বারালি ৮৯ ভাঙড় রঘুনাথপুর ৯০ পানাপুকুর ৯১ উত্তর কাঠালিয়া ৯২ গোবিন্দপুর ৯৩ ধারা ৯৪ বারজুলি ৯৫ রঙসারা ৯৬ চণ্ডীপুর ৯৭ দেবীপুর ৯৮ ফুলবাড়ি বামুনিয়া ৯৯ ঘটক পুকুর ১০০ কালিকাপুর ১০১ নলমুড়ি ১০২ রাণী গাছি ১০৩ বালিপুর ১০৪ চক ভিকা ১০৫ বাজার আটি ১০৬ ব্যাংগোড়া ১০৭ করুণারহাটি ১০৮ ধর্মতলা ১০৯ দক্ষিণ কাশীপুর ১১০ সত্যবেড়িয়া ১১১ গরাণবেড়িয়া ১১২ ভাণ্ডারকুয়া ১১৩ মথুরাপুর ১১৪ জালালাবেড় ১১৫ কাশীনাথপুর ১১৬ চন্দনেশ্বর ১১৭ বৌশহর ১১৮ ঝুঙরি ১১৯ শংকশহর ১২০ এরেণ্ডা ১২১ সেনহাটি ১২২ সাতগাছি ১২৩ জগুলগাছি ১২৪ চাঁদপুর ১২৫ সান্তারা ১২৬ শ্রীরামপুর ১২৭ খড়গাছি ১২৮ পিটাসিমুলিয়া ১২৯ গোকুলপুর ১৩০ কাজুদিয়া ১৩১ নওড়া ১৩২ নোয়াপাড়া ১৩৩ বোদড়া ১৩৪ হরিশপুর ১৩৫ বাদি ১৩৬ হরিহরপুর ১৩৭ দুর্গাপুর ১৩৮ দক্ষিণ কাঠালিয়া ১৩৯ বীণারাত ১৪০ দক্ষিণ নারকেলবেড়িয়া ১৪১ সিতুরি ১৪২ সোণ্ডালিয়া ১৪৩ দক্ষিণ রাজাপুর ১৪৪ বকরি।

মোট=১৪৪। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল ৩২৩.৫ বর্গ কিঃ মিঃ
উলপাড়া—১৯৭১ আদমশুমারি সময়ে লোকবসতি ছিল না।

সোনারপুর থানা

১ চক কোলার খাল ২ করিমপুর ৩ জগাতিপোতা ৪ মুকুন্দপুর ৫ আটঘরা ৬ রণভূতিয়া ৭ কান্তিপোতা ৮ ভগবানপুর ৯ খড়াকি ১০ দিয়ারা ১১ খেয়াদহ ১২ খোদহাটি ১৩ গোয়ালাপোতা ১৪ কুমার পুকুরিয়া ১৫ তারদহ ১৬ তিহুরিয়া ১৭ নয়াবাদ ১৮ গঙ্গা জোয়ারা ১৯ ডিহি ২০ চাঁদপুর ২১ খুড়িগাছি ২২ গোরখহরা ২৩ ঘাসিয়ারা ২৪ মালিপুকুরিয়া ২৫ জগদীশপুর ২৬ রাধানগর ২৭ গোপালপুর ২৮ অরপঞ্চ ২৯ হাসানপুর ৩০ রামপুর ৩১ বিদ্যাধরপুর ৩২ ভবানীপুর ৩৩ চকহরিনাভি ৩৪ বংশীধরপুর ৩৫ কোদালিয়া ৩৬ হরিনাভি ৩৭ বৈকুণ্ঠপুর ৩৮ মথুরাপুর ৩৯ সোনারপুর ৪০ নোয়াপাড়া ৪১ কামরাবাদ ৪২ পাঁচপোতা

৪৩ ধেলুয়া ৪৪ তেঁতুলবেড়িয়া ৪৫ গড়াগাছা ৪৬ বালিয়া ৪৭ বারহানস ফরতাবাদ ৪৮ কুমারখালি ৪৯ কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া ৫০ কুসুম্ব ৫১ জগন্নাথপুর ৫২ তেঘরিয়া ৫৩ নিশ্চিন্তপুর ৫৪ মালিকাপুর ৫৫ রাজপুর ৫৬ উখিলা পাইকপাড়া ৫৭ লস্করপুর ৫৮ রামচন্দ্রপুর ৫৯ শ্রীপুর বাঘারঘোল ৬০ পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর ৬১ বোড়াল ৬২ রাণীয়া ৬৩ জয়কৃষ্ণপুর চিয়াড়ি ৬৪ ডাঙা ৬৫ বন হুগলি ৬৬ জয়েনপুর ৬৭ হোগলকুরিয়া ৬৮ রঘুনাথপুর ৬৯ ডিঙ্গেলপোতা ৭০ ইলাচি ৭১ জগদ্দল ৭২ পোলঘাট ৭৩ সারমন্তপুর ৭৪ রাঘবপুর ৭৫ ধামাইতলা ৭৬ চৌহাটি ৭৭ মাণিকপুর ৭৮ মালঞ্চ ৭৯ মহিরগড় ৮০ বড় হুগলি ৮১ গোবিন্দপুর ৮২ শ্রীরামপুর ৮৩ বারুলি ৮৪ বড়গাছিয়া ৮৫ শ্রীকৃষ্ণপুর ৮৬ বামনগাছি ৮৭ রাধাবল্লভপুর ৮৮ লাঙলবেড় ৮৯ জয়নগর ৯০ আঁধারিয়া ৯১ শামুকপোতা ৯২ প্রতাপনগর ৯৩ গাড়ল ৯৪ মেটিয়ারি ৯৫ কালিকাপুর ৯৬ মুড়াগাছা ৯৭ নাটাগাছি ৯৮ জড়দহ ৯৯ বেনেবউ ১০০ জাফরপুর ১০১ সাহেবপুর ১০২ খাড়িগোড়া ১০৩ রায়পুর ১০৪ হাসানপুর ১০৫ চকবেড়িয়া ১০৬ মকরামপুর ১০৭ কুস্টিয়া ১০৮ সাঙ্গুড় ১০৯ নবহাসান।

মোট = ১০৯। আয়তন—১৭০·৭ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল ১৪৮·৭ কিঃ মিঃ। শহরাঞ্চল—২১·০ বর্গ কিঃ মিঃ।

গোয়ালপোতা, মালিকাপুর, ইলাচি—১৯৭১ সালের আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

জগদ্দল, মালঞ্চ, মহীনগর, বংশীধরপুর, কোদালিয়া, হরিনাভি, বৈকুণ্ঠপুর, রাজপুর—রাজপুর পৌরসভান্তর্গত।

রাজপুর পৌরসভা ওয়ার্ড—১৪। ব্লক—৩৯। আয়তন—২০·৯৮ বর্গ কিঃ মিঃ।

বিষ্ণুপুর থানা

১ খড়ামুড়ি ২ আকুলাসি ৩ চন্দ্রহাটি ৪ দুলালপুর ৫ রামনগর ৬ মুকুন্দপুর ৭ রামদেবপুর ৮ খানপুর ৯ ঝিকরবেড়ে ১০ হাটবেড়িয়া ১১ ভেটকি ১২ রায়পুর ১৩ আঙ্গরবেড়িয়া ১৪ নাহাজারি ১৫ রাসপুঞ্জ ১৬ বনগ্রাম ১৭ সরমাস্টের চক ১৮ চক রাজুমোল্লা ১৯ নোয়াবাদ ২০ ভাসা, ২১ দক্ষিণ কাজিরহাট ২২ উত্তর কাজিরহাট ২৩ সামালি ২৪ গাজীপুর ২৫ চাঁদপুর ২৬ ছোট গগনগোয়ালিয়া ২৭ কদম্বতলা ২৮ পার্বতীপুর ২৯ খাড়বেড়িয়া

৩০ বিষ্ণুপুর ৩১ ঘোটবেড়িয়া ৩২ কন্যানগর ৩৩ মামুদপুর ৩৪ জয়রামপুর ৩৫ সুখদেবপুর ৩৬ চক শ্রীকৃষ্ণপুর ৩৭ চন্দনদহ ৩৮ কাশীবাটি ৩৯ মৌখালি ৪০ বড় গগনগোয়ালিয়া ৪১ কঙ্কনবেড়িয়া ৪২ নাদাবহাঙ্গা ৪৩ সাজুয়া ৪৪ মাখালিয়া ৪৫ চক সুখদেব ৪৬ বাঘরাহাট ৪৭ কীর্তনখোলা ৪৮ খাস টিকা ৪৯ বড় কলিকাপুর ৫০ জয় চণ্ডীপুর ৫১ দেউলবেড়িয়া ৫২ পাথর বেড়িয়া ৫৩ ভবানীপুর ৫৪ রামচন্দ্রনগর ৫৫ ধর্মপুর ৫৬ কিশোরপুর ৫৭ দাবপুর ৫৮ ইগরাগ্রাম ৫৯ নলভাগ ৬০ অভিরামপুর ৬১ রামচন্দ্রপুর ৬২ ঘোরাহাটা মুকুন্দপুর ৬৩ গোয়ালবাড়ি কালীচরণপুর ৬৪ দেউলি সুলতানপুর ৬৫ গোবিন্দপুর ৬৬ সুলতানগঞ্জ ৬৭ কৃষ্ণপুর ৬৮ বোরাহানপুর ৬৯ শ্রীকৃষ্ণপুর ৭০ রামকৃষ্ণপুর ৭১ গঙ্গারামপুর ৭২ কৃপারামপুর ৭৩ আমতলা ৭৪ উদয়রামপুর ৭৫ শপখালি ৭৬ চকবাগি ৭৭ গণেশকুড়িবেড়িয়া ৭৮ বাগি ৭৯ দৌলতপুর ৮০ রাজারামপুর ৮১ রাম মাখালের চক ৮২ কুলের দাঁড় ৮৩ বকেশ্বর ৮৪ চিয়ারি ৮৫ মাগুরখালি ৮৬ চক বালাইবাগ ৮৭ ঝনঝরা ৮৮ দেবীপুর ৮৯ কৃষ্ণরামপুর ৯০ রঘুদেবপুর ৯১ করিমপুর ৯২ করিমপুর কিসমত ৯৩ আমগাছি ৯৪ মাঝের দাঁড় ৯৫ উত্তরগোরীপুর ৯৬ আবজাখালি ৯৭ গন্ধবাদুলি ৯৮ চকএনায়েত নগর ৯৯ এনায়েতনগর ১০০ মীরপুর ১০১ চণ্ডী ১০২ চকধীর ১০৩ আলিপুর ১০৪ বড় দেউলি ১০৫ দেউলি ১০৬ বলরামপুর ১০৭ দক্ষিণ গৌরীপুর ১০৮ দৌলতাবাদ ১০৯ খিরিশতলা ১১০ কৈখালি ১১১ চক রোসনমামুদ ১১২ ছোট রামনগর ১১৩ কাষ্ঠ মহল ১১৪ খালসিতলা ১১৫ চক সীতারাম ১১৬ রামকান্তপুর ১১৭ রাঘবপুর ১১৮ কালীচরণপুর ১১৯ হরের চক ১২০ চক কলমী ১২১ শালপুকুরিয়া ১২২ গাংরাই ১২৩ কালীপুর ১২৪ কেওপুকুরিয়া ১২৫ চক নিতাই ১২৬ কলমীখালি ১২৭ পানাকুয়া ১২৮ চক নুরশিকদার ১২৯ বেতবেড়িয়া ১৩০ দারিকেওড়া ডাঙা ১৩১ টাপা ১৩২ উমরপোতা ১৩৩ বালাখালি ১৩৪ লক্ষীকান্তপুর ১৩৫ কান্তেকুমারী ১৩৬ দোসাতিনা ১৩৭ জলীলপুর ১৩৮ রজক গোহালিয়া ১৩৯ কেওড়াডাঙা ১৪০ গাবারিয়া ১৪১ আয়ারপুর ১৪২ চার্মান ১৪৩ বিজয়রামপুর ১৪৪ বাহাদুরপুর ১৪৫ ভাণ্ডারিয়া ১৪৬ নেতানা ১৪৭ মেস্তাখালি ১৪৮ রাসখালি ১৪৯ উচ্ছাখালি ১৫০ মানিকজোড় ১৫১ মৎস্যখালি ১৫২ জুলপিয়া ১৫৩ আঁধারমাণিক ১৫৪ পিরখালি ১৫৫ পানারালা ১৫৬ হাটা ১৫৭ দমদমা কিসমত ১৫৮ বড়ু রামকৃষ্ণপুর।

মোট = ১৫৮। আয়তন—২১৩.৪ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল—২১১.৬ বর্গ কিঃ মিঃ। শহরাঞ্চল—১.৮ বর্গ কিঃ মিঃ।
খানপুর, খালসি—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।
কন্যানগর অ-পৌর এলাকা। ব্লক ঃ ৮। ১৮ বর্গ কিঃ মিঃ।

বজবজ থানা

১ কালীনগর বাড়ে ২ গরভুক্তা নন্দনপুর ৩ নিজগড় ৪ জয় চণ্ডীপুর চারিয়াল ৫ জয় চণ্ডীপুর ৬ অভিরামপুর ৭ বিজনহরিয়া চারিয়াল ৮ বেনজানহারিয়া ৯ উত্তর রায়পুর ১০ চক নবাসন ১১ নন্দরামপুর ১২ বলরামপুর ১৩ চিংড়িপোতা ১৪ আত্মারামপুর ১৫ সন্তোষপুর ১৬ বেতুয়াবাটি রাজারামপুর ১৭ কিশোরপুর ১৮ বেতুয়াবাটি ১৯ পার্বতী ২০ মলঙ্গদর ২১ ঘনশ্যামবাটি ২২ বানারাপুর ২৩ বুইতা ২৪ জামালপুর ২৫ নিশ্চিন্তপুর ২৬ কালীপুর ২৭ উত্তর রামচন্দ্রপুর ২৮ দুর্গাপুর ২৯ মৌখালি ৩০ রঘুনাথপুর ৩১ রাজারামপুর ৩২ পুজালি ৩৩ রাজীবপুর ৩৪ আচিপুর ৩৫ জগৎবল্লভপুর ৩৬ মায়াপুর ৩৭ চণ্ডীপুর ৩৮ চক কাশীপুর ৩৯ চক আলমপুর ৪০ আইমা ৪১ চক বাঁশবেড়িয়া ৪২ সাতগাছিয়া ৪৩ বেটকাখালি ৪৪ বাওয়ালি ৪৫ মহেশ্বরপুর ৪৬ কালিনগর ৪৭ চক ইটবাড়ি ৪৮ চক মাণিক ৪৯ চক পরাণ ৫০ মুচিসা ৫১ বাহির চারা ৫২ সাহেবান বাগিচা ৫৩ চক দৌলত ৫৪ নাদাখালি ৫৫ সোনারপুর ৫৬ চারা ডোঙারিয়া ৫৭ হাওড়ি ৫৮ ধানচেবেড়িয়া ৫৯ ডোঙারিয়া ৬০ দক্ষিণ রায়পুর ৬১ গাদাখালি ৬২ পোয়ালি ৬৩ বড়তলা ৬৪ বাহিরকুঁজি ৬৫ তেলারি ৬৬ নলদারি ৬৭ বুরুল ৬৮ কেশবপুর ৬৯ চাণ্ডুয়া ৭০ গাজা ৭১ পৈতা ৭২ বনগ্রাম ৭৩ দোসাতিনা, ৭৪ বাগপোতা ৭৫ কুচিগাড়ি ৭৬ রেইনা গোবিন্দপুর ৭৭ পাকুয়া কুলটিকারি ৭৮ সেহাই ৭৯ বিদিরা ৮০ দেউলি ৮১ কামরা ৮২ বৃন্দাবনপুর ৮৩ সাহেবান উমেদপুর ৮৪ মহামায়াপুর ৮৫ চক হিম্মত খান ৮৬ মাঝেরাত ৮৭ আড়িপাড়া ৮৮ চাউল খোলা ৮৯ লস্করপুর ৯০ ইটালি ৯১ সতসা ৯২ দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর ৯৩ দক্ষিণ সন্তোষপুর ৯৪ তালমাড়িয়া ৯৫ নেয়ান ৯৬ সোনারিয়া ৯৭ বারেয়া ৯৮ মোহনপুর ৯৯ সুভি।
মোট = ৯৯। আয়তন—১৪২.৫ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল—১২৪.৬ বর্গ কিঃ মিঃ। শহরাঞ্চল—১৭.৯৫ বর্গ কিঃ মিঃ।

কালি নগর বাড়ে, গড়ভুক্তা নন্দনপুর, নিজগড়, জয়চণ্ডীপুর চারিয়াল, জয়চণ্ডীপুর, বিজনহরিয়া—বজবজ পৌর সভান্তর্গত।

মায়াপুর—বিড়লাপুর অ-পৌর এলাকাভুক্ত।

বজবজ পৌরসভা ওয়ার্ড—১৭। ব্লক—৫৬। আয়তন—২·৭৭ বর্গ কিঃ মিঃ।

উত্তর রায়পুর অ-পৌর এলাকা ব্লক—১০। আয়তন—৫·৩২ বর্গ কিঃ মিঃ।

বিড়লাপুর অ-পৌর এলাকা ব্লক—২৯। আয়তন—৪·৮৪ বর্গ কিঃ মিঃ

বারুইপুর থানা

১ পেতুয়া ২ আউলিয়াপুর ৩ জামালহাটি ৪ ভানতা ৫ খাড়ুপাতালিয়া ৬ গাড়িয়া ৭ শ্রীরামপুর ৮ পাঁচঘরা ৯ ফরিদপুর ১০ মল্লিকপুর ১১ হরিহরপুর ১২ গণেশপুর ১৩ খোলাপোতা ১৪ আকণা মীর্জাপুর ১৫ ভুরকুল ১৬ সুলতানপুর ১৭ বেড়ালিয়া ১৮ কাঁপিন্দপুর ১৯ মধুবনপুর ২০ তাগড়াবাড়িয়া ২১ মলঙ্গা ২২ তেগাছি মামুদপুর ২৩ ঘোষপুর বয়রা ২৪ চম্পাহাটি ২৫ সোলগোহালিয়া ২৬ হারাল ২৭ নরিডানা ২৮ কামরা ২৯ বেগমপুর ৩০ আটঘরা ৩১ বারুইপুর ৩২ সুবুদ্ধিপুর ৩৩ কাশিপুর ৩৪ ডিহি মেদানমল্লা ৩৫ খাস মল্লিক ৩৬ বৈকুণ্ঠপুর ৩৭ বিরলধাম নগর ৩৮ উত্তর কল্যাণপুর ৩৯ পুরন্ধরপুর ৪০ খোদার বাজার ৪১ দক্ষিণকল্যাণপুর ৪২ মধ্য কল্যাণপুর ৪৩ ধোপাগাছি ৪৪ জগদীশপুর ৪৫ টাঙতলা ৪৬ চণ্ডীপুর ৪৭ চক আলালপুর ৪৮ চাকরাবেড় ৪৯ নিহাটা ৫০ সানপুকুরিয়া ৫১ পশ্চিম মাধবপুর ৫২ কুন্দরালি ৫৩ কালিকাপুর ৫৪ মলয়পুর ৫৫ মহেশপুর ৫৬ সোনাগাছি ৫৭ গোপালপুর ৫৮ বাগদহ ৫৯ ধানবেড়িয়া ৬০ চন্দনপুকুর ৬১ দুর্গাপুর গাজিপুর ৬২ মানুদপুর ৬৩ ইন্দ্রপালা ৬৪ শিখরবালি ৬৫ ত্রিপুরানগর ৬৬ শাসন ৬৭ বেলিয়াঘাটা ৬৮ পশ্চিম রামনগর ৬৯ কোমারহাট ৭০ মীরপুর ৭১ বানবেড়ে ৭২ তুলারবাদা ৭৩ কাঁঠালবেড়িয়া ৭৪ শঙ্করপুর ৭৫ খানপুর ৭৬ রতনপুর ৭৭ আলমপুর ৭৮ টিকা ৭৯ বলবলিয়া ৮০ দুর্গ ৮১ নোর ৮২ গাজিরহাট ৮৩ দাদপুর ৮৪ কেশবপুর ৮৫ গঙ্গা দুয়ারা ৮৬ রাজগাড়া ৮৭ গোচারণ ৮৮ পাঁচগাছিয়া ৮৯ কেয়াতলা ৯০ নাচনগাছা ৯১ কুমারখালি ৯২ ভাতপোয়া ৯৩ রামচন্দ্রপুর ৯৪ বেলেডহরি ৯৫ তেউরহাট ৯৬ সৈয়দপুর ৯৭ রামনগর ৯৮ পুরুষোত্তমপুর ৯৯ পশ্চিম মল্লিকপুর ১০০ শেরপুর ১০১ আলিপুর ১০২ সূর্যপুর ১০৩ চাঁদখালি ১০৪ পদ্মজলা

১০৫ রাণা ১০৬ শংকরীপুর ১০৭ দুধনাই ১০৮ সীতাকুণ্ড ১০৯ বাজেওড়ণ্ডা ১১০ মাধবপুর ১১১ ফুলডুবি ১১২ চিত্রশালী ১১৩ উত্তরবাগ ১১৪ কালাবাড়ু ১১৫ ছানি ১১৬ টোঙারবেড়িয়া ১১৭ জয়কৃষ্ণনগর ১১৮ কুরুলি ১১৯ রামধারি ১২০ ঘোলা ১২১ দক্ষিণ ঘোলা ১২২ হরিমল ১২৩ জেলেরহাট ১২৪ পূর্ব মল্লিকপুর ১২৫ বোলেবামনি ১২৬ বৃন্দাবনখালি ১২৭ পারুলদহ ১২৮ জয়তলা ১২৯ দণ্ডপুর ১৩০ গোরদহ ১৩১ মৌতলা ১৩২ নবগ্রাম ১৩৩ ধনখোলা ১৩৪ হরদহ ১৩৫ বেতবেড়িয়া ১৩৬ বেলেগাছি ১৩৭ খড়মপাড়া।

মোট = ১৩৭। আয়তন ২১৪.৫ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল ২০৫.৪ বর্গ কিঃ। শহরাঞ্চল—৯.১ বর্গ কিঃ মিঃ।

আউলিয়াপুর চক আলালপুর তুলারবাদা কুমারখালি ধানখোলা—১৯৭১ সালের আদমশুমারি সময়ে লোকবসতি ছিল না।

সুবুদ্ধিপুর—বারুইপুর পৌরসভান্তর্গত।

বারুইপুর পৌরসভা ওয়ার্ড ১১। ব্লক ২০। আয়তন—৯.০৭ বর্গ কিঃ মিঃ।

ক্যানিং থানা

১ কালুগাছি ২ পাড় কালুগাছি ৩ মল্লিককাঠি ৪ চণ্ডীবাড়ি ৫ চুনঘাটা ৬ গুটরি ৭ দেউলি ৮ জয়খালি ৯ কায়েম খান ১০ হাতিমারি ১১ মদনখালি ১২ গন্তি ১৩ বলিদাঘাটা ১৪ বামুনিয়া ১৫ মুখুজ্জেপাড়া ১৬ কালুয়াখালি ১৭ পাড়গণ্ডি ১৮ গঙ্গাচোরিয়াল ১৯ জীবনতলা ২০ পাইনা ২১ মিঞাঘেরি ২২ শম্ভাখালি ২৩ ঘিখালি ২৪ হাওড়ামারি ২৫ ভবানন্দ ২৬ হাড়িয়া ২৭ নেতরা ২৮ হংসরাবাদ ২৯ ঈশ্বরীপুর ৩০ মোকতারপুর ৩১ রামরায়ের ঘেরি ৩২ সিংহেশ্বর ৩৩ চেঙদোনা ৩৪ নাগরতলা ৩৫ পাটিখালি ৩৬ চেলিকাঠি ৩৭ বিবির আবাদ ৩৮ সারাঙ্গের আবাদ ৩৯ খাগড়া ৪০ কাওরাখালি ৪১ বকুলতলা ৪২ জলঘাটা ৪৩ কাপারপুরী ৪৪ চুনপুরী ৪৫ সাবেক মহিষাহারা ৪৬ বেনতলা ৪৭ খুনখালি ৪৮ তাম্বুদহ ৪৯ মৌখালি কুমারখালি ৫০ যোগেন্দ্রনগর ৫১ কালিকাতলা ৫২ মঠের দীঘি ৫৩ দহরাণী ৫৪ হেদিয়ারাবাদ ৫৫ আধারবেঁক ৫৬ গাবুনি ৫৭ মাতলা ৫৮ খাসকুমারখালি ৫৯ বয়ারসিঙ ৬০ তালদি ৬১ রাজাপুর ৬২ শিবনগর ৬৩ নারায়ণগড় ৬৪ ঠাকুরাণীবেড়িয়া ৬৫ দরিয়া ৬৬ মন্দারবেড়িয়া ৬৭ সুন্দিপুকুরিয়া ৬৮ গোবরামারি ৬৯ পাঙাশখালি ৭০ রামামারি ৭১ ভালিয়া ৭২ রোনিয়া ৭৩ তেঁতুবেড়িয়া ৭৪ হাটপুকুরিয়া ৭৫ মারাপিয়া ৭৬ ডেভিসআবাদ ৭৭ বালোইঝাঁকা ৭৮ ধর্মতলা ৭৯ দত্ত বাবুরাবাদ

৮০ কুলাঘুরানী ৮১ গোপালপুর ৮২ আমতলাভারি ৮৩ বসুর চক ৮৪ দক্ষিণ কালিকাতলা ৮৫ বদুকলু ৮৬ হেরোভাঙা ৮৭ গড়খালি ৮৮ দক্ষিণ রেদোখালি ৮৯ উত্তর রেদোখালি ৯০ হাতামারি ৯১ দুমকি ৯২ মৌখালি ৯৩ দক্ষিণ অঙ্গাদবেড়িয়া ৯৪ উত্তর অঙ্গাদবেড়িয়া ৯৫ আধলা ৯৬ মরাহলদি ৯৭ কাঁকড়াদহ ৯৮ হলাপাড়া ৯৯ পোড়ামুড়া ১০০ ট্যাংরাখালি ১০১ কড়াকাটি ১০২ কুমারশা চক ১০৩ দিঘিরপাড় ১০৪ নিকারিঘাটা ১০৫ হিঙ্গখালি ১০৬ পরাণখেকো ১০৭ বানিবাদা বেলকেহালি ১০৮ ডাবু ১০৯ বুধখালি ১১০ গোলাবাড়ি ১১১ মধুখালি ১১২ কৃপাখালি ১১৩ বনসারা ১১৪ মাকালতলা ১১৫ শ্রীনগর ১১৬ বনমালীপুর ১১৭ নারায়ণপুর ১১৮ শ্রীকৃষ্ণপুর ১১৯ করথনার চক ১২০ কালারিয়া ১২১ গৌরদহ ১২২ হোমার পোলতা ১২৩ কুলের খোঁজ।

মোট = ১২৩। আয়তন—৪৮৬·৭ বর্গ কি. মি.। গ্রামাঞ্চল—৪৭৩·৭ বর্গ কি.মি.। শহরাঞ্চল—১৩·০ বর্গ কি মি.।

চুনপুরী, তাম্বুলদহ—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

দিঘিরপাড়, মাতলা—ক্যানিং অ-পৌর এলাকান্তর্গত।

ক্যানিং অ-পৌর এলাকা—ব্লক—২৭। আয়তন—১২·৯৮ বর্গ কি মি।

বাসন্তী থানা

১ কুমারখালি ২ চর বিদ্যারাবাদ ৩ চুনাখালি ৪ বেড়িয়া ৫ বগুলাখালি ৬ পুর্ব বয়ারসিঙ ৭ সাচেখালি ৮ মনসাখালি ৯ লেবুখালি ১০ চাতরাখালি ১১ নারায়ণতলা ১২ ভাঙ্গনখালি ১৩ ফুলমালঞ্চ ১৪ তিতকুমার ১৫ খাড়িমাচান ১৬ ধুরি ১৭ আমঝরা ১৮ কাঠালবেড়িয়া ১৯ দক্ষিণ নারায়ণতলা ২০ নালিয়াখালি ২১ তেঁতুলতলা ২২ আমড়াতলা ২৩ উত্তর বটতলা ২৪ হরভাঙ্গি ২৫ চারাণিখালি ২৬ সোনাখালি ২৭ উত্তর সোনাখালি ২৮ উত্তর মোকামবেড়িয়া ২৯ খিরিশখালি ৩০ রামচন্দ্রখালি ৩১ কালাহাজরা ৩২ হোগল দুরি ৩৩ রামকৃষ্ণপুর ৩৪ দক্ষিণ বটতলা ৩৫ মজিদবাড়ি ৩৬ গড়খালি ৩৭ হরেকৃষ্ণপুর ৩৮ বাণীগড় ৩৯ জয়গোপালপুর ৪০ জ্যোতিষপুর ৪১ রাধারাণীপুর ৪২ হিরন্ময়পুর ৪৩ ভারতগড় ৪৪ মহেশপুর ৪৫ শিবগঞ্জ. ৪৬ চক পিতম্বর দত্ত ৪৭ দক্ষিণ মোকামবেড়িয়া ৪৮ মাঠগড়ান ৪৯ সজিনাতলা ৫০ চন্দ্রকোণা ৫১ বালারটোপ ৫২ কুমীরমারি ৫৩ আনন্দ আবাদ ৫৪ কৃষ্ণনগর ৫৫ শ্রীরামপুর ৫৬ কালিডাঙা ৫৭ রাধাবল্লভপুর ৫৮ বাসন্তী ৫৯ পুরন্দর ৬০ নফরগঞ্জ ৬১ পার্বতীপুর ৬২ লস্করপুর

৬৩ লাট-১২৬। ৬৪ লাট-১২৫। ৬৫ লাট-১২৪। ৬৬ গরানবোস, ৬৭ বিরিঞ্চিবাড়ি।

মোট = ৬৭। সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল আয়তন ৪০৯.৭ বর্গ কিঃ মিঃ।

লাট-১২৫ ও লাট-১২৪—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

জয়নগর থানা

১ নারায়নীতলা ২ বেলেচণ্ডী ৩ কান্তপুকুরিয়া ৪ খাজুরদহ ৫ সরবেড়িয়া ৬ বজরা ৭ পদমিরাট ৮ রামকান্তবাড়ি ৯ মাসটিকরি ১০ খাটসরা ১১ মুকুন্দপুর ১২ রাজাপুর ১৩ বহড়ু ১৪ তাজপুর ফতেপুর ১৫ অযোধ্যানগর ১৬ রামনারায়ণপুর ১৭ জয়নগর ১৮ হাটপাড়া ১৯ মজিলপুর ২০ বনমালিপুর ২১ শ্রীরামপুর ২২ ফুটিগোড়া ২৩ দোসরা ভগবানপুর ২৪ গহেরপুর ২৫ বাগবেড়িয়া-নারায়ণপুর ২৬ শের হাঙ্গামপুর ২৭ নির্মাপিট ২৮ তুলসীঘাটা ২৯ খানিয়া শাহাজাদগড় ৩০ কালীনগর ৩১ শাহাজাদপুর ৩২ বিজয়নগর ৩৩ গঙ্গানারায়ণপুর ৩৪ রামকৃষ্ণপুর ৩৫ উত্তর দুর্গাপুর ৩৬ আলিপুর ৩৭ কাশীপুর গঙ্গাঘাটা ৩৮ শ্রীপুর ৩৯ চণ্ডীপুর ৪০ কমলপুর ৪১ ময়দা ৪২ মহিষগোট ৪৩ নাপুকুরিয়া ৪৪ উত্তরপাড়া আবাদ ৪৫ গঙ্গাপুর ৪৬ উত্তরপাড়া নিজ ৪৭ কালীকাপুর বারাসাত ৪৮ বেলডাঙা ৪৯ রায়নগর ৫০ হরিনারায়ণপুর ৫১ পশ্চিম গবেড়িয়া ৫২ আন্দিলপুর ৫৩ নন্দনপুর ৫৪ লক্ষীনারায়ণপুর ৫৫ রামচন্দ্রপুর ৫৬ পাঁচঘড়া ৫৭ নুরুল্লাপুর ৫৮ আব্দুলকরিমপুর ৫৯ বাণেশ্বরপুর ৬০ হোগলা ৬১ জঙ্গলিয়া ৬২ পশ্চিম চক পাঁচঘরা ৬৩ পানপো ৬৪ নেউতলা ৬৫ শান্তিপুর ৬৬ কিসমত গোয়ালবেড়িয়া ৬৭ গোয়ালবেড়িয়া ৬৮ উত্তর রঘুনাথপুর ৬৯ শ্রীকৃষ্ণনগর ৭০ পূর্ব চক পাঁচঘরা ৭১ নীলকণ্ঠপুর ৭২ রামরুদ্রপুর ৭৩ অরুণনগর দক্ষিণ ৭৪ চাতরা ৭৫ দেওয়ানগঞ্জ ৭৬ হোগলদহরি ৭৭ অরুণনগর উত্তর ৭৮ ঝালদারি ৭৯ আব্দুলবেড়িয়া ৮০ পূর্ব গাববেড়িয়া ৮১ ধোসা ৮২ চন্দনেশ্বর ৮৩ তিলপি ৮৪ মানিকনগর ৮৫ চারাঘাটা ৮৬ রাজাপুর কারাবেগ ৮৭ বাটরা ৮৮ কামারিয়া ৮৯ খেয়ামারা ৯০ মায়াহাউরি ৯১ গড়দোয়ানি ৯২ পশ্চিম রঘুনাথপুর ৯৩ মোল্লার চক ৯৪ জাউতিয়া ৯৫ বেইসহাটা ৯৬ ঘোষের চক ৯৭ কিল্লা দুর্গানগর ৯৮ পাটপুকুর ৯৯ তালতলা ১০০ যোগীগরা ১০১ বাটোলা ১০২ দমদমা ১০৩ গোপালনগর ১০৪ কালিকাপুর ১০৫ বৈদ্য চক ১০৬ পশ্চিম তেঁতুল বেড়িয়া ১০৭ পূর্ব রঘুনাথপুর ১০৮ বেলে দুর্গানগর ১০৯ রূপনগর ১১০ সাপলা ১১১ উত্তর গরান কাঠি ১১২ তারানগর ১১৩ পূর্ব

বাঁটরা ১১৪ গোবিন্দপুর ১১৫ পশ্চিম শ্যামনগর ১১৬ গুমুথবেড়িয়া ১১৭ খড়িবাড়ি ১১৮ মণিরটাট।

মোট=১১৮। আয়তন—৩৬৪.৪ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল—৩৫৯.২ বর্গ কিঃ মিঃ। শহরাঞ্চল—৫.২ বর্গ কিঃ মিঃ।

আদিলপুর আন্দুলবেড়িয়া—১৯৭১ আদমশুমারী সময় লোকবসতি ছিল না।

জয়নগর গহেরপুর—জয়নগর মজিলপুর পৌরসভান্তর্গত।

জয়নগর— মজিলপুর পৌরসভা—ওয়ার্ড ১১। ব্লক ২৬। আয়তন-৫.১৮ বর্গ কিঃ মিঃ।

কুলতলী থানা

১ মীরাগঞ্জ ২ বেনীমাধবপুর ৩ কৈলাসনগর ৪ পূর্ব শ্যামনগর ৫ পূর্ব তেঁতুলবেড়িয়া ৬ ডোঙাজোড়া ৭ কুন্দখালি ৮ বলহারানিয়া ৯ আঁধারিয়া ১০ অম্বিকানগর ১১ অলিতাখালি ১২ কোয়াবাতি ১৩ কাকাশাহ ১৪ গঙ্গাধরপুর ১৫ পাঁচুখালি ১৬ কীর্তনখোলা ১৭ মহিষমারি ১৮ কৃপাখালি ১৯ গোদাবর ২০ জালাবেড়িয়া ২১ কাওরাখালি ২২ মণ্ডলের লাট ২৩ জাপতলা ২৪ পূর্ব গাবতলা ২৫ পশ্চিম গাবতলা ২৬ রাধাবল্লভপুর ২৭ নলগোড়া ২৮ সোনাটিকরি ২৯ ভুবনখালি ৩০ চুপড়িঝাপড়া ৩১ শ্যামনগর ৩২ মাধবপুর ৩৩ মধুসূদনপুর ৩৪ দক্ষিণ গরানকাঠি ৩৫ গোপালগঞ্জ ৩৬ কৈখালি ৩৭ সানকি জাহান ৩৮ কাটামারি ৩৯ দক্ষিণ দুর্গাপুর ৪০ দেউলবাড়ি দেবীপুর ৪১ লাট-১২১ ৪২ লাট-১২০ ৪৩ পূর্ব গুড়গুড়িয়া ৪৪ মধ্য গুড়গুড়িয়া ৪৫ দেবীপুর গুড়গুড়িয়া ৪৬ ভুবনেশ্বরী ৪৭ মাইপিট ৪৮ বিনোদপুর ৪৯ বৈকুণ্ঠপুর ৫০ কিশোরীমোহনপুর ৫১ লাট-১১৮ ৫২ ভুবনেশ্বরী চর।

মোট=৫২। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল—৩৬১.১ বর্গ কিঃ মিঃ।

লাট-১২১ ও লাট-১২০—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা

মগরাহাট থানা

১ হায়াতনগর রাজারহাট ২ অযোধ্যানগর ৩ চক জয়দি ৪ শিরাকোল ৫ বাগারিয়া খড়গাছি ৬ চক দেবুঘোষ হরেকৃষ্ণপুর ৭ আয়ারপুর ৮ চক হাটুরিয়া ৯ খেলারামপুর ১০ রাজারামপুর ১১ নরহরিপুর ১২ ঘাটহারানিয়া ১৩ রামচন্দ্রপুর ১৪ বাখরাবাদ ১৫ শেরপুর ১৬ সীতারামপুর ১৭ চক পরাণকাটাখালি ১৮ উত্তর আমড়াতলা ১৯ চক হরনন্দপুর ২০ শেকান্দরপুর ২১ বেড়ামারা ২২ রাজাপুর ২৩ ডিহি নারায়নী ২৪ করিমাবাদ ২৫ উত্তর মোহনপুর ২৬ জয়েন খান ২৭ চক কমল হালদার ২৮ চক ঈশ্বরী

২৯ মাধবপুর ৩০ উত্তর গোপীনাথপুর ৩১ পাঁচপাড়া ৩২ হোরিয়া ৩৩ মৌখালি ৩৪ মণিরামপুর ৩৫ রত্না ৩৬ হোতার ৩৭ টাপুকুর ৩৮ মাকালতলা ৩৯ উত্তর মুকুন্দপুর ৪০ মীরজাদা ৪১ বাণীবেড় ৪২ ধামুয়া ৪৩ শ্যামপুর ৪৪ পূর্ব বামনাথপুর ৪৫ চক জলসী ৪৬ পশ্চিম কামারপুকুরিয়া ৪৭ নৈনান ৪৮ ব্যাসপুর ৪৯ কুলদিয়া ৫০ মীর্জাপুর ৫১ বলবলিয়া ৫২ দোদালিয়া ৫৩ উত্তর কৃষ্ণপুর ৫৪ পারুই ৫৫ বলরামপুর ৫৬ রাজবল্লভপুর ৫৭ মহেশ্বরা ৫৮ চক রায়পুর ৫৯ চন্দনিয় ৬০ দস্তুরা ৬১ শিবপুর ৬২ চক নরহরিপুর ৬৩ শ্রীচন্দা ৬৪ রাজপুকুরিয়া ভাতুগাছি ৬৫ বৈষ্ণবেড়িয়া ৬৬ পাণ্ডুয়া ৬৭ সাপমারা ৬৮ মহেশদ্বারি ৬৯ দোগাছিয়া ৭০ রসা ৭১ মধ্য কৃষ্ণপুর ৭২ জগদীশ নগর ৭৩ প্রতাপবেড়িয়া ৭৪ বাণেশ্বরপুর ৭৫ ডিহি সরিষাপাড়া ৭৬ কেশিলি ৭৭ উত্তর বিষ্ণুপুর ৭৮ পশ্চিম রামনাথপুর ৭৯ রঙ্গিলাবাদ ৮০ দক্ষিণ গোপীনাথপুর ৮১ আটপারুই ৮২ জয়পুর ৮৩ চাকদহ ৮৪ আলমপুর ৮৫ কমলপুর ৮৬ জিওলপুকুর ৮৭ চক হরিহরপুর ৮৮ কেকোনা ৮৯ পায়রা চলি ৯০ হিজলহাট ৯১ হরিহরপুর ৯২ জাহাঙ্গীরনগর ৯৩ মলঙ্গী সরিষাপাড়া ৯৪ বাহিরগাছি ৯৫ উস্থি ৯৬ নৈনানপুর ৯৭ নাজরা ৯৮ পদ্মা ৯৯ দেউলা ১০০ দক্ষিণ কৃষ্ণপুর ১০১ খলিলপুর ১০২ কানপুর ১০৩ বারিজপুর ১০৪ ঘোলানোয়াপাড়া ১০৫ উত্তর কুসুম ১০৬ সামসহাট ১০৭ তুল্যান ১০৮ কালিকাপোতা ১০৯ খানপুর ১১০ জলঘরা ১১১ ডিহি কলস ১১২ এনায়েতপুর ১১৩ হানসুরি ১১৪ উত্তর কলস ১১৫ দক্ষিণ মোহনপুর ১১৬ বেলগাছিয়া ১১৭ আজমখালি ১১৮ বেলারিয়া ১১৯ উত্তর রাধানগর ১২০ শ্যামনগর ১২১ গোটবেড়িয়া ১২২ হরিশঙ্করপুর ১২৩ মগরাহাট ১২৪ মইতলা ১২৫ বিলান্দাপুর ১২৬ মামুদপুর ১২৭ মোল্লার চক ঈশ্বরীপুর ১২৮ সংগ্রামপুর ১২৯ দক্ষিণ কাশী ১৩০ সর্বানন্দপুর ১৩১ ধনপোতা ১৩২ বাঁশপালা ১৩৩ বারপুয়া ১৩৪ কুরকুরিয়া ১৩৫ বামনা ১৩৬ কারপানসারা ১৩৭ মহিষামুড়ি ১৩৮ সরাচি ভগবানপুর ১৩৯ মলয়া ১৪০ হাটুগঞ্জ ১৪১ একতারা ১৪২ দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ১৪৩ বাসুদেবপুর ১৪৪ সাধুখানারদাড়ি ১৪৫ ঘটকপুর ১৪৬ আটপাড়া ১৪৭ শঙ্করপুর ১৪৮ গোপালনগর ১৪৯ বক্রাদ্বার ১৫০ লক্ষীকান্তপুর ১৫১ হরিপুর ১৫২ বিশ্বেশ্বরপুর ১৫৩ পরানখালি ১৫৪ দক্ষিণ মুকুন্দপুর ১৫৫ তালদি ১৫৬ উরেল চাঁদপুর ১৫৭ পূর্ব কামারপুকুরিয়া ১৫৮ মাইতির হাট ১৫৯ ঘনশ্যামপুর ১৬০ গোকর্ণী ১৬১ বরাট কামদেবপুর ১৬২ মুলতি ১৬৩ বাসুনদারিয়া ১৬৪ জলধাপা ১৬৫ তাঁতিহাটি ১৬৬ তসরালা ১৬৭ রামচন্দ্রনগর ১৬৮ জগদিয়া ১৬৯ বেনীপুর ১৭০ গোবিন্দপুর ১৭১ কাঁটাপুকুরিয়া

১৭২ আবাদ চাঁদপুর ১৭৩ ঈশ্বরীপুর ১৭৪ কাঠাকনা ঈশ্বরীপুর ১৭৫ আবাদ ঈশ্বরীপুর।

মোট=১৭৫। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল ২৫৫·১ বর্গ কিঃ মিঃ।

জিওলপুকুর, চকহরিহরপুর, খলিলপুর, বেলারিয়া, করপনসারা—১৯৭১ আদমশুমারি সময় কোন লোকবসতি ছিল না।

ফলতা থানা

১ বৈদ্যখাল ২ পাঁকুড়তলা ৩ শ্রীবল্লভপুর ৪ বকুলতলা ৫ খোরদা বকুলতলা ৬ পাইকান ৭ বড় অসৎ ৮ কৃষ্ণপুর ৯ মামুদপুর ১০ দক্ষিণালা ১১ গুঠারি ১২ পশ্চিম দৌলতপুর ১৩ পদ্মপুর ১৪ আবাদ শিমুলগঞ্জ ১৫ মহাদেবপুর ১৬ আহম্মদপুর ১৭ রাজারামপুর ১৮ চক ধনুমণ্ডল কৃষ্ণরামবসু ১৯ শ্যামসুন্দরপুর ২০ বসুলাট ২১ ফলতা ২২ চণ্ডীদেউল ২৩ সাহারা ২৪ ভাতুয়ালী ২৫ ঈশ্বরীপুর ২৬ সুজাপুর ২৭ জগন্নাথপুর ২৮ বেলসিনগর ২৯ পুনিয়া ৩০ নেওদা ৩১ চাঁদপালা অনন্তরথপুর, ৩২ বার হায়দন্তপুর ৩৩ শ্রীরামপুর ৩৪ নিত্যানন্দপুর ৩৫ পশ্চিম দুর্গাপুর ৩৬ দক্ষিণ সরগাড়িয়া ৩৭ সাহাপুর কমলপুর ৩৮ শ্বেতকল্লা ৩৯ তারাগাদি ৪০ বুদ্ধগ্রাম ৪১ বাঁকি ৪২ দোনা ৪৩ রসুলপুর ৪৪ মহিরামপুর, ৪৫ নারায়ণ বেড়ে ৪৬ মল্লিকপুর ৪৭ কালাগাছিয়া ৪৮ পুকুরদিগরা ৪৯ পশ্চিম গোপালপুর ৫০ চাকা ৫১ অস্ত ৫২ জামিরা ৫৩ উত্তর সরগাড়িয়া ৫৪ ডলুইপুর ৫৫ পাইকপাড়া ৫৬ কৃষ্ণপুর মাধবপুর ৫৭ ত্রিপুরাপুর ৫৮ সুজাগলপুর ৫৯ নারায়নতলা ৬০ বাদে গহরা ৬১ রুখিয়া ৬২ গোয়াবেড়িয়া ৬৩ রামলখা ৬৪ কলসা ৬৫ শতল ৬৬ নীলম্বরপুর ৬৭ পোঙকামারা ৬৮ নওপুখুরিয়া ৬৯ কতলফুলি ৭০ দোলটিকারি ৭১ লস্করপুর ৭২ জঙ্গলিয়া ৭৩ বলদারি ৭৪ হরিণ-ডাঙা ৭৫ গাড়ুলিয়া ৭৬ বাসুদেবপুর ৭৭ মজলিসপুর ৭৮ জগলা বল্লভপুর ৭৯ হোগলা ৮০ বৃহস্পতিপুর ৮১ তালদা ৮২ মুলপুঞ্জা ৮৩ নারায়নী ৮৪ কেয়াতখণ্ড ৮৫ দোস্তপুর ৮৬ আলাদাদপুর ৮৭ কোদালিয়া ৮৮ পূর্ব দৌলতপুর ৮৯ বয়রিয়া ৯০ আলমবিবি রামনগর ৯১ দিগরা ৯২ ভগবানপুর ৯৩ বৈচবেড়ে ৯৪ কৈখালি ৯৫ শ্রীধরাট, ৯৬ গোবিন্দপুর, ৯৭ যাদববাটি ৯৮ হাঙর ঘাটা হরিশপুর ৯৯ দেবীপুর ১০০ আচণ্ডা ১০১ ঝুমনিয়া ১০২ লখনা গঙ্গাধরপুর ১০৩ মলয় হরিশপুর ১০৪ অমরপুর ১০৫ কাশীরামপুর ১০৬ ঘনশ্যামপুর ১০৭ গড়খালি ১০৮ রামেশ্বর বাটি ১০৯ কাটাখালি ১১০ বড়বেড়ে ১১১ পূর্ব দুর্গাপুর ১১২ গাজিপুর ১১৩ তাজপুর

১১৪ শাসন ১১৫ পিখিরা ১১৬ পূর্ব গোপালপুর ১১৭ রনতন ১১৮ চালুয়ারি ১১৯ নিয়োগীরাট, ১২০ দুর্বারাট, ১২১ কোটালডাঙা, ১২২ বোনাপুর, ১২৩ ফতেপুর ১২৪ বনগাঁনগর, ১২৫ জাফরপুর, ১২৬ হাসিমনগর, ১২৭ বাণেশ্বরপুর, ১২৮ গোটরা ১২৯ আউসবেড়িয়া, ১৩০ শিবপুর, ১৩১ রামরামপুর, ১৩২ ময়না ১৩৩ কালারিয়া। মোট = ১৩৩। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল—১৩৫'৭ বর্গ কিঃ মিঃ।

অমরপুর—১৯৭১ আদমশুমারি সময় কোন লোকবসতি ছিল না।

ডায়মন্ডহারবার থানা

১ বিশরা ২ উত্তর শিমুলবেড়িয়া ৩ অকাল মেঘ ও নৈনান ৫ গোপালপুর ৬ পরশুরামপুর ৭ বাসুদেবপুর ৮ পানা ৯ সেহলামপুর ১০ শঙ্কর পারুলিয়া ১১ বরদা ১২ ভাদুরা ১৩ গোন্ডিয়া রঘুনাথপুর ১৪ বাউকোল ১৫ কালিয়া ১৬ খন্ডালিয়া ১৭ সুন্দারিকা ১৮ রামনগর ১৯ বীরপানা ২০ হলদিঘি ২১ কাড়বেড়িয়া ২২ খানজাপুর ২৩ নীলা ২৪ শ্রীফলবেড়িয়া ২৫ নূরপুর ২৬ দুর্গাপুর ২৭ সুখদেবপুর ২৮ পশ্চিম ভবানীপুর ২৯ মুকুন্দপুর ৩০ দক্ষিণ শিমুলবেড়িয়া ৩১ চক লোকনাথ ৩২ কনকজোল পূর্ব ৩৩ কনকজোল পশ্চিম ৩৪ গন্ডবেড়িয়া ৩৫ আশাপুর ৩৬ আকরাপুঁজি ৩৭ পিপুলাট ৩৮ গোড়াগাছিয়া ৩৯ গগন কালিয়া ৪০ অসুরালি ৪১ চুকরিঝড় ৪২ যাদুদারি ৪৩ খোরদনহলা ৪৪ দক্ষিণ শিমলা ৪৫ মানখন্ড ৪৬ গোয়ানাড়া ৪৭ পশ্চিম গোবিন্দপুর ৪৮ রায়চক ৪৯ সিঙ্গলগঞ্জ আবাদ ৫০ কালীচরণপুর ৫১ কৃষ্ণরামপুর ৫২ খোলাখালি ৫৩ কুলটিকরি ৫৪ আঁধারিয়া ৫৫ মাথুর ৫৬ খুশবেড়িয়া ৫৭ পটদহ ৫৮ জিওনাচা ৫৯ শঙ্খুয়া ৬০ চন্দবামুনতলা ৬১ ডাকজোয়াড়ি ৬২ আওয়াশবেড়িয়া ৬৩ সেওড়াহাটি ৬৪ বঙ্গলা ৬৫ খোরদা ৬৬ পিতমবারা ৬৭ হিঞ্চবেড়িয়া ৬৮ পঞ্চসতা ৬৯ আমিরা ৭০ তপহা ৭১ খামারকুর ৭২ ভূষণা ৭৩ কামারপোল ৭৪ রেখা ৭৫ গঙ্গাধরপুর ৭৬ জঙ্গলপাড়া ৭৭ খোরদা সদাশিবপুর ৭৮ হরিনারায়ণপুর ৭৯ চক দেউলপোতা ৮০ কালীশংকর পুর ৮১ পারুলিয়া ৮২ দারিকৃষ্ণনগর ৮৩ হরিদেবপুর ৮৪ সন্তোষপুর ৮৫ মোহনপুর ৮৬ চাঁদনগর ৮৭ জয়দেবপুর ৮৮ মাখালহাট ৮৯ উত্তর হাজিপুর ৯০ দক্ষিণ হাজিপুর ৯১ রায়নগর ৯২ কালীনগর ৯৩ ভগবানপুর ৯৪ বাহাদুরপুর ৯৫ পূর্ব গোবিন্দপুর ৯৬ মংরাজপুর ৯৭ হরিণডাঙা ৯৮ রামগোবিন্দপুর ৯৯ মোল্লাপুকুর ১০০ অঙ্গেশ্বর ১০১ পাতরা ১০২ মির্জাপুর ১০৩ মুরিগাছি ১০৪ পূর্ব ভবানীপুর ১০৫ পশ্চিম দুর্গাপুর ১০৬ বাগদা ১০৭ কলাগাছি ১০৮ সরিশা

১০৯ নারায়ণতলা ১১০ নবাসন ১১১ চেওরা ১১২ ঝিঙ্গা ১১৩ সুকদেবপুর ১১৪ নহান্না ১১৫ নাসা ১১৬ কালিকা মোরিয়া ১১৭ কাটাপুকুরিয়া ১১৮ কানাইগাছি ১১৯ মাতরা ১২০ ভোগপুজি ১২১ রঘুনাথনগর ১২২ কাঁকুড়া ১২৩ রামচন্দ্রপুর ১২৪ ঘাটু ১২৫ বেন্দাল ১২৬ নাওগাঁ ১২৭ গাটুরা ১২৮ সংগ্রামপুর ১২৯ মশাট ১৩০ কুলেশ্বর ১৩১ উত্তর দিয়ারাক ১৩২ দক্ষিণ দিয়ারাক ১৩৩ পাঁচগাঁ সিঙাবেড় ১৩৪ লক্ষীপুর ১৩৫ যন্তাবাল ১৩৬ বাজারবেড়িয়া কৃষ্ণরামপুর ১৩৭ অম্বলহারা ১৩৮ বাসুলডাঙ্গা ১৩৯ চাঁদা ১৪০ কবিরা ১৪১ মারুইবেড়িয়া ১৪২ দুর্গানগর ১৪৩ ধনবেড়িয়া ১৪৪ রামচন্দ্রপুর ১৪৫ পিরিজপুর ১৪৬ মাধবপুর ১৪৭ সুলতানপুর ১৪৮ আট কৃষ্ণরামপুর ১৪৯ বনবাহাদুরপুর ১৫০ নারায়নপুর ১৫১ গৌরীপুর ১৫২ হাঁসদহরা ১৫৩ বারাদ্রোন ১৫৪ বোলাসিদাদিহি ১৫৫ বড়িয়া ১৫৬ সাত-মিনাসা, ১৫৭ তালভাঙা ১৫৮ দাগিরা ১৫৯ তেতুয়াগাড়ি ১৬০ মৈনান ১৬১ কমলপুর ১৬২ নুদিয়া ১৬৩ নওগাঁ সীতাগাছি ১৬৪ পূর্ব দুর্গাপুর ১৬৫ রাধাবল্লভপুর ১৬৬ চৌসা ১৬৭ সুলতানবাগা ১৬৮ নেতরা ১৬৯ মালঞ্চ ১৭০ উত্তর শেহারদহ ১৭১ দক্ষিণ শেহারদহ ১৭২ জোয়ারু ১৭৩ হাজরাবন্দ ১৭৪ বাসরালি ১৭৫ কানপুর।

মোট—১৭৫। আয়তন—১৯৬·৩ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামাঞ্চল—১৮৯·৮ বর্গ কিঃ মিঃ। শহরাঞ্চল—৬·৫ বর্গ কিঃ মিঃ।

মাখালহাট উত্তরহাজিপুর দক্ষিণ হাজিপুর রায়নগর কালিনগর বাহাদুরপুর পিরিজপুর মাধবপুর – ডায়মণ্ডহারবার অপোর এলাকান্তর্গত।

তেতুয়াগাড়ি—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

ডায়মণ্ডহারবার অপোর এলাকা—ব্লক-২২। আয়তন—৬ ৪৭ বর্গ কিঃ মিঃ।

কুলপি থানা ঃ

১ হারা ২ মণিকা ৩ বড়বেড়িয়া ৪ বিষ্ণুরামপুর ৫ উত্তর মুকুন্দপুর ৬ হরিনারায়ণপুর ৭ চকরূপ লস্কর ৮ দারি রত্নেশ্বরপুর ৯ রায়তলা ১০ ইউচিনবেড়িয়া ১১ সশামারি ১২ ধনুমণ্ডল ১৩ কালীতলা ১৪ মনোহরপুর ১৫ বলরামপুর ১৬ রাধানগর ১৭ কেশবনগর ১৮ উত্তর রামকিশোরপুর ১৯ উত্তর রামকৃষ্ণপুর ২০ রায়রামপুর ২১ দোরিয়া ২২ জববরিয়া ২৩ বেরানদারি বাগারিয়া ২৪ উত্তর রাজারামপুর ২৫ উত্তর ভগবানপুর ২৬ খানপুর ২৭ করিমনগর ২৮ পশ্চিমগোপালনগর ২৯ ঢালচাপাকুরি ৩০ চক ধনুমণ্ডল ৩১ উলাকিমারি

৩২ চকমনোহারি ৩৩ চক পরমেশ্বরী ৩৪ দেবীপুর ৩৫ চক হিরু রায় ৩৬ চক কালীচরণ লস্কর ৩৭ চক তারাবৈদ্য ৩৮ ছোট মনোহরপুর ৩৯ চক রায়পুর ৪০ উত্তর রামদেবপুর ৪১ চক খেতু হালদার ৪২ ঈশ্বরীপুর ৪৩ পশ্চিমরায়পুর ৪৪ আশাপুর ৪৫ আনোয়ারপুর ৪৬ পশ্চিম রঘুনাথপুর ৪৭ হাটবেড়িয়া ৪৮ উত্তর চণ্ডীপুর ৪৯ মসিদ ৫০ আট বাজার ৫১ বনগাঁ ত্রিপুরাপুর ৫২ রামানন্দপুর ৫৩ সদাশিবপুর ৫৪ বাজার ৫৫ উত্তর শুকদেবপুর ৫৬ উত্তর নারায়ণপুর ৫৭ আট মনোহরপুর ৫৮ রামনগর ৫৯ বাহাদির চক ৬০ চক বৈদ্য ৬১ বুলার চক ৬২ পশ্চিম চাঁদপুর ৬৩ নবীনাথপুর ৬৪ উত্তর গাজিপুর ৬৫ উত্তর রামেশ্বরপুর ৬৬ উত্তর দামোদরপুর ৬৭ উদয়রামপুর ৬৮ হাতিরামপুর ৬৯ সীতারামপুর ৭০ মোল্লারচক ৭১ রামশরণপুর ৭২ বিজয়রামপুর ৭৩ আমপোল ৭৪ দক্ষিণ গাজিপুর ৭৫ কৈখালি ৭৬ গাজিপুর দয়ারামপুর ৭৭ মহাদেবপুর ৭৮ দক্ষিণ নারায়ণপুর ৭৯ দক্ষিণবল্লভপুর ৮০ চকবনমালীপুর ৮১ জামাল ৮২ রত্নেশ্বরপুর ৮৩ দৌল্লতপুর ৮৪ বড় রামজীবনপুর ৮৫ চুণফুলি ৮৬ চক গোলামী ৮৭ পাথরবার ৮৮ পাথর বেড়িয়া ৮৯ দক্ষিণ আকরাবেড়িয়া ৯০ চণ্ডীপুর ৯১ দক্ষিণ শ্যামপুর ৯২ বাঁশবেড়িয়া ৯৩ দৌলতাবাদ ৯৪ কিসমত কৃপারামপুর ৯৫ মিঠাকুণ্ডু ৯৬ জগদীশপুর ৯৭ দক্ষিণ মুকুন্দপুর ৯৮ সন্তোষপুর ৯৯ কামার চক ১০০ মিরজাপুর ১০১ চক রামনাথ ১০২ গৌরীপুর ১০৩ রমজাননগর ১০৪ কুলপি ১০৫ বাসুদেবপুর ১০৬ দুর্গানগর ১০৭ দয়ারামপুর ১০৮ দক্ষিণ ভগবানপুর ১০৯ যাদবনগর ১১০ গরাণকাঠি ১১১ দক্ষিণ রাজারামপুর ১১২ দক্ষিণ রামকৃষ্ণপুর ১১৩ পশ্চিম শ্রীনগর ১১৪ পটপুকুরিয়া ১১৫ দক্ষিণ রায়পুর ১১৬ কালীবেড়ে ১১৭ বনাইনদী ১১৮ দক্ষিণ রামেশ্বরপুর ১১৯ শ্রীকৃষ্ণনগর ১২০ এনায়েতপুর ১২১ নকেনোন ১২২ চক কৃষ্ণবল্লভপুর ১২৩ মেয়ানাপুর ১২৪ মৌলাগ্রাম ১২৫ দক্ষিণ শুকদেবপুর ১২৬ চক দুলালপুর ১২৭ গোপীনাথপুর ১২৮ আদিমগর ১২৯ দক্ষিণ দামোদরপুর ১৩০ কৃষ্ণচন্দ্রপুর ১৩১ শ্যামনগর ১৩২ ট্যাংরা চর ১৩৩ রাঙাফলা ১৩৪ শ্রীরামনগর ১৩৫ অরুণবেড়িয়া ১৩৬ রঙ্গীলাবাদ ১৩৭ কুসুমপুকুরিয়া ১৩৮ পার্বতীপুর ১৩৯ চকলক্ষীপুর ১৪০ অরুননগর ১৪১ বেলপুকুরিয়া ১৪২ লক্ষীপাশা ১৪৩ দক্ষিণ রামকিশোরপুর ১৪৪ ডাহাচোরা ১৪৫ কানাসেনারি ১৪৬ মোল্লাডাঙা ১৪৭ আন্দুলদহ গোপালপুর ১৪৮ আটজুনগিরি ১৪৯ গোবিন্দপুর ১৫০ পদ্মপুকুরিয়া ১৫১ জুঙ্গুরি ১৫২ বামনপাড়া ১৫৩ কাটাবুনিয়া ১৫৪ কাপমারা ১৫৫ করণজাল ১৫৬ দক্ষিণ সুলতানপুর

১৫৭ আলিপাড়া ১৫৮ হাসাকি ১৫৯ হরিশপুর ১৬০ দক্ষিণ রামদেবপুর ১৬১ দক্ষিণ জগদীশপুর ১৬২ ঢোলা ১৬৩ বেলুনি ১৬৪ ফটিকবেড়িয়া ১৬৫ কৃষ্ণবল্লভপুর ১৬৬ কাটুলিয়া কৃষ্ণরামপুর ১৬৭ নন্দ কিশোরপুর ১৬৮ কিশোরপুর ১৬৯ কৃষ্ণরামপুর বাজে ১৭০ কালীচরণপুর ১৭১ হরিণখোলা ১৭২ ভৈরবীতলা ১৭৩ লক্ষীপুর ১৭৪ ভৈরবনগর ১৭৫ চিত্রানগর ১৭৬ নকালি ১৭৭ শিমুলবেড়িয়া ১৭৮ গোবিন্দ দেবপুর ১৭৯ কাউতলা ১৮০ লক্ষীনারায়ণপুর ১৮১ দারি কাউতলা ১৮২ নূতন ট্যাংরাচর।

মোট—১৮২। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল—২৫০·৭ বর্গ কিঃ কিঃ।

নতুনট্যাংরাচর গোবিন্দদেবপুর কাটুলিয়া কৃষ্ণরামপুর মোল্লাডাঙা দক্ষিণ রামকিশোরপুর ডাহাচোরা, মোল্লাডাঙা বিজয়রামপুর চক বনমালীপুর জামাল দক্ষিণ মুকুন্দপুর চকরামনাথ বনাইনদী ঢালচাপাশুরী চকরায়পুর উত্তর রামদেবপুর —১৯৭১ আদমশুমারী সময় লোকবসতি ছিল না।

মন্দিরবাজার থানা ঃ

১ টেকপাঁজা ২ সদাশিবপুর ৩ নিশাপুর ৪ মল্লিক প্রতাপ ৫ খোরদা মহাদেবপুর ৬ এনায়েতপুর ৭ কৃষ্ণদেবপুর ৮ খোরদা রত্নেশ্বরপুর ৯ রঘুদেবপুর বেলুনি ১০ হরিদেবপুর ১১ সরিফনগর ১২ রঘুনাথপুর ১৩ চাঁদপুর ১৪ দক্ষিণ আমড়াতলা ১৫ পুকুরিয়া ১৬ বঙ্গবেড়িয়া ১৭ গোকুলনগর ১৮ মিরজানগর ১৯ রামনারায়ণপুর ২০ চৈতন্যপুর ২১ নূরমহম্মদপুর ২২ বাদে মুলদিয়া ২৩ বাদে গোকুলনগর ২৪ গোবিন্দবাটি ২৫ কৃষ্ণরামপুর ২৬ আলে মহেশপুর ২৭ ভবানীপুর ২৮ বাদে মহেশপুর ২৯ সারাদানা ৩০ দৌলতাবাদ ৩১ দক্ষিণ রাধানগর ৩২ আদিত্যপুর ৩৩ বংশীধরপুর ৩৪ পূর্ব বিষ্ণুপুর ৩৫ উত্তর শ্যামপুর ৩৬ বাজে শুকদেবপুর ৩৭ চৌঘরি ৩৮ মল্লিকপুর ৩৯ গমুকি ৪০ চম্পানগর ৪১ সুতাবেচা ৪২ পঞ্চানন ৪৩ ধনুরহাট ৪৪ খোরদা সদাশিবপুর ৪৫ রামচন্দ্রপুর ৪৬ সিদ্ধেশ্বরপুর ৪৭ চকসুবুদ্ধি ৪৮ কলিঙ্গ ৪৯ ঘনশ্যামপুর ৫০ শিবপুর ৫১ নিলম্বরপুর ৫২ চাউলগোলা ৫৩ তিতিবেড়ে ৫৪ আচনা ৫৫ বিদ্যাধরপুর ৫৬ মণ্ডপতলা ৫৭ রামনাথপুর ৫৮ উত্তর জগদীশপুর ৫৯ ধনঞ্জয়পুর ৬০ মোরালতলা মুকুন্দপুর ৬১ মতিলাল ৬২ কালিকাপুর ৬৩ বাদে বল্লভপুর ৬৪ উত্তর বল্লভপুর ৬৫ বাঁশবিড়া জায়রপুর ৬৬ মৌখালি ৬৭ মহেশপুর ৬৮ বাদে দুর্গাপুর ৬৯ পূর্বগোপালনগর ৭০ দুর্লভপুর ৭১ দাদপুর ৭২ পূর্ব

শংকরপুর ৭৩ পূর্ব রঘুনাথপুর ৭৪ কৃষ্ণপুর ৭৫ দুলাপুর ৭৬ বৃন্দাবনপুর ৭৭ কাশীপুর ৭৮ বীরেশ্বরপুর ৭৯ খেলারামপুর ৮০ মাধবপুর ৮১ পূর্বচাঁদপুর ৮২ কৃষ্ণরামপুর ৮৩ উত্তর আকড়াবেড়িয়া ৮৪ মুরারীপুর ৮৫ কিসমত মাধবনগর ৮৬ চক ঘাটেশ্বর ৮৭ ধোপাহাট ৮৮ সিঙ্গেশ্বর ৮৯ ঘাটেশ্বর ৯০ রামলোচনপুর ৯১ গোপালপুর ৯২ বনমালীপুর ৯৩ ইনাতপুর ৯৪ দুর্গাপুর ৯৫ বৈদ্যপুর ৯৬ মীরপুর ৯৭ রামনারায়ণপুর ৯৮ লক্ষীকান্তপুর ৯৯ রামজীবনপুর ১০০ পূর্ব শ্রীনগর ১০১ পূর্ব রামেশ্বরপুর ১০২ উত্তর সুলতানপুর ১০৩ রায়পুর দয়ারামপুর ১০৪ পূর্ব রায়পুর ১০৫ কৃষ্ণনগর ১০৬ দক্ষিণ রঘুনাথপুর ১০৭ মধুসূদনপুর ১০৮ তাজপুর ১০৯ গাববেড়িয়া ১১০ ছোট রামকৃষ্ণপুর ১১১ পশ্চিমশংকরপুর ১১২ ভাগবতীপুর ১১৩ পূর্ব দামোদরপুর।

মোট—১১৩। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামঞ্চল—১১৭-৩ বর্গ কিঃ মিঃ।

দৌলতাবাদ, ঘনশ্যামপুর বাদে দুর্গাপুর পূর্বশংকরপুর পশ্চিম শংকরপুর—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

মথুরাপুর থানা ঃ

১ গুনাজিরপুর ২ মুরারীপুর ৩ বাসুদেবপুর ৪ রামবাটি ৫ উত্তর শিবপুর ৬ সীতাগাছি ৭ উত্তর জনার্দনপুর ৮ রাজজীবন নগর ৯ উত্তর গোবিন্দপুর ১০ হরেকৃষ্ণপুর ১১ মুকুন্দপুর ১২ কৈপুকুরিয়া ১৩ শেখপুকুরিয়া ১৪ দাউদপুর ১৫ শেখপুর ১৬ তাজপুর ১৭ নোয়াবাদ ১৮ রাজপুর ১৯ ভগবতীপুর ২০ উত্তর গঙ্গাধরপুর ২১ উত্তর রামনগর ২২ মিরজাপুর ২৩ তেঁতুলবেড়িয়া ২৪ রাজাপুর ২৫ উত্তর দুর্গাপুর ২৬ সিদ্ধেশ্বর ২৭ বাজার ২৮ দেবীপুর ২৯ সাতঘরা ৩০ খোদাদাদপুর ৩১ উত্তর শিবগঞ্জ ৩২ পশ্চিমরাণাঘাটা ৩৩ পূর্ব রাণাঘাটা ৩৪ তালুক রাণাঘাটা ৩৫ নালুয়া ৩৬ কৃষ্ণচন্দ্রপুর ৩৭ লালপুর ৩৮ সন্তোষনগর ৩৯ সুবুদ্ধিপুর ৪০ রামপুর ৪১ ছত্রভোগ ৪২ খোনর্জাকাদির ৪৩ বাদে বারাসি ৪৪ মথুরাপুর ৪৫ উত্তর রায়পুর ৪৬ বারাসি ৪৭ শোভানগর ৪৮ সাদিয়াল ৪৯ খাড়ি ৫০ উত্তর কাশীনগর ৫১ মাদপুর ৫২ সরবেরিয়া ৫৩ উত্তর জয়কৃষ্ণপুর ৫৪ নারায়ণীপুর ৫৫ চক সরবেরিয়া ৫৬ বাটিশ্বর ৫৭ রাঘবপুর ৫৮ রামকৃষ্ণপুর ৫৯ চকমধুসূদনপুর ৬০ গুপীনাথপুর ৬১ রামজীবনপুর ৬২ উত্তর মধুসূদনপুর ৬৩ দৌলতাবাদ ৬৪ রাধাকান্তপুর ৬৫ দক্ষিণ রামনগর ৬৬ পানাপুকুরিয়া ৬৭ যাদবপুর ৬৮ রাধানগর ৬৯ শ্রীকৃষ্ণনগর ৭০ উত্তর লক্ষীনারায়ণপুর

৭১ ঘোড়াডাল ৭২ কৃষ্ণরামপুর ৭৩ হিমচি ৭৪ হরিণডাঙা ৭৫ নন্দনপুর ৭৬ রাচুলপুল ৭৭ রাজারামপুর ৭৮ চক ভগবানপুর ৭৯ আবাদ ভগবানপুর ৮০ ব্রহ্মপুর ৮১ গাদবেড়িয়া ৮২ ইমামদিপুর ৮৩ রামচন্দ্রপুর ৮৪ ভীমনগর ৮৫ ফৌজপুর ৮৬ দক্ষিণজনার্দনপুর ৮৭ বিরামপুর ৮৮ শংকরপুর ৮৯ আঁধামাণিক ৯০ দক্ষিণ হরিণডাঙা ৯১ রাধুদেবপুর ৯২ উত্তর সারসবেড়িয়া ৯৩ কৃষ্ণনগর ৯৪ ভগবানপুর ৯৫ সারসবেড়িয়া ৯৬ কিসমত সারসবেড়িয়া ৯৭ কান্দরপাপুর ৯৮ আমীরপুর ৯৯ পয়লা ভগবানপুর ১০০ বাঁশতলা বারাঘরি ১০১ গোগেন্দ্রনগর ১০২ ঘাট বকুলতলা ১০৩ ইস্তারনপুর ১০৪ কাউতলা ১০৫ গিলার ছাট ১০৬ রাধাকান্তপুর আবাদ ১০৭ বারিববনগাঁ আবাদ ১০৮ রায়দিঘি আবাদ ১০৯ দিঘিরপাড় বকুলতলা ১১০ চাপলার খোপ ১১১ কুমড়াপাড়া ১১২ কঙ্কনদিঘি ১১৩ পশ্চিমজটার দেউল ১১৪ পূর্ব জটার দেউল ১১৫ বরদানাগার ১১৬ পূর্ব শ্রীধরপুর ১১৭ নগেন্দ্রপুর ১১৮ দমকাল ১১৯ জগন্নাথচক ১২০ মধুসূদনচক ১২১ নরেন্দ্রপুর ১২২ নারানপুর ১২৩ দক্ষিণ জয়কৃষ্ণপুর ১২৪ নন্দকুমারপুর ১২৫ কৈলাসপুর ১২৬ মহবতনগর।

মোট—১২৬। আয়তন—৬১১·৮ বর্গ কিঃ মিঃ।

কৃষ্ণনগর ব্রহ্মপুর রাচুলপুল হরেকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণপুর—১৯৭১ আদমশুমারী সময় লোকবসতি ছিলনা।

পাথরপ্রতিমা থানা ঃ

১ মলয় ২ রামদেবপর ৩ নীলেরাত ৪ দক্ষিণ মধুসূদনপুর ৫ দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর ৬ ভজনা ৭ মেহেরপুর ৮ শ্রীনারায়ণপুর ৯ তারানগর ১০ পূর্ণচন্দ্রপুর ১১ দক্ষিণ দুর্গাপুর ১২ আবাদগঙ্গাধরপুর ১৩ দক্ষিণ রায়পুর ১৪ পিপড়াখালি ১৫ কাওড়াখালি ১৬ ইন্দ্রনারায়ণপুর ১৭ দিগম্বরপুর ১৮ গুরুদাসপুর ১৯ পশ্চিম শ্রীধরপুর ২০ উত্তর মহেন্দ্রপুর ২১ পার্বতীপুর ২২ রামনগর আবাদ ২৩ রাজ রাজেশ্বরপুর ২৪ বিশ্বনাথপুর ২৫ গয়াধাম ২৬ ইন্দ্রপ্রস্থ ২৭ যোগীন্দ্রপুর ২৮ দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর ২৯ রামগঙ্গা ৩০ দক্ষিণ গোবিন্দপুর ৩১ দেবীচক ৩২ সাগর মাধবপুর ৩৩ দক্ষিণ শিবপুর ৩৪ কামদেবনগর ৩৫ চিন্তামণিপুর ৩৬ রাধাকৃষ্ণনগর ৩৭ কৃষ্ণপুর ৩৮ দুর্বাচাটি ৩৯ জেমসন আইল্যাণ্ড ৪০ পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর ৪১ হরেকৃষ্ণপুর ৪২ মহেন্দ্রনগর ৪৩ গোপালনগর দক্ষিণ ৪৪ গোপালনগর উত্তর ৪৫ দুর্গাগোবিন্দপুর ৪৬ মাধবনগর ৪৭ পশ্চিম দ্বারকাপুর ৪৮ বরদাপুর

৪৯ ভাগবতপুর ৫০ প্লট 'ই' ৬ষ্ঠ ভাগ (খাস) ৫১ কিশোরীনগর ৫২ দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর ৫৩ দক্ষিণ শিবগঞ্জ ৫৪ ছোট বনশ্যামনগর ৫৫ শিবনগর ৫৬ বনশ্যামনগর ৫৭ লক্ষ্মীপুর ৫৮ বিষ্ণুপুর ৫৯ কামদেবপুর ৬০ অচিন্ত্যনগর ৬১ লক্ষ্মীজনার্দনপুর ৬২ পূর্ব চিন্তামণিপুর ৬৩ কুমারপুর ৬৪ মহেশপুর ৬৫ কেদারপুর ৬৬ পূর্ব দ্বারকাপুর ৬৭ কুয়েমুরি ৬৮ পূর্ব সুরেন্দ্রনগর ৬৯ হেরম্ব গোপালপুর ৭০ দক্ষিণ কালীনগর ৭১ পূর্ব শ্রীপতিনগর ৭২ পশ্চিম শ্রীপতিনগর ৭৩ উপেন্দ্রনগর ৭৪ রাখালপুর ৭৫ শ্রীধরনগর ৭৬ গঙ্গাপুর ৭৭ কৃষ্ণদাসপুর ৭৮ রাক্ষসখালি ৭৯ ক্ষেত্রমোহনপুর ৮০ ব্রজবল্লভপুর ৮১ গোবিন্দপুর আবাদ ৮২ দাসপুর ৮৩ উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ ৮৪ দক্ষিণ সুরেন্দ্রগঞ্জ ৮৫ ইন্দ্রপুর ৮৬ বুড়াবুড়ির টাট ৮৭ সীতারামপুর ৮৮ গোবর্ধনপুর ৮৯ প্লট 'জি' ৬ষ্ঠ অংশ ৯০ বার্জ আইল্যাণ্ড ৯১ সত্যদাসপুর ৯২ প্লট 'এল' দক্ষিণ অংশ। মোট—৯২।

আয়তন—৪৮৪.৬ বর্গ কিঃ মিঃ।

বার্জ আইল্যাণ্ড, প্লট 'জি' ৬ষ্ঠ অংশ, প্লট 'এল' দক্ষিণ অংশ, জেমসন আইল্যাণ্ড প্লট 'ই' ৬ষ্ঠ অংশ (খাস)—১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসতি ছিল না।

কাকদ্বীপ থানা ঃ

১ উত্তর চন্দ্রনগর ২ সূর্যনগর ৩ রামতনু নগর ৪ মধুসূদনপুর ৫ লক্ষ্মীপুর ৬ শিবকালীনগর ৭ সীতারামপুর ৮ শ্রীনগর ৯ কাশীনগর ১০ কালীনগর ১১ গনেশপুর ১২ রামরতনপুর ১৩ নেবুতলা ১৪ চন্ডীপুর ১৫ ভক্তিপুর আবাদ ১৬ থানগরা ১৭ মন্মথপুর ১৮ গোপালনগর ১৯ কোয়াবেড়িয়া ২০ গোবিন্দপুর ২১ শ্রীকৃষ্ণনগর ২২ শানকি বেড়িয়া ২৩ শিবনগর ২৪ রামচন্দ্রপুর ২৫ রামচন্দ্রনগর ২৬ উত্তর দুর্গাপুর ২৭ হেসামাবাদ ২৮ মৃণালনগর ২৯ রামগোপালপুর ৩০ উত্তর কাসিয়াবাদ ৩১ কাসিয়াবাদ ৩২ দক্ষিণ কাসিয়াবাদ ৩৩ হরেন্দ্রনগর ৩৪ গঙ্গাধরপুর ৩৫ বামননগর ৩৬ গোবিন্দরামপুর ৩৭ ভুবননগর ৩৮ অক্ষয়নগর ৩৯ কাকদ্বীপ ৪০ বুধাখালি ৪১ বিশালাক্ষীপুর ৪২ ফটিকপুর ৪৩ রাজনগর শ্রীনাথগ্রাম ৪৪ নাদাভাঙা ৪৫ গনেশনগর ৪৬ দুর্গানগর ৪৭ নারায়ণপুর ৪৮ ঈশ্বরীপুর ৪৯ নোয়াখানা রেঞ্জ।

মোট = ৪৯

আয়তন = ৪৭৬.৮ বর্গ কি. মি.

সাগর থানা

১ খাসিমারা ২ ঘোড়ামারা ৩ লোহাচরা ৪ কাশতলা ৫ সাপখালি ৬ কচুবেড়িয়া ৭ মুড়িগঙ্গা ৮ শিকারপুর ৯ রামকৃষ্ণপুর ১০ কোম্পানির চর ১১ ধসপাড়া ১২ বামনখালি ১৩ মন্দিরতলা ১৪ ফুলডুবি ১৫ মহেন্দ্রগঞ্জ ১৬ নগেন্দ্রগঞ্জ ১৭ গোবিন্দপুর ১৮ দেবী মথুরাপুর ১৯ কয়লাপাড়া ২০ হারাধনপুর ২১ মৃত্যুঞ্জয়নগর ২২ সুমতীনগর ২৩ বঙ্কিমনগর ২৪ মনসাদ্বীপ ২৫ কমলপুর ২৬ রুদ্রনগর ২৭ খান সাহেবের আবাদ ২৮ খান রামকরের চর ২৯ কৃষ্ণনগর ৩০ নরহরিপুর ৩১ হরিণবাড়ি ৩২ রাধাকৃষ্ণপুর ৩৩ চণ্ডীপুর ৩৪ বিষ্ণুপুর ৩৫ মহিষমোরি ৩৬ বেহুয়াখালি ৩৭ সাগর ৩৮ গঙ্গাসাগর ৩৯ নতেন্দ্রপুর ৪০ নারায়ণী আবাদ ৪১ পুরুষোত্তমপুর ৪২ চেমাগারি ৪৩ শিবপুর ৪৪ বিশালাক্ষীপুর ৪৫ ধাবালাট ৪৬ কীর্তনখালি।

মোট = ৪৬।

আয়তন = ৫৮০.৯ বর্গ কি. মি.।

বিশালাক্ষীপুর—১৯৭১ সালে আদমশুমারি সময়ে লোকবসতি ছিল না।

নামখানা থানা

১ মদনগঞ্জ ২ নামখানা ৩ নারায়ণগঞ্জ ৪ দেবনগর ৫ শিবনগর আবাদ ৬ দ্বারিকনগর ৭ উত্তর চন্দনপিড়ি ৮ দক্ষিণ চন্দনপিড়ি ৯ শিবরামপুর ১০ রাজনগর ১১ দক্ষিণচন্দ্রনগর ১২ রাধানগর ১৩ দক্ষিণ দুর্গাপুর ১৪ মৌসানি ১৫ বালিয়ারা ১৬ পাটিবনিয়া ১৭ শিবপুর ১৮ মহারাজগঞ্জ ১৯ হরিপুর ২০ দেবনিবাস ২১ বিজয়বাটি ২২ অমরাবাটি ২৩ লক্ষীপুর আবিদ ২৪ বাগডাঙা ২৫ কুসুমতলা ২৬ লোথিয়ামদ্বীপ ২৭ হেনরির দ্বীপ ২৮ ফ্রেডারিক দ্বীপ ২৯ সুসনি দ্বীপ।

মোট = ২৯।

আয়তন = ১৫৯.৮।

লোথিয়ান হেনরির দ্বীপ, ফ্রেডারিক দ্বীপ; সুসনি দ্বীপ—১৯৭১ সালে আদমসুমারী সময়ে লোকবসতি ছিল না।

গোসভা থানা

১ রাধানগর পশ্চিম ২ রাধানগর পূর্ব ৩ চিমটা ৪ আমতলি ৫ পুইনজালি ৬ কুমীরমারি ৭ কালিদাসপুর ৮ তারানগর ৯ বড়মোল্লাখাটলি ১০ রাধানগর দক্ষিণ ১১ রামনগর ১২ হরিশপুর ১৩ কামাখ্যাপুর ১৪ ভূপেন্দ্রপুর ১৫ শম্ভূনগর ১৬ মি পুর ১৭ ঝাউখালি

১৮ পালপুর ১৯ জেলেপাড়া ২০ গোপালকাতা ২১ কামারপাড়া ২২ পাঠানখালি ২৩ তেঁতুলতলা ২৪ বাটালি ২৫ বিপ্রদাসপুর ২৬ চণ্ডীপুর ২৭ মন্মথনগর ২৮ গোসবা ২৯ আরামপুর ৩০ বিরাজনগর ৩১ বিজয়নগর ৩২ বালি ৩৩ আমলামেথি ৩৪ মথুরাখান্দা ৩৫ সোনাগাঁ ৩৬ দুলকি ৩৭ পাখিরালয় ৩৮ রঙ্গবালিয়া ৩৯ বাগবাগান ৪০ উত্তর ডাঙা ৪১ কচুখালি ৪২ হেতালবাড়ি ৪৩ সাতজালিয়া ৪৪ দয়াপুর ৪৫ হ্যামিলটন আবাদ ৪৬ ছোটমোল্লাখালি ৪৭ সুধাংশুপুর লাখবাগান ৪৮ সাধুপুর ৪৯ লাহিড়িপুর।

মোট = ৪৯। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল ৩৭১·৪ বর্গ কিঃ মিঃ।

ফরেস্ট দপ্তর অধীন এলাকা ॥ বসিরহাট রেঞ্জ-১

১ সজনেখালি ২ রামপুর আবানোকোরা ৩ বাগনা বানা কোরান ৪ সুন্দরবন (এফ-১) ৫ সুন্দরবন (এফ১/৫) ৬ ডহর বাঙকাবন ৭ ধুনচি ফরেস্ট অফিস ৮ নামখানা ৯ পাথর প্রতিমা ফরেস্ট অফিস ১০ ক্যানিং ১১ কুলতলা ফরেস্ট অফিস ১২ শিকারপুর ফরেস্ট অফিস।

মোট ১২। সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল।

জনসংখ্যা ১৯৮১

		১	২	৩	৪	৫
					শিক্ষিত	জনসংখ্যা
আলিপুর মহকুমা			পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
	মোট	৩,২৩৭,১৯১	১,৭০২,৬৩৭	১,৫৩৪,৫৫৪	৯১৫,৩৬৯	৫০৫,৫৫৩
	†	১,৯০৮,৫৮৫	৯৮৬,৬৪৭	৯২১,৯৩৮	৪৩২,৫৯২	১৮১,২৯৫
	‡	১,৩২৮,৬০৬	৭১৫,৯৯০	৬১২,৬১৬	৪৮২,২৭৭	৩২৪,২৫৮
১ গার্ডেনরীচ	মোট	১৯১,৩৮৯	১০৬,৯১৮	৮৪,৪৭১	৬০,১৯৮	৩০,৬৫৯
	‡	১৯১,৩৮৯	১০৬,৯১৮	৮৪,৪৭১	৬০,১৯৮	৩০,৬৫৯
*গার্ডেনরীচ (পৌরসভা)						
	‡	১৯১,৩৮৯	১০৬,৯১৮	৮৪,৪৭১	৬০,১৯৮	৩০,৬৫৯

† গ্রামবাসী

‡ শহরবাসী

		১	২	৩	৪	৫
২ মেটিয়াবুরুজ						
মোট		৫১,১১৯	২৭,৭৩২	২৩,৩৮৭	১৩,১১৫	৭,১২৩
	‡	৫১,১১৯	২৭,৭৩২	২৩,৩৮৭	১৩,১১৫	৭,১২৩
*পাঁচুড় (অঃ পোঃ)	‡	৫১,১১৯	২৭,৭৩২	২৩,৩৮৭	১৩,১১৫	৭,১২৩
৩ মহেশতলা						
মোট		১৯৬,৩১৮	১০৫,৩৬৪	৯০,৯৫৪	৬৪,২৬৬	৩৭,৮৮৪
	†	৫৪,৯৭৬	২৮,৬৩৪	২৬,৩৪২	১৫,৮০৩	৮,৭৫০
	‡	১৪১,৬৪২	৭৬,৭৩০	৬৪,৬১২	৪৮,৪৬৩	২৯,১৩৪
*গোবিন্দপুর (অঃ পো) *রামপুর (বাঃ জঃ)	‡	৭,৬৫৯	৪,০৭০	৩,৫৮৯	২,৮৪৫	১,৮৫৬
*জগন্নাথগড় (অঃ পোঃ)	‡	১৬,০৯৮	৮,২২২	৭,৮৭৬	৩,৯৪৫	২,১৮১
*নোয়াপাড়া	‡	৬,২০৮	৩,২৪৯	২,৯৫৬	১,৬৯৮	৮৫০
*কৃষ্ণনগর (অঃ পোঃ)	‡	১২,২২৫	৬,৪৬০	৫,৭৬৫	৩,৭৭৫	২,৪৩৯
*জলখুরা (বাঃ জঃ) *মহেশতলা (অঃ পোঃ	‡	৫,০২৮	২,৩৮১	২,৩৮১	১,৭৪২	১,১৫৪
*চন্দননগর (অঃ পোঃ)	‡	৫,৮৩৪	৪,৬৮৮	৪,১৪৬	২,৭৬০	১,৫৯৩
*মেমানপুর (বাঃ জঃ) *বাটানগর (অঃ পোঃ *তেঁতুলখুলি (বাঃজঃ)	‡	২০,৩৫৫	১২,৯১৯	৭,৪৩৬	৯,৭৩৫	৪,৭৯৫
*নবগী (অঃ পোঃ)	‡	৫৩,৮৫৫	২৮,৭৫৫	২৫,১০০	১৯,৫৬৪	১৩,৪৪২
*চটাকালিকাপুর অঃ পোঃ)	‡	১১,০৮০	৫,৭২০	৫,৩৬০	২,৩৯৯	১,১২৩
৪ বজবজ মোট		২৯৪,১৬৬	১৫৯,৬৬১	১৩৪,৫০৫	৮৫,৩৬৮	৪৩,৩৬৭
	†	১৫৯,০৯৮	৮২,৭৪৭	৭৬,৩৫১	৪০,২৮৬	২০,৫৩৩
	‡	১৩৫,০৬৮	৭৬,৯১৪	৫৮,১৫৪	৪৫,০৮২	২২,৮৩৪

		১	২	৩	৪	৫
*উত্তর রায়পুর (অঃ পোঃ)	‡	১৩,৯৩৯	৭,২৩৭	৬,৭০২	৪,৪৩০	২,৭৮৬
*বজবজ (পৌ) *কালীপুর (বাঃ জঃ)	‡	৭০,৩২২	৪১,০৪১	২৯,২৮১	২৫,১৫২	১২,৭৫৮
বিড়লাপুর (নগঃ)	‡	৫০,৮০৭	২৮,৬৩৬	২২,১৭১	১৫,৫০০	৭,২৯০
(১) বিড়লাপুর (অঃ পোঃ)	‡	২৪,২০৫	১৪,৫৬৮	৯,৬৩৭	৭,২৮৯	২,৬২৪
(২) মৌখালি (বাঃ জঃ) (৩) জগৎবল্লভপুর (বাঃ জঃ) (৪) চক কাশিপুর (অঃ পোঃ)	‡	১৪,০২৪	৭,৫৪০	৬,৪৮৪	৩,৮৫৩	১,৭৬২
(৫) চক আলমপুর (বাঃ জঃ) (৬) বাওয়ালি (অঃ পোঃ) (৭) মহেশ্বরপুর (বাঃ জঃ) (৮) চকমানিক (বাঃ জঃ)	‡	১২,৫৭৮	৬,৫২৮	৬,০৫০	৪,৩৫৮	২,৯০৪
৫ **বিষ্ণুপুর**	মোট	২৮৭,৪৪৬	১৪৯,০২২	১৩৮,৪২৪	৭৫,২৭২	৩৪,৩৫০
	†	২৭৫,৩৬৫	১৪২,৬৬৭	১৩২,৬৯৮	৭০,৮৯১	৩১,৬৭৮
	‡	১২,০৮১	৬,৩৫৫	৫,৭২৬	৪,৩৮১	২,৬৭২
কন্যানগর (নগঃ)	‡	১২,০৮১	৬,৩৫৫	৫,৭২৬	৪,৩৮১	২,৬৭২
(১) কন্যানগর (অঃ পোঃ) (২) আমতলা (বা জঃ)	‡	১২,০৮১	৬,৩৫৫	৫,৭২৬	৪,৩৮১	২,৬৭২
৬ **বেহালা** মোট		৪২৫,৭০৯	২২৫.৫১৮	২০০,১৯১	১৭০,৭৮০	১২৬,৩৮৮
	†	৩১,১১৫	১৬,৬৩৬	১৪,৪৭৯	১০,২৭৪	৬,৩৩৩
	‡	৩৯৪,৫৯৪	২০৮,৮৮২	১৮৫,৭১২	১৬০,৫০৬	১২০,০৫৫
*সাউথ সাবারবান (পৌঃ) *গোপালপুর (বাঃ জঃ)	‡	৩৯৪.৫৯৪	২০৮,৮৮২	১৮৫,৭১২	১৬০,৫০৬	১২০,০৫৫
৭ **রিজেণ্টপার্ক****						
৮ **যাদবপুর****						
৯ **কশবা**	মোট	২৪৯,৪২৪	১৩২,২১০	১১৭,২১৪	৯৬,২৮২	৭২,৯৪১
	‡	২৪৯,৪২৪	১৩২,২১০	১১৭,২১৪	৯৬,২৮২	৭২,৯৪১
*যাদবপুর (পোঃ)	‡	২৪৯,৪২৪	১৩১,২১০	১১৭,২১৪	৯৬,২৮২	৭৩,৯৪১

**রিজেণ্ট পার্ক, যাদবপুর, তিলজলা থানার নগরীভূত অঞ্চল যাদবপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে।

		১	২	৩	৪	৫
১০ **তিলজলা****						
১১ **ভাঙড়**	মোট	২৪৮,৭২৮	১২৭,২৬৬	১২১,৪৬২	৪৯,৭২৯	২০,৪৯২
	†	২৪৮,৭২৮	১২৭,২৬৬	১২১,৪৬২	৪৯,৭২৯	২০,৪৯২
১২ **সোনারপুর**	মোট	২৪২,৩৯২	১২৭,০৭৫	১১৫,৩১৭	৭২,৭৯০	৪৬,৩০০
	†	১৫৮,৩৭৭	৮৩,২৪১	৭৫,১৩৬	৪২,১২২	২৪,০৭৬
	‡	৮৪,০১৫	৪৩,৮৩৪	৪০,১৮১	৩০,৬৬৮	২২,২২৪
*শ্রীপুর ভাগারখোল (অঃ পোঃ)		৯,৬৯৯	৪,৪৬২	৪,২২৭	২,৭৯০	১,৯৬৯
*লস্করপুর (অঃ পোঃ) *কুমড়াখালি (বাঃ জঃ)	‡	১৪ ৫২৫	৭,৪৮৪	৭,০৪১	৫,০৬৬	৩,৬৯২
রাজপুর (নগরী)	‡	৬০,৭৯১	৩১,৮৮৮	২৮,৯০৩	২২,৮১২	১৬,৫৬৩
(১) সোনারপুর (অঃ পোঃ) (২) চক হরিনাভি (বাঃ জঃ) (৩) চৌহাটি (বাঃ জঃ)	‡	১৬,৭৫২	৮,৭৬৭	৭,৯৮৫	৬,৬২০	৪,৭৬৮
(৪) রাজপুর (পোঃ)	‡	৪৪,০৩৯	২৩,১২১	২০,৯১৮	১৬,১৯২	১১,৭৯৫
১৩ **বারুইপুর**	মোট	২৩১,৮৮৫	১২০,০৫১	১১১,৮৩৪	৬০,৫২৪	৩০,৫৫৮
	†	২০৪,৮০৪	১০৫,৮৩৭	৯৮,৯৬৭	৫০,০৩৪	২২,৬৫২
	‡	২৭,০৮১	১৪,২১৪	১২,৮৬৭	১০,৪৯০	৭,৯০৬
বারুইপুর পোঃ)						
	‡	২৭,০৮১	১৪,২১৪	১২,৮৬৭	১০,৪৯০	৭,৯০৬
১৪ **ক্যানিং**	মোট	২১৮,২৫৩	১১১,৪২৫	১০৬,৮২৮	৪২,৫৩৭	১৪,৮৩৪
	†	১৯২,০৯৪	৯৭,৮০৬	৯৪,২৮৮	৩৫,১২৩	১০,৩৭৭
	‡	২৬,১৫৯	১৩,৬১৯	১২,৫৪০	৭,৪১৪	৪,৪৫৭
ক্যানিং (অঃ পোঃ) শহরবাসী		২৬,১৫৯	১৩,৬১৯	১২,৫৪০	৭,৪১৪	৪,৪৫৭
১৫ **বাসন্তী**	মোট	২০২,৬৫৩	১০৩,৮৪২	৯৮,৮১১	৩২,৯৮১	১১,৮৬৪
	†	২০২,৬৫৩	১০৩,৮৪২	৯৮,৮১১	৩৬,৯৮১	১১,৮৬৪
১৬ **জয়নগর**	মোট	২৫৩,৮৬৭	১৩১,৮৮৫	১২১,৯৮২	৫৬,৪৬৮	১৯,৫৩৭
	†	২৩৭,৫৩৩	১২৩,৩০৩	১১৪,২৩০	৫০,২৯০	১৫,২৮৪
	‡	১৬,৩৩৪	৮,৫৮২	৭,৭৫২	৬,১৭৮	৪,২৫৩
জয়নগর-মজিলপুর (পোঃ)						
	‡	১৬,৩৩৪	৮,৫৮২	৭,৭৫২	৬,১৭৮	৪,২৫৩

		১	২	৩	৪	৫
১৭ **কুলতলী**	মোট	১৪৩,৮৪২	৭৪,৬৬৮	৬৯,১৭৪	৩১,০৫৯	৯,২৫৬
	গ	১৪৩,৮৪২	৭৪,৬৬৮	৬৯,১৭৪	৩১,০৫৯	৯,২৫৬
ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা						
১৮ **মগরাহাট**	মোট	৩১৩,৩৩৯	১৬২,২৮৮	১৫১,০৫১	৭৪,৮৪৫	২৮,২৬৭
	গ	৩১৩,৩৩৯	১৬২,২৮৮	১৫১,০৫১	৭৪,৮৪৫	২৮,২৬৭
১৯ **ফলতা**	মোট	১৬০,২২৯	৮২,৯৫২	৭৭,২৭৭	৪৫,৮৫৬	২১,৮০৩
	গ	১৬০,২২৯	৮২,৯৫২	৭৭,২৭৭	৪৫,৮৫৬	২১,৮০৩
২০ **ডায়মণ্ডহারবার**	মোট	২২৮,৫০৭	১১৮,০১৯	১১০,৪৮৮	৬৩,১০৭	৩২,২৯৯
	গ	২০৮,৪১২	১০৭,৫৭১	১০০,৮৪১	৫৬,১৩৪	২৭,৫১০
	‡	২০,০৯৫	১০,৪৪৮	৯,৬৪৭	৬,৯৭৩	৪,৭৮৯
ডায়মণ্ডহারবার (অঃ পৌঃ)						
	‡	২০,০৯৫	১০,৪৪৮	৯,৬৪৭	৬,৯৭৩	৪,৭৮৯
২১ **কুলপী**	মোট	১৭২,৪৭৮	৮৯,৩৩১	৮৩,১৪৭	৪১,২৯৯	১৫,৫৫৯
	গ	১৭২,৪৭৮	৮৯,৩৩১	৮৩,১৪৭	৪১,২৯৯	১৫,৫৫৯
২২ **মন্দিরবাজার**	মোট	১১৯,৬৮৬	৬১,৯৮৯	৫৭,৬৯৭	২৯,৩৫৩	১০,৭৯৭
	গ	১১৯,৬৮৬	৬১,৯৮৯	৫৭,৬৯৭	২৯,৩৫৩	১০,৭৯৭
২৩ **মথুরাপুর**	মোট	২৪৪,৩৮৩	১২৬,৫৭৪	১১৭,৮০৯	৬২,০৫৬	২২,৫৬৩
	গ	২৪৪,৩৮৩	১২৬,৫৭৪	১১৭,৮০৯	৬২,০৫৬	২২,৫৬৩
২৪ **পাথরপ্রতিমা**	মোট	১৯৭,৮৪৩	১০১,৬৯৭	৯৬,১৪৬	৫২,২৯৫	২১,৭৩৩
	গ	১৯৭,৮৪৩	১০১,৬৯৭	৯৬,১৪৬	৫২,২৯৫	২১,৭৩৩
২৫ **কাকদ্বীপ**	মোট	১৬৫,৬০৬	৮৫,৬১৩	৭৯,৯৯৩	৪২,৮০৭	১৮,৪১৮
	গ	১৬৫,৬০৬	৮৫,৬১৩	৭৯,৯৯৩	৪২,৮০৭	১৮,৪১৮
২৬ **সাগর**	মোট	১১৫,১১৩	৫৯,০০৬	৫৬,১০৭	৩২,২৮৬	১৩,৮৯২
	গ	১১৫,১১৩	৫৯,০০৬	৫৬,১০৭	৩২,২৮৬	১৩,৮৯২
২৭ **নামখানা**	মোট	৭২,৬৪৩	৩৭,৫৫৫	৩৫,০৮৮	১৯,২১৬	৮,০৭৯
	গ	৭২,৬৪৩	৩৭,৫৫৫	৩৫,০৮৮	১৯,২১৬	৮,০৭৯
২৮ **গোসাবা**	মোট	১৬৮,২০০	৮৬,৯২২	৮১,২৭৮	৪১,৩৯১	১৭,৭৭১
	গ	১৬৮,২০০	৮৬,৯২২	৮১,২৭৮	৪১,৩৯১	১৭,৭৭১

* কলকাতা নগরীকরণ এলাকাভুক্ত অঞ্চল।

অঃ পৌঃ—অ-পৌর এলাকা। নঃ—নগরীকরণ। বাঃ জঃ—বাড়তি জনবসতি।

পরিশিষ্ট ॥ ১

সুন্দরবনের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার এবং অজ্ঞাত যুগে আলোকপাতে কালিদাস দত্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। চব্বিশ পরগণার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার গবেষণার ফলেই এযুগের পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা পেয়েছেন নতুন তথ্যের সন্ধান। বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কালিদাস দত্তের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন প্রসঙ্গে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা এখানে উদ্ধৃত হল।

In this paper I intend to give a short account of some interesting primitive statuettes. They consist of representations of two human beings under form of man and beast and two animals. Their grotesque appearances and other rude features indicate that they are handicrafts of some people of aboriginal culture. Portions of them were made from fantastic imaginations of their makers and portions from real forms of human beings.

The findspot of the statuettes is situated in the southernmost area of the present district of 24 Parganas of West Bengal. Formerly this tract was within the dense forest of the Sunderbans, abounding in tigers. rhinoceroses and other wild beasts. It's reclamation work commenced in the latter part of the eighteenth century and since then with the extension of cultivation numerous villages have grown up here. These villages are mostly inhabited by agriculturists and lie within extensive paddy fields protected by embankments built on the sides of tidal rivers intersecting this tract. Some of the rivers are of great size, having a general southerly courses towards the Bay of Bengal. They are also connected with each other by a network of branches.

There to fore many scholars doubted to whether this area was anciently populated. As to this W. W, Hunter made the following observations:

"Some ruins of masonry buildings, the traces of old courtyards

and here and there some garden plants and shurbs remain to the present day......Remains of brick ghats and traces of tanks have also been found insolated parts of the forest and in one or two localities brick kilns two were discovered. There can be no doubt that settlers did occasionally appear in the Sunderban in olden times, but there is nothing to show that there was a general population."

This kind of belief was probably originated from the few and scattered remains of ancient human habitants which were found at that time. But since then with the gradual reclamation of the area hundreds of archaeological relics of the Maurya, Sunga, Kushana, Gupta, Pala and Sen periods have been discovered. They clearly testify that in the past human settlements existed in this part of lower Bengal from very early times.

The pottery figures, referred to above, so long lay hidden underground of one of the aforesaid villages known as Harinanrayanpur, situated on the eastern bank of the river Hooghly about four miles to the south of Diamond Harbour. They suddenly came to light by erosion of the river. All of them were made entirely by hand by pinching up and pressing down soft clay according to the requirements of their shapes.

Of them body of a human statutette terminates at the waist and is not furnished with legs but with cylindrical stand instead. The statuette represents a woman with three children, It is 6″ inches in hight and has a jackal-like face with too leaf-like ears and similar head dress. The faces of the children are also jackal-like. Their bodies have been shown hanging, one on the back, below its shoulder and the other two within its' arms, which are unusually big and not shapely.

True significance of this statuette is unknown. It may be an embodiment of mother Goddess whose conception is associated with the oldest belief in the matriarchy.

The second statuette is 7″ inches in hight. It has a bear's body with a man's face. It appears to be an image. of a bear man.

Representations of primitive personifications of jungle animals as described above, have also been discovered in neolithic sites of other countries.

The purpose for which the aforesaid therianthropic images were made can not he ascertained at present. They can hardly be toys. but sum rather to be embodiments of goddesses and gods of primitive iconoguaphic pattern and most likely were used as votive offerings.

Among the figures of the two animals mentioned above one is a model of a seated pig. It measurcs 4″ inches in height. Only the body and face of the beast have been shown and no attempt has been made to delineate its legs and tail.

The other image of animal is roughly modelled and can not be identified. It is 2″ inches in length and 3″ inches in height. It has four feet, a long mouth, two big ears and a hump upon the back of its' neck.

We have no certain knowledge of the use of these statuettes too. They may be totems,

The figurines described above came to light in association with a large number of stone tools. I am also dealing with them here. As the aforesaid terracottas may be the handicrafts of the makers of the tools.

The tools are made of various kinds of rock, such as trap, jasper. flint etc. Some of them have polished exteriors. Their varied forms indicate that they served different purposes, The technological and typological affinity of them with tools discovered in the neolithic sites of India enables us to know that they are products of some aboriginal people of neolithic culture.

From the discovery of the aforesaid articrafts it appears that the

lower portion of the gangetic delta harboured in the past such people. Although particulars of them are lacking at present, they may be available if excavations are conducted in the findspot of the tools and its environments. It is reasonable to expect that vestiges of the habitations of the aboriginals may also be found there. The chance finds are highly suggestive of this,

A few years back the archaeological Department of the Government of India excavated a proto-historic site within the district of Midnapur situated about 23 miles to the west of Harinarayanpur, the provenance of the tools mentioned above. Antiquities discovered there also include neolithic stone implements and other artifacts, This discovery proves that neolithic communities had settlements in this part of lower Bengal since very early times,

I have already stated that the findspot of the artifacts described above, the village of Harinarayanpur, stands on the river Hoghly. The makers of the tools the neolithic people most probably lived there. Because we find most of the neolithic sites, yet discovered in other countries were situated like it by water. Either they were near a lake or by the sides of rivers. This close-connection with water is explained by the fact that in their economy catching of aquatic animals took prime place. So it is certain that the river named above provided much of the articles of diet of the aborigines of Harinarayanpur like fishes, crabs, tortoises, oysters etc. Accumulations of calcified shells of the tortoisesl have been found underground close to the river eroded portion of the village and one of the accumulations disclosed also fragments of stone net sinkers.

Besides the terracotta statuettes and stone tools described above many other artifacts such as charms, potteries, representations of human phalus of clay and various kinds of bone tools were discovered at the aforesaid village of Harinarayanpur. They have also the same kind of technical qualities like the after neolithic crafts.

('মৈত্রী' থেকে উদ্ধৃত)

পরিশিষ্ট ॥ ২

মানুষের সমুদ্রে মানুষ

দেবেশ রায়

কলকাতা শহরের এক কোণে কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রীকে আটকে রাখা যায় বটে কিন্তু ডায়মণ্ডহারবার থেকে হারউড পয়েণ্ট আর নামখানা পর্যন্ত ৫০-৫২ কিলোমিটার রাস্তায় যদি এই ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে ভিড়ের চাপে হাজার-হাজার লোক মরে যেতে পারে, পাশাপাশি গ্রামের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হতে পারে, এবং মেলা থেকে ঘটে যেতে পারে এমন আরো সর্বনাশ।

এবার কলকাতায় অপেক্ষমাণ তীর্থযাত্রীদের ছাড়ার সময় স্থির করা হয়েছিল ১৩ জানুয়ারি বেলা ১২টা। সব যাত্রীদের একসঙ্গে ছাড়া হয় না। এখান থেকে এমন ভাবে ছাড়া হয়, যাতে ডায়মণ্ডহারবারে, কালীনগরে, হারউড পয়েণ্টে ও নামখানায় কোনো ট্র্যাফিক জ্যাম না হয়। একটা কোনো জায়গাতেও যদি তেমন জট পাকিয়ে যায়, তা হলে দু-দিকের সমস্ত গতি প্রায় থেমে যাবে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে চল্লিশ কিলোমিটার মত দূরে কালীনগর পয়েণ্টে গাড়িগুলোকে দু ভাগ করা হয়। শতকরা ৬০ ভাগ গাড়ি ডাইনে বেঁকে নামখানায় যায়। সেখানে লঞ্চে চড়ে আধ ঘণ্টায় পেঁছিয় সাগরদ্বীপের এক সীমা চেমাগুড়িতে। চেমাগুড়িতে বাস মোতায়েন থাকে। সেখান থেকে মিনিট চল্লিশের বাসযাত্রা—তারপর মেলার জায়গা। হারউড পয়েণ্ট থেকে লঞ্চ আরো কম সময়ের এবং সাগর মেলায় যাবার পথটা আর একটু বেশি সময়ের।

অর্থাৎ সরকারকে কলকাতা থেকে সাগরমেলা পর্যন্ত প্রবাহটাকে ঐ চরম কয়েকটি ঘণ্টা অব্যাহত রাখতেই হবে। গত কয়েক বছরের চেষ্টায় জলযাত্রার অংশটিকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়া সম্ভব হয়েছে—কারণ সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে জলেই। কিন্তু তা করার জন্যে জেলার যেখানে যত লঞ্চ আছে সব এনে জমা করতে হয়েছে নামখানায় আর হারউড পয়েণ্টে, জেলার যেখানে যত বাস আ ছে সব নিয়ে গিয়ে ফেলতে হয়েছে সাগরদ্বীপের দুই সীমায়—চেমাগুড়িতে আর কচুবেড়িয়াতে।

যে কেউই বুঝতে পারেন এটা করার জন্যে কতটা সংগঠনশক্তি দরকার।

কিন্তু তবু যে করা সম্ভব হচ্ছে তার প্রধান কারণ যাত্রীরাই এখন অনেকটা সংগঠিত। বা, বলা যায়, বেশির ভাগ যাত্রীই এখন সংগঠিত ভাবে আসেন। সাগরমেলায় সমস্ত আয়োজন করতে হয় লাখ দশেক লোকের কথা ভেবে। সাধারণত

ছয় থেকে আট লাখ মত লোক মেলায় আসেন। কোনো কোনো বছর, যেমন এ-বছর তার চাইতে কম। কিন্তু সেই কমটাকে হিসেবে ধরে ত আর ব্যবস্থা করা যায় না। এই এত লাখ লোককে প্রধানত ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের ভিতরে একটা দ্বীপখণ্ডে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। কুম্ভমেলায় বা হরিহরছত্রের মেলায় একটা জিরোবার অবকাশ থাকে। সমস্ত কাজকে দু ভাগে করা যায়। প্রথম কাজ— যাত্রীদের পৌঁছে দেয়া, দ্বিতীয় কাজ যাত্রীদের ফিরিয়ে আনা। আর, এ দুটো মেলাই প্রধানত বড় শহরের পাশে ও বড় রেলস্টেশনের কাছাকাছি হয় বলে যাত্রীদের আসা যাওয়ার ব্যাপারে রেলওয়ে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সাগরমেলায় এ দুটো সুবিধের কোনোটাই পাওয়া যায় না। সেখানে যাত্রীদের সাগরে পৌঁছুনো ও ফিরে আসার মধ্যে সময়ের প্রায় কোনো ব্যবধানই নেই। এমন-কি সাগরদ্বীপ থেকে ফেরার যদি অন্য পথ থাকত, তা হলেও না হয় প্রবেশ-প্রস্থানের স্বতন্ত্র রুট চালু করা যেত। কিন্তু সে সব কোনো সুবিধেই নেই। যেপথ দিয়ে প্রবেশ, সে পথ দিয়েই নিষ্ক্রমণ—২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা নিয়ত চলা, নিয়ত চলা, স্থলপথে, জলপথে, নিয়ত চলা। সাগরমেলা শুধু সাগর দ্বীপেই হয় না—কলকাতা থেকে সাগর পর্যন্ত প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পথ জুড়েই আসলে সে মেলা চলতে থাকে। কলকাতা থেকে যাত্রীদের যাওয়ার কথাই বারবার আসছে ও আসবে। কারণ এটাই প্রধান, প্রায় একমাত্র পথ। ওড়িশা ও মেদিনীপুর থেকে ছোট-বড় নৌকোয় অনেক যাত্রী সরাসরি মেলায় চলে আসেন। প্রতি বছরই যান, এবারও এসেছেন। কিন্তু যাত্রী সংখ্যার প্রধান অংশ আসেন বাসে, রিজার্ভড বাসে। এই বাসভাড়া করে যাত্রীদের আসার ফলেই মেলাকে সংগঠিত চেহারা দেয়া সহজতর হয়েছে। এই বাসগুলোই নানা জায়গা থেকে কলকাতায় ঢোকে, কলকাতা থেকে নামখানা-হারউড পয়েণ্টে যায় আবার সেখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে চলে যায়।

তাই কলকাতার গড়ের মাঠেই হোক আর নামখানা-হারউড পয়েণ্টেই হোক যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে বাসেরও মেলা বসে যায়। তাতে জায়গা অনেক বেশি লাগে বটে কিন্তু যাত্রীরা অনেক গোছানো থাকে। নামখানায় বাস-স্ট্যাণ্ডই ত এবার একটা দেখবার মত ব্যাপার হয়েছিল। সেখানে বাসগুলোকে লাইন বেঁধে দাঁড় করানো হয়—যাত্রীদের সেখান থেকে লঞ্চ-জেটিতে হেঁটে যেতে হবে।

কিন্তু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বাস একেবারে মিলেমিশে ছিল কলকাতায় আউট্রাম ঘাটের ধারে। সেখানে তীর্থযাত্রীদের সংবর্ধনা জানাতে বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন। ক্যাম্পগুলো সব একই কায়দায় তৈরি— কাপড় বা চট দিয়ে ঘেরা

লম্বা একটা ঘর। তার বাইরে সেই সমিতির একটা অফিস, পাশে, বা, কোথাও আলাদা করে রান্নার ব্যবস্থা। যাত্রীরা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, রাতে ঐ সব ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে শুতেন। কিন্তু এই অস্থায়ী ছাউনিতে ত আর তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব নামাতে পারেন না। তাই যাত্রীরা যে ক্যাম্পে রাতে শোবেন, তারই আশেপাশে বাসগুলো'ও দাঁড় করানো, তাঁরা বাসের ভিতর থেকে দরকারি জিনিসপত্র নামিয়ে কাজকর্ম করছেন, আবার বাসে তুলে রেখে আসছেন। রাতে কেউ কেউ বাসের ভেতরে বা ওপরেও শোন।

কলকাতার এই প্রাক মেলায় দেখা গেল কলকাতায় এক-একটা রাজ্য বা জেলার নামে কত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আছে। হরিয়ানা নাগরিক সঙ্ঘ-এর ক্যাম্পে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হরিয়ানা থেকে কত লোক এসেছেন? যাঁরা অফিসে ছিলেন তাঁরা বেশ বাবু দেখতে। বড়লোক এটাও বোঝা যায়। সামনে একটা মারুতি গাড়িও ছিল। তাঁরা বললেন—"এখানকার ক্যাম্প শুধু হরিয়ানার লোকজনের জন্যে নয়, যে কোন জায়গার লোকই এখানে থাকতে পারেন।"

"হরিয়ানার কেউ কি এখানে নেই?"

"হরিয়ানা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা শহরের ভেতরে নানা ধর্মশালায় জায়গা করে নিয়েছেন, বা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন।"

অর্থাৎ সরকারি এই রিসেপশন পয়েন্ট ছাড়া অন্যত্রও সাগরযাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন।

কিন্তু এই রিসেপশন পয়েন্টে যেটা বিস্ময়কর একটিও বাঙালি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান নেই। কলকাতা শহর ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, আজকাল নানা উপলক্ষেই নানারকম সমাজসেবী সংস্থার কাজকর্মের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে বাঙালি যাত্রীরা কেউ আসেন না বলেই কি কোনো বাঙালি প্রতিষ্ঠান এখানে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন না? এমন-কি গঙ্গাসাগরের মেলার জায়গাতেও কোনো বাঙালি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে দেখা গেল না। "লোকনাথ সেবা সমিতি" বলে একটি প্রতিষ্ঠানের কিছু ফেস্টুন গঙ্গাসাগরে দেখা গেল বটে কিন্তু সে ত একজন সন্ন্যাসীর অনুগামীদের সংস্থা, যেমন আছে রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

অথচ, বাবুঘাট-আউট্রাম ঘাটের এই রিসেপশন পয়েন্টে বিভিন্ন সেবা সমিতির ক্যাম্প ও ফেস্টুন দেখে বোঝা যায়, কলকাতায় অবাঙালিদের সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান কত আছে। কালোধোয়া বৈশ্য সমিতি, হরিয়ানা নাগরিক সঙ্ঘ, আজমগড় সমিতি, বালিয়া সেবা

সমিতি, কাশীবিশ্বনাথ সেবা সমিতি, সুলতানপুর সমাজ, (মোমিনপুর), অখিল ভারতীয় সুলতানপুর সমাজ, অবধ সমাজ, অগ্রবাতি সমাজ (বুন্দেল), প্রগতিশীল কান্যকুব্জ সমিতি, অবধ সেবা সমাজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল যাদব সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ ভোজপুর সমাজ, ব্যবসায়িক সঙ্ঘ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসে করে তীর্থযাত্রায় আসার ফলে তীর্থযাত্রীরা অনেকখানি গোছানো। তাঁরা বাসে জিনিসপত্র রেখে খানিকটা ঝাড়া হাত-পায়ে এদিক-ওদিক করতে পারেন। আর দূর-দূর জায়গা থেকে বাসে আসার ফলে তীর্থযাত্রাটা শুধু গঙ্গাসাগরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বালিয়া থেকে সাত বাস বোঝাই যাত্রী এসেছেন। এক-এক বাসে অন্তত ৭০-৮০ জন যাত্রী। তাদেরই একজন এক কলেজের অধ্যাপক। আর একটু জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, প্রাইভেট কলেজের। তিনি বললেন, "প্রথমে গয়া, তারপর রাজগীর, সেখান থেকে দেওঘর, দেওঘর থেকে গঙ্গাসাগর, গঙ্গাসাগর থেকে তারকেশ্বর ও তারকেশ্বর থেকে পুরী—পুরী থেকে সোজা ফেরত বালিয়া।" কিন্তু এ সত্ত্বেও গঙ্গাসাগরটাই সব তীর্থযাত্রার প্রধান লক্ষ্য। আর সব জায়গায় ত তীর্থদর্শন—বছরের যে কোনো সময়েই করা যায়।

বাসে করে যাঁরা এসেছেন তাঁদের আর্থিক অবস্থারও একটা অনুমান করা যায়। উত্তর-প্রদেশ-বিহার সীমান্তকে যদি গড়-দূরত্ব ধরা যায় তা হলে হিসেবটা দাঁড়ায় যাতায়াতে ৮০০ টাকা। তীর্থযাত্রার সময় খাওয়া খরচটাই সবচেয়ে কম, ধরা যাক মাথাপিছু ১০০ টাকা। ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন বাবদ অনেককে হাজার দুয়েক পর্যন্ত খরচ করতে হয়। এই শেষ হিসেবটা মেনে নিলে তার মাথাপিছু বরাদ্দ দাঁড়ায় ৭০০ মত। সুতরাং মাথাপিছু খরচা ১৫০০-১৬০০ দাঁড়িয়ে যায়। সেটাকে অনেকে বাড়িয়ে হাজার দুয়েক বলে থাকেন।

তীর্থযাত্রায় পরিবার ধরেই সবাই আসেন, গ্রাম বা শহরের পাড়া ধরে ত বটেই। তাই ৭০-৮০ জন যাত্রীর মানে অনেক সময় দাঁড়ায় ২৪-২৫টি পরিবার। এতে নানাদিক দিয়েই সুবিধে হয়। বাসে একটি ড্রাইভার থাকেন। সাহায্য করার লোকও থাকেন দু-একজন। এছাড়া পাণ্ডা একজন। অনেক সময় এক বড় পাণ্ডার তদারকিতে একাধিক বাস আসে। সব বাসে তাঁর অধীনে ছোট পাণ্ডারা থাকে।

বাবুঘাট-আউট্রাম ঘাটে যেমন, তেমনি গঙ্গাসাগর মেলার জায়গাতেও দেখা যায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে ঢালাও খাবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ যাত্রীও নিজেরা আলাদা রান্না করে নেন। তাঁদের সঙ্গে ছাতু থাকে, জল দিয়ে মেখে যেটা সহজেই খাওয়া যায়—রান্নার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। আটা থাকে—একটু জায়গা

পেলেই আটা মেখে রুটি সেঁকে নেন। সেজন্যে ইঁট দিয়ে চুলো যেমন বানানো হয়, তেমনি আবার অনেক পরিবারই স্টোভ নিয়ে আসছেন। জনতা স্টোভ প্রায় দেখাই যায় না, বেশির ভাগ পরিবারের সঙ্গেই পাম্প দেয়া স্টোভ। কিন্তু পুরনো প্রাইমার স্টোভের মত নয়, নতুন চৌকো স্টোভ, পাশে কেরোসিন ঢালার সিলিণ্ডারের মত জায়গা।

তীর্থ করতে যে টাকা লাগে আর খাবার দাবার এই যে ব্যবস্থা তা থেকে মনে হয় একেবারে গরিব মানুষজন গঙ্গাসাগরে কমই আসেন। অন্যান্য তীর্থে ট্রেনে করে যাবার সুযোগ থাকে। গঙ্গাসাগরে সে সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে গঙ্গাসাগর যেন একটু উদ্বৃত্ত আয়ের মেলা।

একটু খোঁজ করে জানা গেল, প্রায় প্রত্যেক বাসেই গাঁয়ের বা টোলার দু-একজন গরিব মানুষ আছেন, তাঁদের বিনি পয়সাতেই আনা হয়েছে। আর আছেন কিছু সাধু সন্ন্যাসী চেহারায় ভিখিরি। তাঁদেরও বিনি পয়সাতেই আনা হয়েছে। যেটা জানা গেল না তাঁদের দিয়ে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের ফাইফরমাশ কী রকম খাটানো হয়।

একটা তথ্য জানতে কৌতূহল হয় যে অন্তত গঙ্গাসাগরে ও কলকাতায় এত খাবারদাবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ যাত্রীরাই কেন নিজেদের রান্না নিজেরা করে নিচ্ছেন। সার্বজনীন খাওয়ার জায়গাগুলোতে তত ভিড় নেই—কেবল চা-খাওয়ার জায়গা-গুলোতে বিরাট লাইন, মাটির খুরিও পাহাড়প্রমাণ। আবার, কড়াই ইত্যাদির সাইজ দেখে আন্দাজ করা যায় রান্নাও হয় বেশ রাজসূয় যজ্ঞের সাইজে। তাহলে সে রান্না খাওয়াও ত হয়।

জিজ্ঞাসাবাদ করে কতকগুলি কারণের আন্দাজ পাওয়া যায়। হয়তো এর মধ্যে বিহার-উত্তরপ্রদেশের জাত-পাতের ব্যাপারও খানিকটা আছে। মেলায় এসেছে বলে কি সবার সঙ্গে এক পাতে খেতে হবে নাকি, বা যে জায়গায় এঁটো পরিষ্কার করা হচ্ছে না সেখানেও পাত ফেলতে হবে? আবার, হয়তো একটু অর্থনৈতিক কারণও আছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কেউ এরকম লঙ্গরখানার মত খেতে চান না। যেমন, যাঁরা পারেন তাঁরা বাবুঘাট-আউট্রাম ঘাটের রিসেপশন পয়েন্টেও আসেন না, শহরের অন্যত্র থাকেন। কিন্তু জাতপাতের কারণেই হোক আর অর্থনৈতিক কারণেই হোক, তীর্থযাত্রায় সামাজিক মর্যাদা রাখার দায় কিন্তু মেয়েদেরই। এমনকি, তীর্থযাত্রা বলেই পতি পরমগুরুর বা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবার বহরটা বরং একটু বাড়েই। তাই রান্নাবান্না ত মেয়েরাই করছেন, জলও তাঁরাই টানছেন। এবং এও দেখা গেল, যে সকালের বা বিকেলের রোদে 'মরদ' কুচকি পর্যন্ত কাপড় তুলে মাদুরের ওপর শুয়ে আছেন আর

স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে তার পায়ে তেল মালিশ করছেন। আকাশের নীচে শুয়ে 'মরদ'টি অবিশ্যি পাশাপাশি দাঁড়ানো সহযাত্রীদের সঙ্গে 'গপ্পসপ্প' করেই চলেছেন।

গঙ্গাসাগরের মেলায় যে লাখ-লাখ লোক আসেন তাঁরা এই ভারতবর্ষটাকেই নিয়ে আসেন। সাগরমেলায় তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা সবচেয়ে কম। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসেন বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। দূরত্ব অনুযায়ী তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও কমে। বিহার-উত্তরপ্রদেশের জমির দাঙ্গায় যারা খেতমজুর ও কিষানদের হত্যা করে বাড়তি টাকা জমায় তাদেরই একটা বড় অংশ বাসভাড়া করে—এবার ত কয়েকটা ভিডিও বাসও দেখা গেল—তীর্থযাত্রায় আসে। তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষও আসেন। কিন্তু ঐ কটি দিন কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এক মধ্যযুগের ভারতবর্ষ—তারা মেয়েদের মনে করে ভূমিদাস, তারা গরু আর গঙ্গাকে মনে করে পরলোকের গ্যারাণ্টি, তারা তীর্থযাত্রাকেও মনে করে হঠাৎ-বড়লোকদের প্রাপ্য 'বিশেষ সুবিধে' বা 'প্রিভিলেজ'। সে মেলার দিন শেষ যে-মেলায় দীন-দরিদ্র মানুষ তার ইহকালের বাঁচার লড়াইয়ের জোর সংগ্রহ করতে তীর্থক্ষেত্রে আসত। এখন আসে টাকা-হাতে-পাওয়া জোতদার ও মধ্যবিত্ত। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশের বিশেষ ধরন সব মেলারই চরিত্র বদলে দিয়েছে, গঙ্গাসাগরেরও বদলেছে।

কিন্তু মেলার চেহারাটা ত আছে সেই আগের মতই। অত লাখ-লাখ মানুষ প্রায় একই রকম চেহারা নিয়ে মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে সহজেই মনে হতে পারে এ বুঝি সেই এস-ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ, "সেই ট্র্যাডিশন⋯"। কিন্তু এমন সনাতন ও অপরিবর্তনীয় ভারতবর্ষ আছে একমাত্র তাদের মাথায় বা মনে যারা সময় বদলের পুরো মুনাফাটা আইনি-বেআইনি পথে পকেটস্থ করেছে। দিনবদলের ফলে যদি সম্পত্তি বেড়ে হয়ে থাকে দশগুণ, লাভের অঙ্ক বেড়ে থাকে বিশগুণ, তা হলে সেই বাড়তি টাকায় একটু 'সনাতন ভারত' করে আসা ক্ষতি কী?

গঙ্গাসাগর নিয়ে যাঁরা ধর্ম করতে চান আর গঙ্গাসাগরকে যাঁরা আধুনিক করতে চান তাদের ভেতর বিরোধ ধীরে-ধীরে পাকিয়ে উঠছে। রানু ঘোষ যখন চব্বিশ পরগনার জেলা সমাহর্তা ছিলেন, তখন তিনি সাগর দ্বীপে নানারকম উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়েছিলেন। তাতে কপিল মুনির আশ্রমের সেবায়েতরা রাগ করেছিলেন। কারণ, সাগর দ্বীপ যত বেশি অগম্য থাকে, যত বেশি রহস্যাবৃত থাকে, যত বেশি চোখের বাইরে থাকে—তীর্থস্থান হিসেবে ততই তার টান বাড়বে। একবার এই আশ্রমের সেবায়েতরা এমন হুমকিও দিয়েছিলেন যে তাঁরা কপিলমুনির আশ্রম

অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন। এখন তাঁরা নিয়মিত ভাবে সাগর দ্বীপের যুব-আবাসের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। তাঁদের অভিযোগ এই আবাসে মুরগি খাওয়া হয়, তাতে এই তীর্থস্থানের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে।

সেবায়েতরা যদি কপিল মুনির আশ্রম অন্যত্র নিয়ে যেতেন তাতে অন্তত একটা প্রমাণ হত যে কপিল মুনির এই আশ্রমটি অন্ততঃ মহাভারতের মত পুরনো নয় এবং তীর্থের পান্ডাদের খেয়াল-খুশিতেই তার স্থানপরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সেবায়েতদের কাছে কপিল মুনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর মেলা বার্ষিক আয়ের প্রধান অবলম্বন। তাঁরা কোনো ভাবেই এই আয়ের পথটিকে বন্ধ করতে পারেন না। বা, এই আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার কোনো ঝুঁকিও নিতে পারেন না। সাগর দ্বীপ যদি একটা টুরিস্ট স্পট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তা হলে মা গঙ্গার মাহাত্ম্য কিছুটা ত কমে যাবেই।

অথচ সময়ের হাওয়া ত সাধুসন্ন্যাসীদেরও গায়ে লাগে। সাগর মেলায় সারা দেশ থেকেই সাধুসন্ন্যাসীরা এসে থাকেন—সারা দেশ মানে অবিশ্যি প্রধান পূর্ব-আর্যাবর্ত। দক্ষিণ থেকে কোনো সাধুসন্ন্যাসী আসেন না।

সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজেদের গুরু বা মঠ অনুযায়ী কতটা আলাদা তা ঠিক বোঝা গেল না। এক জায়গায় লালবাবার নামে একটা হোগলা দিয়ে ঢাকা আঙিনা দেখা গেল বটে কিন্তু সেটা বোধহয় কলকাতার রিসেপশন সেন্টারের মতই ব্যাপার—হরিয়ানার ক্যাম্পে যে হরিয়ানার লোকই থাকবে, তা কে বলেছে? সে-রকমই ত অনেকগুলো চিকিৎসাকেন্দ্র খুলেছিলেন লোকনাথ-এর শিষ্যরা। কিন্তু সেটাও ত মঠের ব্যাপার নয়। আমার সন্দেহ—বিভিন্ন নাম করা সাধু-সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগরের কষ্ট সহ্য করতে চান না, তাই তাঁরা বা তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা এখানে আসেন না। কুম্ভমেলা ত শহরের কাছাকাছি হয়—সেখানে শিষ্যরা থাকার আরামটুকুর ব্যবস্থাটা অন্তত করে দিতে পারেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের ভেতর শ্রেণীভাগটা বেশ স্পষ্ট। একদল ত আসলে ভিখারি—ভিক্ষে পাওয়ার সুবিধে হবে বলে সন্ন্যাসীর ভেক ধরেছে। তাদের কেউ কোনো রকমে একটা চিমটে, কেউ কোনো রকমে একটা পাগড়ি জোগাড় করেছে। কেউ কেউ অবিশ্যি বোধহয় এ পেশার পুরনো লোক—তাদের জটা-টটাও বেশ পুরনো। একজনকে দেখা গেল রাস্তায় পাওয়া চটই সেলাই করে পরেছে। তাকে হয়ত চটবাবা বলা চলত।

এদের ওপরের ভাগে আছে একদল সন্ন্যাসী যারা ভিক্ষুক নয় কিন্তু ভিক্ষা নিয়ে

থাকে। তারা মেলার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই—আছে মেলার আর-এক সীমায় কপিল মুনির মন্দিরের প্রবেশ-প্রস্থানের রাস্তার দুপাশে। মন্দিরের যাত্রীরা তাদের সামনে রাখা গামছায় বা কাপড়ে পয়সা, চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছেন।

এদের ওপরের ভাগে যারা তাদের ঠিক সন্ন্যাসী বলা চলে না। অন্যান্য মেলার সার্কাসের বদলে তারা এখানে এক-এক দেবতার মূর্তি ও মন্দির বানিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে তীর্থযাত্রীদের ডাকছে। কালী, কৃষ্ণ, গোপাল, যম—এ-সব ত আছেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে হনুমানের মন্দির ও মূর্তি। হনুমানের জীবনের নানা ঘটনাই এসব মূর্তিতে ধরা আছে। একটা বিরাট হনুমান মূর্তি ছিল—বুক চিরে রামসীতা দেখাচ্ছে।

এর ওপরের ভাগে যে সাধুরা তারা হোগলার এক-একটা ছোট কুঠুরিতে ধুনি জ্বালিয়ে চিমটে পুঁতে বসে আছে। এক-এক কুঠরিতে একাধিক সাধু, কোনো-কোনো কুঠরিতে চারজনও। এক-এক কুঠরিতে দু-একজন চেলার কাজ করছে—অর্থাৎ তারা যাত্রীদের ডাকছে, কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছে, পয়সা নিয়ে প্রণামীর মত ফেলে দিচ্ছে। কোনো-কোনো সাধু এমন ভাবে বসে আছে যেন নিজেরাই মেলা দেখছে। কেউ কেউ আবার পদ্মাসনে বা বজ্রাসনে—যাত্রীদের মন-ভোলানোর মত ভঙ্গিতে। যাত্রীরা এদের কাছে যাচ্ছেন, প্রণাম করছেন, প্রণামী দিচ্ছেন।

কিন্তু এদের তাও নিজেদের সন্ন্যাসীগিরির জন্যে মেহনত করতে হচ্ছে। এরা ছাড়া আর-এক দল সাধু দেখা গেল যারা কষ্ট করে সাগরেও নামে নি বা মন্দিরেও যায় নি বা এমন-কি মেলাতেও বেরয় নি। এরা কখন স্নান করল সেটাও জানা যায় না। হোগলার বেড়া দেয়া বেশ বড়-বড় ঘেরের মধ্যে এরা দল বেঁধে আছে। হোগলার গেটটা খানিকটা আবজানো। মাথার ওপরে হোগলার ছাউনি। মাটির ওপরে কিছু হোগলার ওপরে এরা নিজেদের বিছানা পেতে শুয়ে বা আধশোয়া হয়ে আছে। এক-একটা বড়, ঘরের মধ্যে এরা যে রকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাতে বোঝা মুশকিল এরা একটাই দল নাকি নানা দল। খেয়াল করলে বোঝা যায়, এক-একজায়গায় ধুনির পাশে একজনই বসে—বাকিরা চেলা। কিন্তু এদের কারো মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই। অনেকটা জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ভাব। সকালে নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে আরাম করছে, কেউ ট্রানজিস্টর শুনছে, কেউ আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে প্রসাধন করছে, কেউ চিরুনি দিয়ে দাড়ি আচড়াচ্ছে, ধুনির সামনে এক সাধুকে দেখি আয়নায় দেখে দেখে মুখে ও শরীরে গঙ্গা মাটির প্রলেপ লাগাচ্ছে। তখন সকাল। ধুনিতে কয়েকটা কাঠ ফেলে আগুন বাড়িয়ে

চায়ের জল ফোটানো হচ্ছে। বেশ বড় বড় পাত্রে সাধুরা চা পান করছে। এক জায়গায় একটা বড় নেসকাফের কৌটোও দেখা গেল।

এই সব দঙ্গলের যারা বুড়ো সাধু বা মূল সাধু তাদের দেখে অবিশ্যি বোঝা যায় যে সন্ন্যাসীর পেশায় তারা পুরনো। তাদের জটা আছে, ভুঁড়ি আছে, গায়ে রোম আছে। কিন্তু বাকি যারা তাদের অনেকেই ছেলে-ছোকরা, যেন মেলায় আসার সময় 'মেলাকা কাপড়া' পরে এসেছে। আমি ছবি তুলছি' দেখে এ-রকম একজন পোজ দিল। আর একজন ধমকে বের করে দিল। তার রাগের একটা কারণ সে প্রকাশও করে—'দেবার মুরদ নেই, ফটো খিঁচতে এসেছ?' এরা মেলায় বসে ত আর পয়সা নেয় না—বোধহয় মেলায় আসার আগেই এদের শিষ্যরা এদের গঙ্গাসাগরের টি-এ দিয়ে থাকে।

সাধুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নাঙ্গা সন্ন্যাসীরা। এদের জন্যে প্রধানতম জায়গাটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কপিল মুনির মন্দিরের বিপরীত দিকে একটা বড় আঙিনায় অনেকটা জায়গা ঘিরে রাখা। তার মধ্যে হোগলার কুঠরির মধ্যে একাধিক নাঙ্গা সন্ন্যাসী। প্রথম দিকে দুটো-একটা কুঠরিতে নাঙ্গা সন্ন্যাসীরা পদ্মাসন বা ঐরকম কোনো আসনের ছলে নিজেদের লিঙ্গ একটু লুকিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ তারা যে নাঙ্গা এটা বুঝিয়েও একটু আড়াল দেয়া। একজন ত একটু নেংটি মতও পরে ছিল। কিন্তু, তার পরই এক-এক কুঠরিতে সন্ন্যাসীদের নিজেদের মধ্যেই যেন প্রতিযোগিতা কে নিজের লিঙ্গ কতটা দেখাতে পারে। অধিকাংশই যুবক, শরীর মেদহীন ও পেশীবহুল। সামান্য দাড়ি আছে। চুল এলানো। প্রত্যেক কুঠরিতেই ধুনি জ্বলছে। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর গায়েই ছাই মাখা। এদের বয়স, স্বাস্থ্য ও গড়ন খুবই সুন্দর। দেখে বোঝা যায় যে স্বাস্থ্যে ও গড়নে নগ্নতা সুন্দর দেখায় সেই স্বাস্থ্য ও গড়ন সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের লিঙ্গ দেখাচ্ছে ও তারস্বরে তীর্থযাত্রীদের ডাকছে। তীর্থযাত্রীরাও দল বেঁধে আসছেন, প্রণাম করছেন ও লিঙ্গে ফুল ছুঁইয়ে মাথায় দিচ্ছেন। প্রদর্শনে এই সন্ন্যাসীদের যেন একটা পারদর্শিতাই আছে। একজন ত একটা কৃপাণের হাতল নিজের লিঙ্গে পাক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। দেখে মনে হয় মেলায় নাঙ্গা সেজে পয়সা উপার্জন এদের পার্ট টাইম পেশা—প্রত্যেকেই অন্য কোনো চাকরি বা ব্যবসা করে। নাঙ্গা সন্ন্যাসী ছাড়া মেলা বা তীর্থ সম্পূর্ণ হয় না। এরাও তাই নিজেদের দাম আদায় করে নিতে পারে।

দশ লাখ মানুষ যেখানে দশ লাখ মজা সেখানে। গঙ্গাসাগরের মত এত বড় মেলায় সেই মজা দেখতেই ত শুধু আসা যায়।

যেমন গঙ্গাসাগরে কত মানুষ এবার এসেছেন তার হিসেব কী করে পাওয়া যায়? বা করা হয়? সে উত্তর পেলাম ডায়মণ্ড হারবারের এস-ডি-ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। মৈত্রেয়ী আমার বন্ধু দীপেনের ছোট বোন। ডবলু-বি-সি-এস পরীক্ষা দিয়ে ও হাকিম হল আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু ওর হাকিমি যে চোখে দেখতে হবে তা ত ভাবি নি কখনো। ডায়মণ্ড হারবারে মৈত্রেয়ীর অফিস ও বাংলোতে গিয়ে শুনলাম, এস-ডি-ও "সাহেব" আছেন কাশীনগর পয়েণ্টে। তারপর, শেষ বিকেলে কাশীনগর পেঁাছে দেখি ঐটুকু মেয়ে ট্র্যাফিক তরঙ্গ সামলাচ্ছে রণক্ষেত্রের ব্যস্ততায় ও নিপুণতায়। সঙ্গে তার কর্মীদের বিরাট বাহিনী। হোগলার বেড়া আর চালের অস্থায়ী আবাস এস-ডি-ও-র ক্যাম্প। সেখান থেকে প্রতি মুহূর্তে বাস আর ট্রাক পাঠানো হচ্ছে নামখানার দিকে আর হারউড পয়েণ্টে। পাঠানোর সময় ফোনে আসা খবর মিলিয়ে নেয়া হচ্ছে—কোথায় এখন কত লঞ্চ আছে—যাতে কোনো জায়গায় হঠাৎ কোনো জ্যাম না হয়। রাস্তার মাঝখানে এক বাস ব্যাক করে-করে মুখ ঘোরাচ্ছিল। এস-ডি-ও "সাহেব" তাকে যেভাবে শাসালেন তাতে আমারই বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রীর হিসেবটা মৈত্রেয়ীই বোঝাল। তাদের কাছে প্রত্যেকটা ট্রাক বা বাসের নম্বর লেখা আছে। তারা ধরে কোনো একটা ট্রাক বা বাসে ৭৫ জন আছে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পর্যন্ত ৪০০০-মত ট্রাক গেছে। তাতে যাত্রী দাঁড়ায় ৩ লক্ষ। কিন্তু তখন ত ১৩ তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটা। সারা রাতের মধ্যে সেটা বেড়ে হবে ৫ লাখ। তা ছাড়া নদী পথেও হাজার পঞ্চাশ পর্যন্ত যাত্রী আসতে পারে।

গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সময় আর ফেরার পর বেশ কিছুক্ষণ নামখানায় মেলা অফিসে বসেছিলাম। অতিরিক্ত জেলা শাসক অনিল চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে নামখানা, কাকদ্বীপ ও ডায়মণ্ড হারবারের তিন বি-ডি-ও, তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে "ফ্রণ্ট" সামলাচ্ছিলেন। গল্পকার বন্ধু মানিক চক্রবর্তীকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি চিরকাল এই কাজই করে আসছেন, যদিও সাগরমেলা এবারই তাঁর প্রথম। নারায়ণপুর (নামখানা) ব্লকের বি-ডি-ও দিলীপ মিত্রের ওপরই চাপটা বেশি, কারণ ব্লকটা তাঁর, একটা টাওয়ার বানানো হয়েছে আর গোটা নয়েক জেটি। ছটা-মত জেটি লঞ্চের জন্য, তিনটে নৌকোর। টাওয়ার থেকে প্রবল মাইকে লঞ্চগুলোকে নাম ধরে ডেকে-ডেকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কোন জেটিতে ভিড়তে হবে। আর যাত্রীদের আটকানোর চেক পয়েণ্টে

নির্দেশ যাচ্ছে কত যাত্রী ছাড়তে হবে ও যাত্রীরা কোন জেটি দিয়ে কোন লঞ্চে উঠবেন। লঞ্চগুলো ত ছাড়া হচ্ছে হাতানিয়া-দোআনিয়া নদীতে। সেটা ছোট নদী। সুতরাং যে-কোনো মুহূর্তে নদীতেও ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে যেতে পারে। একটা জেটিতে বেশি লঞ্চ লাগালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই সবটাই সামলানো হচ্ছে মেলা অফিস থেকে। এর মধ্যেই তাদের কাছে অনবরত নানা লোক নানা সাহায্যের জন্যে আসছে। অজস্র হারিয়ে যাওয়া লোককে খুঁজে দেয়ার অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে কে বাস হারিয়ে ফেলেছে, কার ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে ব্যাঙ্ক অস্বীকার করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম সমস্যার সমাধানে মেলা অফিসকে ব্যস্ত হতে দেখলাম। আমাদের সরকারি অফিসের লোকজনরা কাজ করেন না—তাঁদের অভিযোগ নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু এ-রকম একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত জন সরকারি কর্মীকে পরপর রাত জেগে যে ভাবে কাজ করতে দেখলাম, তাতে কেমন ভরসা হল। এখানে কাজ না করে উপায় নেই বা সামান্য অন্যমনস্কতার জন্যে কয়েকশ লোক মরে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মীরা তাঁদের কর্মক্ষমতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেন। রাজনৈতিক নেতাদের দায় এই পরিস্থিতিটা তৈরি করা। আমাদের বোধহয় সেখানেই ঘাটতি।

গঙ্গাসাগর মেলায় না গেলে 'নিশান' শব্দটির আসল অর্থ জানা যেত না। এ মেলায় এক মুহূর্তের জন্যে চোখ ফেরালেই হারিয়ে যেতে হবে। তাই এক-এক দল এক-একটা 'নিশান' নিয়ে নিশানা ঠিক রাখে। ভিড়ের মাথায় ঐ 'নিশান' দেখে হারিয়ে যাওয়া লোক তার দল খুঁজে পায়। যারা অভিজ্ঞ তারা ত "নিশান" বানিয়ে নিয়েই গেছে। অন্য অনেকেই একটা কঞ্চি বা লাঠির মাথায় রুমাল বা গামছা বেঁধে নিশান বানিয়েছে। এক দলকে দেখলাম কিছু খড় বেঁধে নিশান করেছে। খড়গুলো উড়ে-উড়ে পড়ছে। আর এক দল একটা ছেঁড়া হাওয়াই স্যাণ্ডেল লাঠির মাথায় বেঁধে নিয়েছে।

বৈতরণী নদী গরুর লেজ ধরে পার হতে হয় এটা জানা ছিল। মেলায় গিয়ে দেখা গেল ভবিষ্যতের সেই অনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানটি এখনই উদ্‌যাপন করে নেয়ার বেশ ঢালাও ব্যবস্থা। জীর্ণশীর্ণ এত বাছুর যে কোথা থেকে আনা হল—কে জানে? সে-বেচারারা একা-একাই বৈতরণী পার হতে পারবে না—পৌষের হাওয়ায় তাদের এমনই দুরবস্থা। সারি-সারি গরু নিয়ে পাণ্ডা-পুরোহিতরা বসে আছে। তাদের সামনে এক-একটি পরিবার, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী, বাছুরের লেজ ধরে মন্ত্র পড়ছে। বাছুরগুলোও বোধহয় পাবলভ সাহেবের 'কন্ডিশনড রিফ্লেক্স' পড়েছে। কারণ, লেজে এত হাত পড়লেও তারা স্বভাবানুযায়ী লেজ তুলে দৌড় লাগাচ্ছে না—বরং এত লোককে

জীবন্ত অবস্থায় বৈতরণী পার করতে করতে লেজগুলো বেশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

এক 'টাওয়ার' থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীরা যাঁরা হারিয়ে গেছেন তাঁদের নামের তালিকা অনবরত পড়ে যাচ্ছিলেন—বেশির ভাগই হিন্দিতে, কখনো বাংলায়। শুনে মনে হচ্ছিল—হারিয়ে যেতেই লোকে যেন সাগর মেলায় আসে। ঐ 'টাওয়ার'-এর নীচেই বজরং পরিষদের অফিস। এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বহু বছর ধরে মেলাতে এই কাজটা করে আসছেন—হারানোদের খুঁজে দিচ্ছেন। তাঁদের অফিসে চত্বরে হারানো মানুষদের অসহায় চোখমুখ দেখলে ভয় করে। দুই বৃদ্ধা বসে আছেন পরস্পরের গা ঘেঁষে ভেজা সেমিজে জড়োসড়ো হয়ে। বাচ্চাদের ত একটা আলাদা মেলাই বসে গেছে ওখানে। বোঝা গেল—স্নান করবার আর গরুর লেজ ধরার সময়ই হারানোটা বেশি ঘটে।

পরে নামখানা মেলা অফিসে আশ্বস্ত হয়েছিলাম-শেষপর্যন্ত প্রায় সবাই-ই সবাইকে খুঁজে পায়।

কিছুদিন আগে চণ্ডীগড়ের এক বৈজ্ঞানিক সেখানকার 'দি ট্রিবিউন' কাগজে লিখেছিলেন যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, আর গ্রামগঞ্জে পায়খানার ব্যবস্থা এখনো যেরকম স্তরে পড়ে আছে, তাতে এই শতাব্দীর শেষে, ভারতবর্ষের এমন কোনো খোলা মাঠ থাকবে না যা মানুষ পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করবে না। নাথপুল তাঁর "এন এরিয়া অব ডার্কনেস"-এ লিখেছিলেন "ভারত একটা মস্ত বড় মুক্ত শৌচাগার।" এ-সব কথা পড়তে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু গঙ্গাসাগরের মত মেলায় গেলে বোঝা যায় কথাটা কী কঠিন সত্য। সারাটা মেলার হাওয়ায় শুধু বিষ্টার গন্ধ, শুধু বিষ্টার গন্ধ। এমন কি সমুদ্রের হাওয়াও সে গন্ধ দূর করতে পারে নি। সংগঠকরা আলাদা জায়গা করে দিয়েছেন। সেখানে জলের অসুবিধে যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে একটা খাল খোঁড়া হয়েছে। সেইখানে পাম্প করে জল ভরা হচ্ছে। কিন্তু তৎসত্বেও মুক্তি নেই। যেখানে স্নান করার জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে এই লাখ লাখ লোক এসেছেন সেই সমুদ্রতীরে স্নান আর মলত্যাগ একসঙ্গে চলছে। যেন মনে হয় সমুদ্রে মলত্যাগই এই তীর্থের আচরণীয় অনুষ্ঠান। সমুদ্রের প্রবল জোয়ারও সমুদ্রতীরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারল না।

কিন্তু মেলা ত কপিলমুনিকে নিয়েও নয়, নাঙ্গা সন্ন্যাসীকে নিয়েও নয়—মেলা ত মানুষকে নিয়ে। মানুষ এখানে, এই সাগরে আসতে চায় বলেই কপিল মুনিও এখানে আশ্রম বানিয়েছে, নাঙ্গা সন্ন্যাসীও এখানে এসে জুটেছে। সমুদ্রের মাঝখানে এ-রকম

একটা দ্বীপে মানুষ আসতে চায় বলেই আসে। কিন্তু, হায়, আজও আসার জন্যে তার একটা ছুতো দরকার। সেই ছুতো দিয়ে এখনকার মানুষ নিজেকে রামায়ণ—মহাভারতের সঙ্গে গাঁথে, এখনকার মানুষ রামায়ণ—মহাভারতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সেই যাওয়ার পথ পাণ্ডা পুরুতে ঠাসা। সেই যাওয়ার পথ সন্ন্যাসী—ব্যবসায়ীতে ঠাসা। তাই সমুদ্রের ভিতরে মেলায় এসেও মানুষ নিজের বিষ্ঠায় নিজে গড়াগড়ি যায়, কয়েকদিনের জন্যে নোংরা এক জীবন কাটিয়ে যায়।

কিন্তু ভবিষ্যতে ত একদিন আসবে যখন রামায়ণ-মহাভারত থেকেই মানুষ সরাসরি গঙ্গাসাগরের দ্বীপে পা ফেলবে—সেদিন আকাশ আর সমুদ্র আর পৃথিবীর নিরিখে তীর্থযাত্রী তার নিজের মাপ খুঁজে পাবে। [প্রতিক্ষণ, ২-১৬ ফেব্রুয়ারি '৮৭]।

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব—নীহাররঞ্জন রায়।
যশোহর খুলনার ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড—সতীশচন্দ্র মিত্র।
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—৩য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ।
পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—৩য় খণ্ড—অশোক মিত্র।
গঙ্গারিডি : ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ—নরোত্তম হালদার।
বাঙলার তীর্থ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।
প্রতাপাদিত্য—সত্যচরণ শাস্ত্রী।।
মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর—জগন্নাথ মাইতি।
দক্ষিণ চব্বিশপরগণার লোকশিল্প—সত্যানন্দ মণ্ডল।
বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড—ধনঞ্জয় দাস মজুমদার।
ইতিহাসের বালুবেলায়—অরুণকুমার মজুমদার।
বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
বাংলা দেশের নদনদী ও পরিকল্পনা—কপিল ভট্টাচার্য।
বাঙলায় ভ্রমণ—রেলদপ্তর প্রচারিত।
পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র—দীপ্তিময় রায়।
চব্বিশপরগণা ও কলিকাতা—ডাঃ এস পি চ্যাটার্জি।
চব্বিশপরগণার মন্দির—অসীম মুখোপাধ্যায়।
চন্দ্রকেতুগড়—দিলীপকুমার মৈতে।
সুন্দরবন—রত্নাংশু বর্গী।
ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাঙলা—সঙ্কর্ষণ রায়।
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—অতুল সুর।
আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী।
Statistical Account of Bengal-1st vol.—W. W. Hunter.
Calcutta old and New—H. E. A. Cotton.
Marshes to Metropolis Calcutta 1487-1981—Biren Roy.
West Bengal—Edited by Dr. A. K. Chatterjee, P. K. Mukhopadhya. and Dr. A. Gupta.

The Oraons of Sundarban—Amal Kumar Das and Manis Kumar Raha.

The Port of Calcutta—N. Mukherjee.

Ganga Sagar Mela—Tarundeb Bhattacharya.

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গ—শচীন্দ্রলাল ঘোষ।

বাঙলার সামাজিক ইতিহাস—অতুল সুর।

সুন্দরবন—প্রভাত দাস সম্পাদিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বলতম দিনগুলি—হেমেন মজুমদার। সোমপ্রকাশ। ৯ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা।

কোম্পানীর আমলে চব্বিশ পরগণা—নয়নরঞ্জন চন্দ। সংস্কৃতি। ১৩৭০ চৈত্র।

সুন্দরবনের ঐতিহাসিক বিবরণ—কালিদাস দত্ত। সংস্কৃতি। ১৩৭০ চৈত্র।

পল্লীর দেবী—বিবিমা (ওলাবিবি)—ললিতকুমার রায়চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ। ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।

বেনাকি ঃ চব্বিশ পরগণার একটি লৌকিক দেবতা—জ্যোতির্ময় বসুরায়চৌধুরী। লোকসংস্কৃতি। প্রথম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা।

আত্মীয় সভা। প্রথম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। গিরীন মণ্ডল সম্পাদিত।

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন-সমৃদ্ধ চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে খুবই কম। কোম্পানি আমলের সময় থেকে এই ভূ-খণ্ডের ইতিহাস রচনায় যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, বর্তমান গ্রন্থে এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও সমতট বা ব্যাঘ্রতটির প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা হয়েছে খুবই কম। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত এই ভূ-খণ্ডে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল আর্য আমলের অনেক পরে। উত্তর দক্ষিণ দুই অংশে এ-যাবৎ এমন কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে, যা আর্য-পরবর্তিকালকে সূচিত করে—এ' সবই এক বিরল ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন।

খ্রীষ্টপূর্ববর্তী সময়ে পূর্বভারতের অন্যতম বাণিজ্যিক শিল্পকেন্দ্ররূপে চব্বিশ পরগণা জেলাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ—সম্রাট আলেকজাণ্ডার এতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর কথা অবগত হয়ে অভিযান থেকে বিরত হন। এই বিরতির স্থান কাল, সেই সময়ে চব্বিশ পরগণার ঐশ্বর্য, রাজা চন্দ্রকেতুর ভগ্ন রাজধানী—দক্ষিণাংশের বিস্তৃত অঞ্চলের মৃত্তিকাবদ্ধ ঐশ্বর্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও গবেষণা আজ খুবই প্রয়োজন। নদীনালা সমৃদ্ধ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খ্রীষ্টপরবর্তিকালে সুসভ্য সংস্কৃতির বিকাশ ছিল অম্লান।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়,রাজনৈতিক উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক কারণে এই ভূখণ্ডে দীর্ঘকালীন অন্ধকারময় যুগ নেমে আসে। মুসলমান আমলে ধর্মীয় সংঘাতও বিপর্যয় ডেকে আনে। অবশ্য ষোড়শ শতকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে এক নব্য ধর্মীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। পরে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃত ভাষাচর্চা এবং প্রশাসনিক সংস্কার জেলার মানসিক বিবর্তনেও প্রভাব বিস্তার করে। এক সময় বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক অঞ্চলে গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে মিশ্র সংস্কৃতি-চেতনার মিলনভূমি এই চব্বিশ পরগণা। সাগরদ্বীপের কপিলমুনি থেকে হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ এবং দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চব্বিশ পরগণার চরিত্রকে দিয়েছেন এক ভিন্নতর রূপ।